দাগ

প্রথম খণ্ড

দীপক চৌধুরী

সুব্রত সরকার

সুপ্রিয় সরকার

দু'জনকেই।

দীপক চৌধুরীর অন্যান্য উপন্যাস

শঙ্খবিষ

ঝড় এলো

কুমারী কন্যা

এই গ্রহের ক্রন্দন

রোয়াক

এই উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র ও ঘটনা কাল্পনিক।

'—And their blood is the seed of the future harvests.'

মহীতোষের বিবৃতি

॥ এক ॥

আজ শুধু সুতপা রায়ের কথাই মনে পড়ছে। বার বার ক'রে মনে পড়ছে। কলকাতার এই বিরাট জনসমুদ্রের মধ্যে সুতপা রায়ের অস্তিত্বটা বিন্দুর চেয়ে বড় ছিল না বটে, কিন্তু তবু তাকে ভোলা গেল না—দৃষ্টির বাইরে তাকে সরিয়ে দেওয়াও গেল না।

ভুলে যাওয়াই বোধ হয় স্বাভাবিক ছিল। মানুষের স্মৃতিশক্তির ওপর এত বেশী অত্যাচার এ যুগের মত অন্য কোন যুগেই আর হয় নি। অসংখ্য নামের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য ঘটনাও মনে ক'রে রাখতে হচ্ছে। একালের মত এত বেশী প্রাতঃস্মরণীয় ভদ্রলোক এবং ভদ্র-মহিলার সংখ্যা অন্য কোন কালেই ছিল না। খবরের কাগজগুলির বুকে যুগপুরুষদের কি বিবাট মিছিল চলেছে দিনবাত! সুতপা রায়ের মত সাধারণ একটি মেয়ের বুকের ওপর দিয়ে মিছিলটা পার হ'য়ে গেল, থেঁৎলে গেল সুতপার গোটা অস্তিত্বটা। অথচ কাগজের গায়ে এক ইঞ্চিও দাগ লাগল না। এক ইঞ্চি কাগজের দাম না কি ষোল টাকারও বেশী।

হয়তো ষোল টাকার চেয়ে অনেক বেশীই হবে। তাই আজকের কাগজে সুতপার কোন খবর বেরোয় নি। এসপ্লানেডে ঘুরে ঘুরে সবগুলি দৈনিক আমি কিনে ফেললাম। আপিসে ব'সে প'ড়েও ফেললাম সব। কোথাও সুতপার নামটা আমি খুঁজে পেলাম না।

গতকল্যেব ঘটনাটা কি দেশের লোকের জানা উচিত ছিল না? আপিসে ব'সে ঘটনাটা লিখলাম আমি। সবসুদ্ধ আট লাইন হ'ল। খবরের কাগজেব বিজ্ঞাপন বিভাগে এসে জিজ্ঞাসা করলাম, "দেখুন তো, এই আট লাইনের খবরটা ছাপাতে কত টাকা লাগবে?"

টেবিলের ওপর উবু হ'য়ে ব'সে যুবকটি বিজ্ঞাপন পড়ছিলেন। একটু বাদে যুবকটি হাসতে লাগলেন। হাসির ভঙ্গিতে তাঁর রহস্যের ঢেউ।

জিজ্ঞাসা করলাম, "হাসছেন কেন ?"

"না—এমনিই। সুতপা রায় আপনার কে হন ?"

বললাম, "আমার কেউ নয়। এক আপিসে কাজ করি।"

"কোন্ আপিসে ?" পুনরায় প্রশ্ন করলেন তিনি।

বললাম, "বণিক আপিসে। উনি হচ্ছেন গিয়ে লাহিড়ী সাহেবের স্টেনো।"

"ওঃ—" যুবকটি লাইন গুনতে গুনতে জিজ্ঞাসা করলেন, "মিস রায় বুঝি কাল ময়দানে গিয়েছিলেন বক্তৃতা শুনতে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। ওঁর নাম হচ্ছে মিসেস সুতপা রায়।"

"তবে আপনি পয়সা খরচ ক'রে খবরটা ছাপাচ্ছেন কেন ?" যুবকের সুরে ভেসে উঠল হতাশা ও অভদ্রতার ধ্বনি।

পুনরায় সবিনয়ে বললাম, "দেখুন তো, আট লাইনের খবরটা ছাপাতে কত টাকা লাগবে।"

হিসেব ক'রে এবার তিনি বললেন, "ষোল টাকা।"

মাসের প্রথম সপ্তাহ, তাই ষোল টাকা দিতে পারলাম আমি।

আমাদের আপিসে কাজ করে সুতপা বায়। মুখ চেনা ছিল। হয়তো দু'চার দিন দু'একটা কথাও হ'য়ে থাকবে। কি কথা হয়েছে প্রশ্ন করলে জবাব দিতে পারব না। দরকারী কথা কিছু নয়। লিফ্‌টে ক'রে চারতলায় ওঠবার সময় হঠাৎ মাঝে মাঝে দেখা হ'য়ে যেত। জড়সড়ভাবে ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত লিফ্‌টের কোণায়। বাঁচিয়ে রাখবার মত শরীরের সম্পদ তেমন তার কিছু নেই। তবুও সে সতর্ক থাকত। পাশের জায়গাটা দখল করতে গেলে অন্য পাশে স'রে দাঁড়াত সুতপা। 'কেমন আছেন', জিজ্ঞাসা করলে, জবাব দিত চারতলায় উঠে। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, সুতপা খরচ করতে চায় না। এমন কি দুটোর বেশী তিনটে কথা পর্যন্ত না। আমি ভাবতাম, আর ঠিকই ভাবতাম যে, সঞ্চয় ওর কিছু নেই ব'লেই

খরচের প্রতি ওকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয়েছে। ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে পথ চলবার সময় হঠাৎ কোন কোন দিন আমার চোখে পড়েছে ওর দ্বিতীয় অস্তিত্ব। একটা অশরীরী ছায়া সুতপার দেহ থেকে নিষ্কাশিত হ'য়ে চলতে থাকে ওরই পিছু পিছু। দ্বিতীয় সুতপা তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কোন্‌টা আসল আর কোন্‌টা যে নকল তা অবশ্য আমি বুঝতে পারি নি। বুঝবার জন্যে চেষ্টাও করি নি। গতকল্যের ঘটনাটা আমার চোখে না পড়লে ওর সঙ্গে আমার সত্যিকারের পরিচয় হ'ত না। হ'লেও ওর গায়ে আমি হাত দিতে পারতাম না। কাল আমি সুতপার গায়ে হাত দিয়েছি।

দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। ওর নাকের তলায় আমি হাত রেখেছিলাম প্রথম। তার পর আঙুল দিয়ে ঠোঁট দুটো ওর চেপে ধরেছিলাম।

মনে আছে আঙুলগুলি আমার কাঁপছিল। পরে বুঝেছিলাম, শুধু আঙুল নয়, সমস্ত শরীরটাই আমার কাঁপছিল। দু'তিন বার চেষ্টা করেও ওকে কোলে তুলতে পারি নি। যখন পারলাম, তখন আমার হাসি পেল। বোধ হয় পঁচিশ কি ত্রিশ সের ওজন হবে! সুতপার ওজন যে এত কম বাইরে থেকে দেখে আমি বুঝতে পারি নি। আমি কেন, আপিসের কেউ কি বুঝতে পেরেছিল? কাল আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি যে, সুতপা রায় দু'জন। একজন লাহিড়ী সাহেবের স্টেনো, অন্য জন কাল আমার কোলে চেপে ময়দানটা পার হয়েছে বিনা প্রতিবাদে। একজনকে চোখে দেখলে চেনা যায়, অন্য-জনকে বুকের ওপর চেপে অনুভব করতে হয়।

খবরের কাগজের আপিস থেকে বেরিয়ে এসেছি প্রায় আধ ঘণ্টা আগে, বেলা এগারোটায়। লাহিড়ী সাহেব কেন, আপিসের সবাই এতক্ষণ বুঝতে পেরেছেন, সুতপা রায় আজ কাজে আসবে না। সুতপা ছাড়া আরও একজন স্টেনো আছে। মাদ্রাজী। তাকে দিয়ে লাহিড়ী সাহেব তাঁর কাজ চালিয়ে নেবেন। সুতপার

অনুপস্থিতি কারও চোখেও পড়বে না। চোখে পড়বার মত সুন্দরী নয় সুতপা।

লিফটে চেপে চারতলায় উঠে এলাম। বণিক আপিসের মস্ত বড় হল-ঘরটায় বিন্দুমাত্র চঞ্চলতা নেই। মেশিনের নিয়মানুবর্তিতা পাখার হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে ঘরটার চতুর্দিকে। ইশারা ক'রে বড়বাবু ডাকলেন আমায়। জিজ্ঞাসা করলেন, "বাইরে এতক্ষণ কি কবছিলেন ?" বড়বাবু জানতেন সত্য কথা আমি বলব না। কোন্ মানুষটা সত্য কথা বলে ? বড়বাবু পৃথিবীটা দেখছেন অর্ধ শতাব্দীর ওপর। তিনি কি জানেন না যে, স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না থাকলে এখানে কেউ সত্য কথা বলতে চায় না ?

আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, "লাহিড়ী সাহেব আমায় ডাকছিলেন নাকি ?"

"না। তিনি এখনও আপিসে আসেন নি।"

বড়বাবুর কথা শুনে খুবই আশ্চর্য বোধ করলাম। কোনদিনই তো তাঁকে লেট হ'তে দেখি নি। সকাল সাড়ে ন'টায় তিনি আসেন। দশটা পর্যন্ত কোম্পানীর ডিরেক্টর হেণ্ডারসন সাহেবের কামরায় মিটিং নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তিনি। দশটার একটু পরে ডেকে পাঠান মিসেস সুতপা রায়কে। আজ দেখলাম, নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে।

বড়বাবু বললেন, "বিলেত থেকে আজ আমাদের একজন নতুন সাহেব আসছেন, মিস্টার হেওয়ার্ড।"

"তাই নাকি ?"

"হ্যাঁ। হেণ্ডারসন সাহেব দেশে চললেন। বোধ হয় আর ফিরবেন না।" একটু থেমে বড়বাবুই আবার বললেন, "শুনলাম, ছোকরা সাহেব। বড়কর্তাদের আত্মীয়······জানেন, মিসেস্ রায় অসুস্থ ?"

"অসুস্থ নয়, আহত। আপনি খবর পেলেন কি ক'রে ? খবরের কাগজে নিউজ বেরিয়েছে নাকি ?"

"কি যে বলেন! একটু আগে একটা চিঠি পেলাম। গড়িয়া থেকে কে একজন এসে দারোয়ানের হাতে চিঠিখানা দিয়ে গেছে।··· কিন্তু লাহিড়ী সাহেবের আবার কি হ'ল?"

"আর যাই হোক, তিনি নিশ্চয়ই আহত হন নি। মাত্র বিয়াল্লিশ বছর বয়সে যাঁরা দু' হাজার টাকা মাইনে পান···আচ্ছা, আমি এবার চলি বড়বাবু। হাতের কাজ সব শেষ ক'রে দিচ্ছি। এক ঘণ্টা আগে আজ ছুটি চাই।"

"কেন?"

"গড়িয়া যাব।"

হাতের কাজ শেষ কবতে পারি নি। কিন্তু আপিস থেকে বেরিয়ে পড়লাম চারটের আগেই। সুতপা কাল আমায় অনুরোধ করেছিল, যদি সময় পাই তা হ'লে ওকে যেন একবার দেখে আসি। পাঁচ বছর একই আপিসে একসঙ্গে কাজ করছি। রবিবার এবং ছুটির দিনগুলি বাদ দিলে ওকে তো প্রত্যেক দিনই দেখেছি। দেখেছি এবং ভুলেও গেছি তপন লাহিড়ীর স্টেনো সুতপা রায়কে। আজ যাকে দেখতে যাচ্ছি তার পরিচয় নতুন—হয়তো সারা জীবনেও তাকে ভোলা যাবে না। দ্বিতীয় সুতপার নিঃশ্বাস আমার গায়ে লেগেছে।

ময়দানের জনসভায় কাল আমিও গিয়েছিলাম বক্তৃতা শুনতে। বিরাট জনসভা। আইনের চাবুক মেরে সমাজদেহের গলিত মাংস সব ফেলে দিচ্ছিলেন ভারতবর্ষের নেতৃবৃন্দ। বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন পাস হবে। সামাজিক বিপ্লবের জয়পতাকা আমিও দেখতে চেয়েছিলাম। ময়দানের সভায় কাল আমিও তাই উপস্থিত ছিলাম।

সভাশেষে উত্তেজিত জনতা বন্যার জলের মত ছুটে চলেছে ময়দানের চতুর্দিকে। আমি দাঁড়িয়েছিলাম এক পাশে। পেছন থেকে গোঙানির আওয়াজ শুনতে পেলাম। একটু দূরেই দেখলাম সুতপা মুখ থুবড়ে প'ড়ে আছে ময়দানের বুকের ওপর। ওর কাছে

গিয়ে পৌঁছতে সময় লাগল আমার। উন্মত্ত জনতা তখন বক্তৃতামঞ্চের দিকে ছুটছে। এরা কেউ বক্তৃতা শুনতে আসে নি। ভারতবর্ষের যাঁরা নেতা তাঁদের মুখ দেখবার জন্যেই এখানে আজ এত ভিড়।

স্নুতপার কাছে গিয়ে পৌঁছতে বোধ হয় মিনিট পাঁচেক লেগেছিল। কেউ সেখানে আর তখন ছিল না। বিকেলের সূর্য হেলে পড়েছে গঙ্গার পশ্চিম পারে। ঝিরঝিরে হাওয়ায় ঈষৎ পূর্বের উত্তাপ সব এরই মধ্যে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে—ময়দানের বুকে নরম অনুভূতি। কচি কচি সবুজ ঘাসের মাথাগুলি জনতার পায়ের চাপে নুয়ে পড়েছে। তারই ওপর ভেঙে পড়েছে আমাদের আপিসের স্নুতপা রায়।

নাকের তলায় হাত রাখলাম। নিঃশ্বাসের ভাণ্ড দেখলাম এখনও নিঃশেষ হয় নি। কশ বেয়ে রক্ত পড়ছে। রক্তের রং লাল নয়। তামাটে রঙের বিন্দু দেখলাম ওর ভাঙা চোয়ালের মধ্যে এসে আটকে রয়েছে। স্নুতপার নষ্ট স্বাস্থ্যের পাঁক আমার হাতে ঠেকল। রুমাল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিতে গিয়ে অনুভব করলাম রক্তের ফোঁটাগুলি ঠাণ্ডা।—বুঝলাম উষ্ণতার পুঁজি ওর কত কম!

দু'একজন সংবাদদাতা দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, একটু বাদেই কাছে এগিয়ে এলেন তাঁরা। স্নুতপার নাম এবং পরিচয় দিয়ে অনুরোধ করেছিলাম, আগামী কল্যের সংবাদপত্রে যেন ঘটনাটার উল্লেখ থাকে।

মুহূর্ত পূর্বেও ভাবতে পারি নি যে, স্নুতপা রায়েব গোটা অস্তিত্বটা বহন করবার শক্তি রাখি আমি। নিজের সম্বন্ধে উঁচু ধারণা আমার কোন দিনই ছিল না। কিন্তু আলগা ক'রে ওকে যখন আমি তুলে ফেললাম, তখন আমার হাসি পেল। আধ মাইল লম্বা ময়দানটা পার হ'য়ে গেলাম হাসতে হাসতে।

চৌরঙ্গীর রাস্তায় এসে ট্যাক্সি নিলাম। হাসপাতালে যাওয়ার উদ্দেশ্যই আমার ছিল। হঠাৎ দেখি স্নুতপা সোজা হ'য়ে উঠে বসেছে। উঠে বসবার সঙ্গে সঙ্গে শাড়ীর আঁচল দিয়ে দেহটাকে ঢেকে 'ফেলবার

চেষ্টা করছে। দেহ ? বোধ হয় অন্য কিছু হবে। ঢাকবার মত দেহের আকৃতিতে ওর আদিম ঐশ্বর্য নেই। থাকলে, বণিক আপিসের তপন লাহিড়ীকেও আজ আমি এখানে দেখতে পেতাম।

তবুও দেহটাকে ভাল ক'রে ঢাকবার জন্যে সুতপার সে কি চেষ্টা। ট্যাক্সির কোণার দিকে স'রে বসলাম আমি। সুতপা জিজ্ঞাসা করল, "আমি অজ্ঞান হ'য়ে মাটিতে প'ড়ে গিয়েছিলাম, না ?"

"বোধ হয় মাটিতে প'ড়ে যাবার পর অজ্ঞান হ'য়ে গিয়েছিলেন। এখন কেমন আছেন আপনি ?"

"অনেকটা সুস্থ বোধ করছি।"

"তা হ'লে কি হাসপাতালে যাবেন না ?"

"হাসপাতাল ?" চৌরঙ্গীর দিকে চেয়ে সুতপা রায় বলল, "না, কিচ্ছু দরকার নেই। মাসীমার ওখানেই যাব। গাড়ী ঘুরিয়ে নিতে বলুন।"

মেট্রো সিনেমার কাছ থেকে গাড়ীটা ঘুরল। ঘুরল উল্টো দিকে। জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায় যেতে হবে ?"

"গড়িয়া।"

সামনের দিকে মুখ ক'বে ট্যাক্সি-ড্রাইভাব বলল, "করপোরেশন এলাকার বাইরে যেতে পারব না।"

সুতপা রায় সঙ্কুচিতভাবে বলল, "গড়িয়াহাটের মোড়ে গিয়ে আমরা বাস ধরব। আপনি যখন সঙ্গে আছেন, তখন আর ওকে গড়িয়া পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে লাভ নেই।"

বললাম, "আপনি ভাববেন না। বাড়তি পয়সা পেলে ট্যাক্সিওয়ালা ভূ-প্রদক্ষিণ করতেও রাজী হবে।···আপনার কি খুব লেগেছে ?"

চুপ ক'রে রইল সুতপা রায়। দ্বিতীয় বাব প্রশ্ন করলাম আমি। এবার সে ধীরে ধীরে বলল, "না, তেমন কিছু নয়। শরীরটা ভাল ছিল না। হঠাৎ কেমন দুর্বল বোধ করতে লাগলাম। কখন যে মাটিতে প'ড়ে গিয়েছিলাম মনে নেই। প'ড়ে যাওয়ার পরে মনে

আছে ওরা সব আমার গায়ের উপর পা ফেলে এদিক-ওদিক ছুটতে লাগল।”

“ওরা? ওরা কারা মিসেস রায়?”

“পুরুষমানুষেরা।”

শেষের কথাটা সুতপার মুখ থেকে গড়িয়ে পড়ল অত্যন্ত ধীরে ধীরে। মনে হ’ল বিদ্বেষের কাদায় প্রতিটি অক্ষর ভারী হ’য়ে উঠেছে। অক্ষরগুলো আজই হঠাৎ কর্দমাক্ত হ’য়ে উঠে নি। ওর মনের উপর পায়ের দাগ পড়েছে অনেক দিন আগে।

আমি বললাম, “আপনার নাক এবং মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়েছিল।” মুহূর্তের জন্যেও অবাক হ’ল না সুতপা রায়। কোন কিছু জানতেও চাইল না সে। অতএব আমাকেই আবার বলতে হ’ল, “একবার ভাল ক’রে দেখুন তো বুকে পিঠে কোথাও আঘাত লেগেছে কি না।”

এবার সে ওপাশ থেকে মুখটা তার ঘুরিয়ে নিয়ে এল। চোখ-ছুটো তুলে ধরল আমার দিকে। চোখের ভঙ্গিতে ওর আঘাতের গভীরতা দেখতে পেলাম আমি। ছ’দশ জন পুরুষমানুষের পায়ের চাপে এত বেশী আঘাত কেউ পায় না। আমি তাই আবার জিজ্ঞাসা করলাম, “খুব বেশী লেগেছে, না?”

তপন লাহিড়ীর স্টেনো সুতপা রায় আমার প্রশ্নের জবাব দিল না। মুখ নীচু ক’রে চোখের জল ফেলতে লাগল সে।

লোয়ার সারকুলার রোড পার হ’য়ে এলাম। গুরুসদয় দত্ত রোড পর্যন্ত কোন কথা হ’ল না। এরই মধ্যে মনে মনে বারকয়েক আমি এসপ্লানেডের আপিসটা ঘুরে এসেছি। পাঁচ বছর আগে যেদিন সুতপা প্রথম এসে আমাদের আপিসে কাজে যোগ দিল সেদিনটাও চোখের উপর ভেসে উঠল আমার। আমরা সবাই সেদিন ভাল জামাকাপড় প’রে এসেছিলাম। আমাদের আপিসে মেমসাহেবের সংখ্যা বড় কম নয়। কিন্তু বাঙালী মেয়ে কেউ ছিল না। সুতপা এল প্রথম। এতদিন যেন আমরা ইংরেজ বণিক আপিসে ডাঙার মাছের মত’ নিঃশ্বাসও

নিতে পারছিলাম না। স্বাধীন ভারতবর্ষেও গোলামির মানসিকতা থেকে মুক্তি পাই নি আমরা। সুতপা যেন আমাদের জন্যে প্রথম এই মুক্তির জল নিয়ে এল! বুক ভ'রে নিঃশ্বাস নেওয়ায় জন্যে বড়বাবুও সেদিন গলাবন্ধ কোটের ইস্ত্রি বাঁচিয়ে আপিসে এসেছিলেন। বাগবাজার থেকে ট্যাক্সি ধরেছিলেন তিনি।

তার পর সুতপা যখন লিফ্‌টে ক'রে চারতলায় উঠে এল তখন দেখলাম বড়বাবুই প্রথম তাঁর গলাবন্ধ কোটের ইস্ত্রির ভাজ সব নষ্ট ক'রে ফেললেন। গা থেকে কোটটা খুলে রেখে দিলেন চেয়ারের হাতলের উপর। সুতপার ভাঙা চোয়ালের রুগ্নতা বণিক আপিসের ধুলোর সঙ্গে মিশে রইল। কেউ আর ওর দিকে আগ্রহ নিয়ে চোখও তুলল না। আমিই কেবল সুতপা রায়ের দ্বিতীয় অস্তিত্ব দেখতে পেয়েছিলাম। ধুলো থেকে তুলে আনবার লোভ আমি তাই কোন-দিনই গোপন করতে পারি নি। এখন তো আমি ওর পাশেই ব'সে আছি। গুরুসদয় রোড পার হ'য়েও এলাম।

গড়িয়াহাটের মোড়ে এসে বললাম, "একজন ডাক্তার আমার চেনা আছে। তিনি এই অঞ্চলেই থাকেন, চলুন না, একবার তাঁকে দেখিয়ে আসবেন?"

"কি দেখাব?"

"ব্যথা—মানে যে জায়গাটায় আঘাত লেগেছে।"

"মাসীমার কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারলে ব্যথা-বেদনা আর কিছু থাকবে না।"

যোধপুর ক্লাব ডানদিকে রেখে ট্যাক্সিটা যাদবপুরের রাস্তা ধরেছে। কয়েক বছর আগে এদিকটায় একবার এসেছিলাম। আজ আমার চোখে গোটা এলাকাটা নতুন নতুন ঠেকতে লাগল। দু'দিকের ফাঁকা মাঠে বড় বড় বাড়ী উঠেছে। ডোবাগুলোও দেখলাম নেই। ম্যাটি দিয়ে ভরাট ক'রে তার উপরও বাড়ী তোলা হয়েছে। এ অঞ্চলের নির্জনতা লুপ্ত। ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত টিন এবং টালির

ঘরগুলো দেখে মনে হ'ল, রিফিউজীদের কলোনী তৈরি হয়েছে রাস্তার দু'ধারে। ডানদিকের সাইনবোর্ডটা চোখে পড়ল আমার— বাঘা যতীন কলোনী।

যাদবপুরের পুরনো মাটিতে নতুন ঘাসের সমারোহ।

ট্যাক্সির মিটারের দিকে চেয়ে বললাম, "দূর তো কম নয়। প্রত্যেক দিন সময়মত আপিসে পৌঁছোন কি ক'রে?"

"একটু আগে বেরুতে হয়। গড়িয়ার মোড় থেকে পাঁচ নম্বর ধরি। ফেরবার মুখেও আবার সেই পাঁচ নম্বরই ধরতে হয়।" এই ব'লে আঁচল দিয়ে মুখ মুছে স্থতপা রায়ই আবার বলল, "প্রায় বারো মাইল যেতে, বারো মাইল আসতে।"

"আপিসের কাছাকাছি কোন একটা জায়গায় থাকলেই বোধ হয় ভাল হ'ত। আপনার স্বাস্থ্যের উপর প্রত্যেকদিন চব্বিশ মাইলের চাবুক পড়ছে। হয়তো শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়বেন।"

"মাসীমাকে ছেড়ে আসবার ক্ষমতা আমার নেই। তা ছাড়া মেসোমশাইও সেখানে আছেন। তাঁরা আমার আত্মীয় নন। সেই জন্যেই ছাড়তে পারি না।"

জ্ঞান বাড়ছে আমার। বণিক আপিসের সর্বগ্রাসী আধিপত্যের দূষিত আবহাওয়া থেকে ক্রমে ক্রমে মুক্তি পাচ্ছি আমি। স্থতপা রায়কে তপন লাহিড়ীর স্টেনো ব'লে মনে হচ্ছে না আর। ওর ভাঙা চোয়ালে মাংস গজাচ্ছে। শহর কলকাতার বর্বরতা বাঘা যতীন কলোনীর সীমানা পার হ'তে পারে নি। প্রাক্-সন্ধ্যার স্নিগ্ধ আলোয় দেখলাম বৈষ্ণবঘাটার মাঠে সবুজের ঢেউ উঠেছে। কচি কচি ধান গাছের শীর্ষদেশে সভ্যতার বিজ্ঞাপন। লোভের কাস্তে খেয়ে এরা এখনও ক্ষতবিক্ষত হয় নি।

জিজ্ঞাসা করলাম, "মেসোমশাই কি করেন?"

"কি একটা কাজ করতেন। এখন তিনি বুড়ো হ'য়ে গেছেন। শুনেছি এক সময়ে তাঁর প্রচুর বিষয়-সম্পত্তি ছিল। এখন আর কিছু

নেই। সরকার-কুঠি নামে পৈতৃক বাড়ীটা শুধু আছে। সরকার-কুঠি পাকা বাড়ী। মাসীমা পেইং-গেস্ট রাখেন।”

জিজ্ঞাসা করলাম, “পাড়াগাঁয়ের মধ্যে তিনি হোটেল খুলেছেন বুঝি ?”

“না। হোটেল কিংবা মেসবাড়ী এটা নয়। অবশ্যই থাকা এবং খাওয়ার জন্যে পয়সা দিতে হয়। বাইরে থেকে সরকার-কুঠির বৈশিষ্ট্য কেউ বুঝতে পারে না। এখানে প্রথমে থাকতেই আসে। তার পর সবাই এখানে আশ্রয় পায়। সরকার-কুঠি হোটেল নয়, এটা হচ্ছে মাসীমার পরিবার, সংসারও বলতে পারেন।” এই ব'লে স্নুতপা বাইরের দিকে আঙুল তুলে পুনরায় বলতে লাগল, “ওইটা হচ্ছে গড়িয়াব খাল। আমরা এবার বাঁদিকে ঘুরব। ডানদিকের রাস্তাটাকে রক্ষিতের মোড় বলে। একটু এগিয়ে গেলেই পঞ্চানন ঠাকুরের মন্দির দেখতে পাবেন। আমার আজ সেখানে পুজো দেবার তারিখ ছিল।”

“আপনি পুজো দেন বুঝি ?” বিস্মিত হলাম আমি।

“না। আজ দেব ভেবেছিলাম। বোধ হয় সেই জন্যেই শাস্তি পেলাম। পঞ্চানন ঠাকুরের ছুটো পা-কে উপেক্ষা করতে গিয়ে, আপনি নিজেই তো দেখলেন, হাজার লোকের পায়ের দাগ নিয়ে আজ আমি বাড়ী ফিরছি।” স্নুতপা চোখ বুজল। ভাল ক'রে হেলান দিয়ে বসল ট্যাক্সির পেছনে। আমি ওর দিকে চেয়েছিলাম। হাজার মানুষের পায়েব দাগ দেখবার জন্যে মন আমার একবারও উদ্‌গ্রীব হয় নি। আমি দেখবার চেষ্টা করছিলাম শুধু একটা দাগ, যে দাগ কেবল একটা মানুষের পা থেকে উৎসারিত হয়েছে। আমি বুঝতে পেরেছি, শুধু সেই দাগটিই ওর মনেব আকাশটাকে কালো ক'রে রেখেছে। হাজার মানুষের নিষ্ঠুরতা হয়তো বা সে এরই মধ্যে দেহ থেকে মুছে ফেলেছে। ডাক্তাবের দরজায় গিয়ে দাঁড়াবার প্রয়োজন বোধ হয় ওর সত্যিই নেই।

জিজ্ঞাসা করলাম, "ময়দানে গিয়েছিলেন কেন ? পঞ্চানন ঠাকুর আপনাকে যা দিতে পারেন, ছুনিয়ার অগণিত নেতার তো তা দেবার সাধ্য নেই।"

"মানুষের তো ভুল হবেই মহীতোষবাবু। পঞ্চানন ঠাকুর বক্তৃতা দিতে পারেন না ব'লেই সম্ভবত আমি বক্তৃতা শুনতে ময়দানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। জ্ঞান ফিরে আসবার পরে প্রথমেই আমার কি মনে হয়েছিল জানেন ?"

"আপনি বলুন, আমি শুনি।"

সুতপা বলতে লাগল, "ভাগ্যিস্ মন্দিরের তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে একটি দেবতাও বক্তৃতা দেবার ভাষা পান নি !"

আমার সন্দেহ হ'ল, মহিলাটি আমার প্রথম প্রশ্নটার জবাব দিতে রাজী নয়। ময়দানে যাওয়ার উদ্দেশ্যটা সে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে চাইছে না।

ট্যাক্সি থেকে নামতে হ'ল। সরকার-কুঠি পর্যন্ত গাড়ী যায় না। তা ছাড়া খানিকটা নীচে নামতে হবে, গড়িয়ার খাল পর্যন্ত। ছু'পা হাঁটবার পরে সুতপা বলল, "কষ্ট হচ্ছে।"

"কোথায় ?" আমার প্রশ্নের প্রত্যক্ষতায় সুতপা একটু বিচলিত বোধ করল। জবাব দিতে দেরি করতে লাগল সে। আঁচলটা আলগা না ক'রে সে আরও বেশী সতর্কভাবে আঁচলটাকে গুছোতে লাগল। গুছোতে গুছোতে সে বলল, "ডান পায়ের হাঁটুটা বোধ হয় জখম হয়েছে। হাঁটতে কষ্টই হচ্ছে খুব।"

"হাঁটবার কি দরকার ? ময়দান থেকে চৌরঙ্গীর রাস্তা পর্যন্ত তো হেঁটে আসেন নি।"

"এতটা কাছে কি ক'রে যে এসে গেলেন তাই ভাবছি। আমি যে তপন লাহিড়ীর স্টেনো তা বোধ হয় আপনি জানেন মহীতোষবাবু ?"

"জীবনের ময়দানটা এত বড় যে, তপন লাহিড়ী তাঁর দৃষ্টি দিয়ে

সবটা দেখতে পাচ্ছেন না। মানুষের দৃষ্টি যে সীমাবদ্ধ তা বোধ হয় আপনি আমার চেয়ে বেশী জানেন।”

“জানি। আর এও জানি যে, পঞ্চানন ঠাকুর মানুষকে এই জায়গায় পরাস্ত করেছেন। তিনি বক্তৃতা দিতে পারেন না বটে, দেখতে পান সবই।”

“তা হ'লে বিপদ সব কাটল। এবার আসুন, আমার হাতেব উপর ভর দিয়ে পথটুকু পার হবেন।”

সুতপা বায় পথ চলতে লাগল আমাকে অবলম্বন ক'রে। ঢালু রাস্তা দিয়ে নীচেব দিকে নামতে লাগলাম আমবা। গড়িয়ার খালটা এবাব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মবা খাল। জল যতটা আছে তাব চেয়ে কাদাব পবিমাণ বেশী। গড়িয়াব এটা ব্যাকওয়াটাব। সুতপার জীবনটাও যেন ঠিক এবই মত ব'লে মনে হ'ল আমাব।

সমতল বাস্তায় নেমে জিজ্ঞাসা কবলাম, “মিস্টার বায়, মানে আপনাব স্বামীও কি এখানে থাকেন?”

“না।”

“আমাবও ঠিক এই বকমই ধাবণা হযেছিল।”

“একথা কেন বলছেন?”

“বলছি আপনি মযদানে গিয়েছিলেন ব'লে। বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন সম্বন্ধে আপনার এত আগ্রহ কেন?”

“কিন্তু আমি তো বিচ্ছেদ চাই না। তবুও ময়দানে আমি গিয়েছিলাম। মহীতোষবাবু, আমি ভেবেছিলাম, দিল্লীর বড় নেতা আজ ময়দানে বিপ্লবের আগুন জ্বালাবেন। আগুনেব তাপ লাগাতে গিয়েছিলাম। নইলে—নইলে আমি যে ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছি!”

পাঁচ বছব ধ'রে যাকে দেখছি তার পক্ষে ঠাণ্ডা হ'য়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যাকে দেখি নি তার উত্তাপ আমি অনুভব করছি। হাতের আস্তিন আমার গুটনোই ছিল। সুতপা আমার ডান হাতের উপব ভর দিয়ে পথ চলছে। ওব দ্বিতীয় অস্তিত্বটা আমার উপর

অবলম্বনশীল নয়। পঞ্চানন ঠাকুরকে যে মেয়েটি পুজো দিতে যায়, সে আজ ময়দানের সভায় বিপ্লবের আগুন গায়ে লাগাতে যায় নি। সুতপাকে বুঝতে সময় লাগবে। আমি জানি, বিপ্লবের নতুন বিগ্রহ খুঁজে বেড়াচ্ছে সে।

সরকার-কুঠিতে প্রবেশ করবার রাস্তাটা খুব সরু। পল্লীগ্রামের পরিবেশ এখান থেকে আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। মোটর, বাস কিংবা লরী চলার আওয়াজ উঁচু রাস্তাটা থেকেও শুনতে পেয়েছি। এখানে শুধু নির্জনতার স্থায়ী আয়োজন। রাস্তার দু'ধারে নারকেল আর সুপারী গাছের সারি। ঝিরঝিরে হাওয়ায় উঁচু মাথাগুলো নড়ছে বটে, কিন্তু নীচের নির্জনতাকে আঘাত করতে পারছে না। গড়িয়ার খালটা বাঁ দিক থেকে বাঁক নিয়েছে। আমরা ডান দিকের ফটক দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম।

মাসীমাকে দেখলাম। মেসোমশাই তো কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। একতলার বড় ঘরটাতে ভিড় জমেছে। এটাই বোধ হয় সরকার-কুঠির বসবার ঘর। প্রথম দৃষ্টিতে মাসীমার সংসারের আর্থিক দৈন্য আমার চোখে পড়ল। ক'খানা ভাঙা চেয়ার আর বেঞ্চি পাতা রয়েছে। সবগুলো চেয়ারের হাতল ভাঙা। ঘরের এক কোণায় একটা চৌকি ছিল দেখলাম। সুতপাকে ধ'রে মাসীমা এই চৌকির উপর শুইয়ে দিলেন। দিয়ে বললেন, "ষষ্ঠী, যাও তো বাবা একটা বালিশ নিয়ে এস।"

ষষ্ঠী বালিশ আনতে গেল। লোকটি একটু মোটা ধরনের মানুষ। বয়স মনে হ'ল চল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ। দিন বারো দাড়ি কামায় নি। কাঁচা-পাকা দাড়িগুলো সজারুর কাঁটার মত ছুঁচলো হ'য়ে উঠেছে।

আমার দিকে চেয়ে মাসীমা বললেন, "বোস বাবা বোস। বলরাম গেল কোথায়? একটা চেয়ার এগিয়ে দে তো বাবা।"

তেরো-চৌদ্দ বছর বয়সের একটি ছেলে হাতল-ভাঙা চেয়ারটা আমার কাছে এনে বলল, "আপনি বসুন, আমি ধ'রে থাকছি।"

মাটিতে ব'সে বলরাম চেয়ারের তলায় নিজের ঘাড় ঠেকিয়ে রাখল। চেয়ারের একটা পা নেই।

বলরামের ঘাড় চেপে বসবার মত দেহের ওজন আমার হাল্কা ছিল না। ওর দিকে চেয়ে আমি বললাম, "মেঝে থেকে উঠে এস ভাই।"

বালিশ নিয়ে ষষ্ঠীবাবু ফিরে এসেছে। সে বলল, "আপনি ভয় পাবেন না, বসুন। বলরামের ঘাড়েগর্দানে অনেক তাকত।"

মাসীমা মুখ ঘুরিয়ে বললেন, "ওরে, ঐ বেঞ্চিটা একটু এগিয়ে নিয়ে আয় না। চেয়ারগুলি বাবা অনেক দিন থেকে ভেঙে প'ড়ে আছে। এবার সব মেরামত করাতে হবে।"

বুঝলাম, আমার জামাকাপড়ের পরিচ্ছন্নতা লক্ষ্য ক'রে এঁরা সবাই বিব্রত বোধ করছেন। মেসোমশাই ইত্যবসরে একটা বেঞ্চি ঠেলতে ঠেলতে আমার সামনে নিয়ে এসেছেন। ত্রিশ নম্বর হেসিয়ানের মত মোটা সুতোয় বোনা কাপড়ের প্যাণ্ট পরেছেন তিনি। প্রথম তাঁর দিকে চেয়ে সত্যিই আমার মনে হয়েছিল যে, প্যাণ্টের কাপড়টা সাহেব কোম্পানীর চটকলে তৈরী। তাও নতুন নয়। সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড বস্তার ফাঁকে ফাঁকে যেন গড়িয়া খালের কাদা জমেছে। মেসোমশাই পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে বেঞ্চিটা মুছতে মুছতে বললেন, "কাল বোধ হয় বলরাম বেঞ্চির ওপর শুয়ে রাত কাটিয়েছে। ও তো ঠিক আইনমত পেইং গেস্ট নয়। ফিল্ম কোম্পানীর স্টুডিওর সামনে থেকে ষষ্ঠী ওকে তুলে নিয়ে এসেছে।"

প্রতিবাদ করল ষষ্ঠীবাবু, "সামনে থেকে নয়। চায়ের দোকান থেকে। স্টুডিওব পশ্চিম দিকটাতে একটা চায়ের দোকান আছে। সেখানে সব ফিল্মের 'এক্সট্রা' পাওয়া যায়। তাগড়া তাগড়া ছেলে-গুলো মশাই দিনরাত ধুঁকছে। মরা সৈনিকের পার্ট তো সব সময়ে জোটে না। মাসীমা, তোমার তো ভূতোর কথা মনে আছে? ছোঁড়াটা পাঁচ বছর আগে যখন এসেছিল তখন ওর বয়স ছিল পনের। এখন দেখলে মনে হবে, একশ' পনের।"

"তা বাবা, তোমার কথা তো মিথ্যে হ'তে পারে না। তুমি হচ্ছ গিয়ে ও লাইনের পুরনো লোক।" মন্তব্য করলেন মাসীমা। মেসোমশাই বাকী পরিচয়টুকু শেষ করলেন, "ষষ্ঠী হচ্ছে গিয়ে ফিল্ম কোম্পানীর মেক্-আপ ম্যান। কিন্তু ষষ্ঠীর মুখে আজ এত কথা ফুটছে কি ক'রে? গত দশ বছরের মধ্যে ষষ্ঠী বোধ হয় দশটার বেশী কথা বলে নি।"

"বলরামই বোধ হয় ওকে বকাচ্ছে। হ্যাঁ বাবা, তুমি কি বসবে না?" জিজ্ঞাসা করলেন মাসীমা।

মেসোমশাই সহসা রুমাল দিয়ে পুনরায় বেঞ্চিটা মুছতে লাগলেন। বেঞ্চিটা তাতে আরও বেশী ময়লা হ'ল। ময়লা জ'মে জ'মে রুমালটা খাকী রঙের মত তামাটে হ'য়ে উঠেছে। মেসোমশাই আমার দিকে চেয়ে হেসে ফেললেন। বললেন তিনি, "একটু নস্যি নেওয়ার অভ্যাস আছে মশাই।"

তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমিও একটু হাসতে বাধ্য হলাম।

বলরাম মেঝে থেকে উঠে পড়েছে। চেয়ারটা দেয়ালের গায়ে ঠেকিয়ে রেখে সে এসে সামনে দাঁড়াল। মাসীমা ওর দিকে চেয়ে বললেন, "যা তো বাবা গরম জলের ব্যাগটা নিয়ে আয়। উনোনে জলের কেটলী চাপানোই আছে। সেটাও নিয়ে আসিস।"

বলরাম চ'লেই যাচ্ছিল, এমন সময় মাসীমা বললেন, "না বাপু, থাক। তুই পারবি নে। হাত-পা পুড়িয়ে ফেলবি। আমি নিজেই যাচ্ছি।" মাসীমা উঠলেন। বলরামকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন বাইরে।

অনেকক্ষণ থেকে আমি বলরামকে দেখছিলাম। গায়ে দুটো শার্ট পরেছে। পরনে দেখলাম দু'খানা ধুতি। ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। ষষ্ঠীবাবুই আমায় বুঝিয়ে দিয়ে বলল, "বলরাম হচ্ছে গিয়ে রিফিউজীর বাচ্চা। মা বাপ কেউ নেই। গত দশ বছর থেকে ভেসে বেড়াচ্ছে। বাক্স পেটরা নেই, অথচ একটা শার্ট আর

একটা ধুতি ওর বেশী আছে। কোথায় রাখবে ও তুটো? গায়ে লাগিয়ে ঘুরে বেড়ায়। চায়ের দোকান থেকে সেদিন তুলে নিয়ে এলাম।”

ষষ্ঠীবাবু বিদায় নিল। পেছন দিকে চেয়ে দেখি, মেসোমশাইও সেখানে নেই।

সুতপাকে বললাম, “এবার তা হ’লে আমি যাই। মাসীমার সংসারটা দেখে গেলাম।”

“কিছুই দেখেন নি। সবটা দেখতে সময় লাগবে। কাল একবার আসবেন।”

“আসব। মিস্টার লাহিড়ীকে কিছু বলতে হবে কি?”

“না।”

এই সময়ে মাসীমা গরম জলের ব্যাগ নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। সুতপাকে বললেন তিনি, “চল্, তোর ঘরে গিয়ে শুবি। মাঠে-ময়দানে যাওয়ার কি দরকার ছিল তোর? থাক, থাক, আমাকে আর বিপ্লবের গল্প শোনাস নে। ফাঁকা মাঠে যারা চেঁচায় তাদের মুরোদ আমি জানি। বিপ্লব আনবেন পঞ্চানন ঠাকুর, বিপ্লব আসবে মনে। আর কোনদিন ঠাকুরকে ফাঁকি দিয়ে ময়দানে যাস নি তপা। হ্যাঁরে, এই বাবুটিকে চা খেতে বললি নে?”

“না, না—এমন অসময়ে আমি আর চা খাব না মাসীমা।” মুখ তুলে আমার দিকে চাইতে গিয়ে সহসা তিনি তাঁর মুখটা নীচু ক’রে ফেললেন। ধীরে ধীরে বললেন তিনি, “লালু বেঁচে থাকলে আজ তার তোমার মতই বয়স হ’ত। তোমার মত জোয়ান ছিল সে। বিয়াল্লিশের আন্দোলনের সময় এক দিন ভোররাত্রে এক হাজার পুলিশ এই বাড়ীটাকে ঘেরাও করে। কি ক’রে যেন ওরা সন্ধান পেয়েছিল, লালু সেই রাত্রে বাড়ী ফিরবে। লালুকে ওরা অনেক দিন থেকে খুঁজছিল। দুমদাম ক’রে সরকার-কুঠির দরজাগুলি ওরা ভেঙে ফেলল। পুলিশসাহেব বিপিন চাটুজ্জের নাম শুনেছ তো?

কোন কিছুই বুঝতে না পেরে আমি দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছিলাম। ওমা, সামনে দেখি পিস্তল হাতে নিয়ে বিপিন দাঁড়িয়ে আছে! আমাকে এক পাশে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে সে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে গেল দোতলার ছাদে। একটু বাদেই শুনি, গুলির আওয়াজ হচ্ছে। চারদিক থেকে আওয়াজ আসছে। দোতলার ছাদ থেকে লালু লাফিয়ে পড়েছিল। বোধ হয় ভেবেছিল পেছন দিকের খালটা সহজেই পার হ'য়ে যেতে পারবে। মরা খাল। বিপিনের গুলি খেয়ে সে গড়িয়ে গড়িয়ে খালের কিনারা পর্যন্ত গিয়েছিল বটে, কিন্তু পার হ'তে সে পারে নি। লালু শেষ হ'য়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোর হ'ল। গুলির আওয়াজ শুনে চড়ুই পাখীগুলি সেদিন কি ভীষণভাবে কিচির মিচির করছিল। বিপিনের মত পুলিশ সাহেবকে ওরাও বোধ হয় চিনতে পেরেছিল। পেছন দিকে আমিও ছুটে গিয়েছিলাম। কিন্তু তার আগে বিপিন সেখানে পৌঁছে গেল। দোতলার সিঁড়ি দিয়ে সে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে নীচে নামছিল। এই ঘরটার দেয়ালের পলস্তারা খ'সে পড়ল দু'চার জায়গায়। সেই থেকে উনি আর ঘর মেরামত করান না। আজ দেখছ, গোটা বাড়ীটার পলস্তারাই খ'সে পড়েছে। কিন্তু বিপিন কি কাণ্ড করল জান? ক্ষতবিক্ষত লালু বোধ হয় শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার আগের মুহূর্তে একটু জল খেতে চেয়েছিল। গড়াতে গড়াতে খালের কিনারায় গিয়ে মুখ নীচু ক'রে যেমন জল খেতে যাবে, বিপিন এসে অমনি আবার ওর ঘাড়ের উপর গুলি ছুঁড়ল। 'মাগো' ব'লে লালু টুপ ক'রে গড়িয়ে পড়ল জলে। গড়িয়ার খালে স্রোত নেই। বিদ্রোহী লালু সরকারের উত্তপ্ত নিঃশ্বাস এখনও বোধ হয় ঠাণ্ডা হয় নি।·· হ্যাঁরে তপা, শুনলাম স্বাধীন ভারতবর্ষে বিপিন চাটুজ্জে নাকি আরও বড় চাকরি পেয়েছে?"

গরম জলের ব্যাগটা দু'হাতে চেপে ধ'রে মাসীমা চেয়ে রইলেন পুবদিকের দেয়ালে।

পলস্তারা নেই, দুটো বড় বড় গর্ত চোখে পড়ল আমার। মাসীমার বুকের সঙ্গে দেয়ালটার কি অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে!

॥ দুই ॥

গতকল্যের ঘটনাগুলি মনে মনে গুছিয়ে নিচ্ছিলাম আমি। বণিক আপিসের বৈচিত্র্যহীন জীবনে হঠাৎ খানিকটা দোলা লেগেছে। সুতপার অনুপস্থিতি বড়বাবুর চোখে পড়েছে।

চারটে বাজবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লাম। কাজ করতে পারি নি। ঘড়ির দিকে চেয়ে ব'সে ছিলাম। বড়বাবু আমায় ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "দু'এক দিনের জন্যে ছুটি নেবেন নাকি?"

"না। এক ঘণ্টা আগে ছুটি পেলেই খুশী হব।"

"শরীরটা বোধ হয় আপনার ভাল নেই। আজ তো একটা ফাইলও ক্লিয়ার করতে পারলেন না। কাজের ক্ষতি হচ্ছে।" এই ব'লে বড়বাবু তাঁর নিজের ফাইলগুলি গুছোতে লাগলেন। এক ঘণ্টার জন্যে ছুটি পেলাম কিনা বুঝতে পারলাম না। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিলাম, এমন সময় তিনি বললেন, "দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চালু হবে। প্রচুর কাজ বাড়ল আমাদের। স্বাধীন ভারতবর্ষের নাগরিকদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী।"

"আপনার কথা মিথ্যে নয়। কিন্তু সুতপা রায়কে দেখতে যাওয়ার দায়িত্ব অনেক।"

"স্বাধীন ভারতবর্ষের চেয়ে সুতপা রায় কি বড় হ'ল?" প্রশ্ন করলেন বড়বাবু।

বললাম, "ঝট ক'রে জবাব দেওয়া মুশকিল। ছাত্রজীবনে স্বাধীনতা কথাটা বহু বার শুনেছি। ওতে এত বেশী নেশা ছিল যে, কথাটার মানে বোঝবার চেষ্টা করি নি। এখন নেশার মাত্রা গেছে ক'মে। এবার মানে বোঝবার সময় হ'ল।"

"তা হ'লে গড়িয়া অঞ্চলটা একবার ঘুরেই আসুন। জানাবেন, মিসেস রায় কেমন আছেন।"

"ছোট সাহেব কি তাঁর পুরনো স্টেনোর খোঁজ করেন নি?"

"মাদ্রাজী স্টেনোর কাজ তিনি পছন্দ করেন খুব। তা ছাড়া সুয়েজ খাল বন্ধ। তিনি তো মাথায় হাত দিয়ে ব'সে আছেন—যাচ্ছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"একটু দাঁড়ান।" বড়বাবু ফাইল হাতড়াতে লাগলেন। সুয়েজ খাল বন্ধ ব'লে দরকারী মেশিনপত্র আসতে দেরি হচ্ছে আমি জানি। হয়তো দেশের তাতে ক্ষতিও হবে। কিন্তু সুতপার ক্ষতি কি সমাজ কিংবা দেশের ক্ষতি ব'লে কোন দিনও গণ্য হবে না? তা যদি না হয়, তবে তেমন দেশের নাম যদি ভারতবর্ষও হয় তাতে সুতপার কি যায় আসে? যে পরিকল্পনার জন্যে বড়বাবু আমাদের অল্প মাইনেতে বেশী শ্রমদান করবার অনুরোধ জানাচ্ছেন, সুতপা তার অংশমাত্র নয়। ভারতবর্ষের কোন পরিকল্পনার মানচিত্রে গড়িয়ার খালটিকে আমি দেখতে পাই নি।

আমি চ'লেই আসছিলাম। বড়বাবু এবার ফাইল থেকে মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কিছু বলবেন?"

"মিসেস রায়কে কতদিন থেকে চেনেন?"

"কাল থেকে।"

"ও, হ্যাঁ—আপনিই তো বললেন, কাল তিনি আহত হয়েছেন।"

"আমার একটু ভুল হয়েছে বড়বাবু। তিনি বোধ হয় আহত হয়েছেন অনেক দিন আগে—"

"কত আগে?" ঝুঁকে বসলেন তিনি।

ছোট সাহেব তপন লাহিড়ীর বেয়ারা এসে সামনে দাঁড়াল। খবর দিল, ছোট সাহেব তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন। বড়বাবু উঠে

পড়লেন। তাঁর শেষ প্রশ্নটার জবাব দেওয়ার দরকার হ'ল না। তিনি বললেন, "আচ্ছা, আপনি তা হ'লে আসুন। খবর দেবেন মিসেস রায় কেমন আছেন। আর ক'দিনের ছুটির দরকার তাও জেনে নেবেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের খবরটা বোধ হয় আপনি রাখেন না মহীতোষবাবু ?"

খবরটা শোনবার জন্যে আমার আগ্রহ হ'ল। তিনি বলতে লাগলেন, "গত পাঁচ বছরের মধ্যে মিসেস রায় এক দিনের জন্যেও ছুটি নেন নি! তাঁর বরাদ্দ ছুটিও নষ্ট হ'য়ে গেছে। ওই অসুস্থ শরীর নিয়ে কি ক'রে যে তিনি আপিসে আসেন ভেবে অবাক হ'য়ে যাই। আমি তো গোড়াতেই ঠিক ক'রে রেখেছিলুম, এক সপ্তাহের বেশী টিকবেন না তিনি। দু'শ টাকার চাকরির জন্যে মশাই বালিগঞ্জের সেই সুন্দরী মেয়েটি আজও আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা ক'রে যায়। তা ছাড়া আমার ভাইঝিটি আবার শর্টহ্যাণ্ড টাইপ রাইটিং শিখছে, এবার পরীক্ষা দেবে। কি করি বলুন তো ?"

"আপনি আর কি করবেন বড়বাবু ?"

"না, না—আমার আবার করা-করি কি! আমি ভাবছিলুম সমাজের কথা। কি সাংঘাতিক বিপ্লব মশাই! অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেয়ে মেয়ে-পুরুষের সম্পর্ক সব বদলে যাচ্ছে। বালিগঞ্জের সেই মেয়েটি বিয়ে করতে চায় না। গত রবিবারে আমায় নেমন্তন্ন ক'রে খুব খাওয়ালে মশাই। কি একটা হোটেলে নিয়ে গেল। ভেতরে গিয়ে দেখি ছোট ছোট খুপরি, সেখানে গিয়ে বসলুম। বেয়ারা এসে পর্দা ফেলে দিলে। প্রথমেই দেখি ইয়া বড় এক কবিরাজী কাটলেট —বলি হ্যাঁ মশাই মহীতোষবাবু, মিসেস রায়ের কি হাত-পা ভেঙেছে ?"

"না।"

"ভাগ্য ভাল। হাত-পা ভাঙলে ভদ্রমহিলার আর থাকবেই বা কি!". বড়বাবুর নিশ্বাসে সহানুভূতির উত্তাপ। আমি বুঝতে

পেরেছিলাম—তাঁর কথা এখনও ফুরোয় নি। গলা-বন্ধ কোটের বোতাম লাগাতে লাগাতে তিনি নীচু সুরে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "স্বামী-টামি কাউকে দেখলেন সেখানে?"

"না।"

"জানতুম। আমাদের ছোটসাহেব যে মিসেস রায়ের মধ্যে কি দেখলেন বুঝতে পারি না। শুধু হাত-পা থাকলেই যে স্টেনোগ্রাফার হওয়া যায় না তাও কি আমায় ব'লে দিতে হবে। এদিকের খবর তো আরও খারাপ।"

"কোন দিকের?"

"মিসেস লাহিড়ী নাকি খুবই অসুস্থ। শুনছি দিনরাত ভুল বকেন, বোধ হয় রাঁচি পাঠাতে হবে। কি যে মুশকিলে পড়েছি আমি একমাত্র মা কালীই জানেন।"

"আপনার কি মুশকিল হ'ল?"

"ওই যে বালিগঞ্জের মেয়েটি তাকে কথা দিয়েছি। কোন্ একটা বিস্কুট কোম্পানীতে কাজ করছে, অল্প মাইনে। দেশী কোম্পানী-গুলোর কি যে হাল হয়েছে—খবর দেবেন। মিসেস রায়কে বলবেন, দু'চার মাসের ছুটি চাইলেও তিনি পাবেন, সাহেবকে দিয়ে মঞ্জুর করিয়ে দিতে পারব, পারবই।" বড়বাবু আর অপেক্ষা করলেন না।

আমিও বেরিয়ে এলাম আপিস থেকে।

হ্যারিসন রোডের সাধারণ একটা হোটেলে আমি থাকি। লম্বা ধাঁজের বাড়ীটা, তারই পাঁচ তলায় আমার ঘর। এখান থেকে যে-জগৎটা আমি এযাবৎ দেখে এসেছি তার সঙ্গে গড়িয়ার নব-আবিষ্কৃত জগতের কোন সাদৃশ্য নেই। সাদৃশ্য থাকলে আজ আমি পাঁচ নম্বর বাস ধ'রে সুতপা রায়কে দেখতে যেতাম না।

বসবার ঘরটা দেখলাম আজ খালি, কেউ সেখানে নেই। কি করব ভাবছিলাম, চার-পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করলাম। মনে হ'ল

ঘরের দেওয়ালগুলি আমার ওপর সতর্ক নজর রেখেছে। বিপিন চাটুজ্জের গুলি খেয়ে এরা আর কাউকে বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করবার মত এদের আর স্বাস্থ্য নেই, পলস্তারা সব খ'সে পড়েছে। গর্ত্ত ছুটো শুধু বিদ্রোহী লালু সরকারের চোখের মত জ্বল জ্বল করছে। স্বাধীন ভারতবর্ষে লালু সরকার কি আজও পরাধীন?

বলরাম ঘরে ঢুকল। কাল তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, "মাসীমা কোথায় রে?"

জবাব দিল না বলরাম। আমি লক্ষ্য করলাম, বলরামের মুখ শুকনো, পা ছুটো কাঁপছে। শার্ট ছুটো ঘামে চুপ চুপ করছে। ছু'পকেটে হাত ছুটো ঢুকিয়ে রেখেছে। ওপাশের ওই চৌকির ওপর ধপ ক'বে ব'সে পড়ল বলরাম। আমি এগিয়ে গেলাম ওর কাছে। গড়িয়ার আকাশ থেকে সূর্য বিদায় নিয়েছে। বালিগঞ্জে হয়তো এখনও আলো আছে, কিন্তু সরকার-কুঠির বসবার ঘরে সন্ধ্যা সমাগত। জিজ্ঞাসা কবলাম, "কি হয়েছে রে? জ্বর এল নাকি?"

জবাব দিল ষষ্ঠী দত্ত। ওর পেছনে পেছনে সেও এসে ঘরে ঢুকেছে। খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে মেক-আপ ম্যান বলল, "রক্ষিতের মোড়ে ভিবমি খেয়ে রাস্তার ওপর প'ড়ে গিয়েছিল বলরাম। রিফিউজীর বাচ্চা কিনা তাই পনের টাকাকে এক গাদা টাকা মনে করে।" এই ব'লে ষষ্ঠী দত্ত পকেট থেকে বিড়ি বার করল। বিড়ি ধবিয়ে সে বলতে লাগল, "ছোঁড়াটা এক সঙ্গে পনের টাকা কখনও দেখে নি। একটু আগে আমার পকেট থেকে পনেরটা টাকা খোয়া গেছে। বাস থেকে নেমে দেখি পকেটের তলার দিকটা নেই, সবটাই কাটা। বলরামকে এত ক'রে বোঝালুম যে, কলকাতা শহরে মাত্র পনের টাকা খোয়া গেলে লোকে কালীঘাটে গিয়ে পুজো দিয়ে আসে। কিন্তু এই দেখুন তো, খবরটা শোনবার পর থেকে রিফিউজীর বাচ্চা প্রথমে ভিরমি খেয়ে প'ড়ে গেল, তার পর এখন তো ব'সে ব'সে কাঁপছে। ওরে ও বলরাম—" ষষ্ঠী দত্ত চৌকির

কাছে এগিয়ে এসে পুনরায় বলল, "দু'চারটে রদ্দা না খেলে তোর কাঁপুনি থামবে না দেখছি। এ হচ্ছে গিয়ে দাদা হোমিওপ্যাথি চিকিচ্ছে, বিষ দিয়ে বিষ ক্ষয় করা। ওঠ্—ফিল্মস্টারদের মুখে দু' পোঁচড়া রং মাখালেই ষষ্ঠী দত্ত পনের টাকা রোজগার করতে পারে—"

"কে রে এত লম্বা চওড়া বক্তিমে দিচ্ছে? আমাদের ষষ্ঠী না? বলি হ্যাঁ রে ষষ্ঠী, গেল মাসের পুরো টাকা তো দিস নি? আমি কি তোদের ধার ক'রে খাওয়াব নাকি? মুদির ছেলেটা তাগাদা দিচ্ছে সেই পয়লা তারিখ থেকে। তোরা সবাই যদি বাকিতে খেতে চাস তবে সংসারটা আমি চালাই কি ক'রে? ওখানে কে বাবা?"

"কালকের বাবুটি আবার এসেছেন মাসীমা।" বলল ষষ্ঠী দত্ত।

"কালকের বাবুটি? না ষষ্ঠী, ওকে ব'লে দাও এখানে আর জায়গা নেই। আমরা আর পেইং গেস্ট রাখতে পারব না। মাসীমার সংসারে সবাই বিনে পয়সায় খেতে চায়। ওরে ও ষষ্ঠী, বাবুটিকে জিজ্ঞেস কর পয়লা তারিখে আগাম দিতে পারবেন কিনা। আজ সকালে দু'জন প্রফেসর এসেছিলেন—যাদবপুরে নাকি নতুন নতুন বাড়ী তৈরী হচ্ছে রে ষষ্ঠী?"

"হ্যাঁ।"

"সেই বাড়ীতে নাকি প্রফেসর দু'জন চাকরি করেন। মা সরস্বতীর কপালে এত দুঃখও ছিল। তাঁরা কিন্তু বাবা আগাম দিয়েই থাকতে চান। বলি ও ষষ্ঠী, আলোটা জ্বাল না রে। বুড়ী হ'য়ে গেছি কিনা, চোখে ভাল দেখতে পাই না। আমাদের ষষ্ঠী হচ্ছে গিয়ে মেক-আপ ম্যান। ফিল্ম কোম্পানীর মেয়েদের মুখে রং মাখায়। হ্যাঁ রে ষষ্ঠী, আমার মুখে রং মাখিয়ে বয়স কমাতে পারিস?" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাসীমাই আবার বললেন, "পারবি নে। পারলেও পঞ্চাশটা বছর লুকোই কি ক'রে। তোর তুলির আঁচড় আমি চিনি।"

ষষ্ঠী দত্ত আলো জ্বালল। আমার দিকে চেয়ে তিনি বললেন,

"কে ? মহীতোষ ? আমি ভাবলুম, আমার হোটেলে কেউ থাকতে এল বুঝি, বস।" মাসীমার গলার স্বর বদলে গেল।

হেসে ফেললাম আমি। অনুরোধের স্বরে বললাম, "পয়লা তারিখে সব টাকাই আমি আগাম দেব। দেবেন থাকতে ?"

ইত্যবসরে মাসীমা বলরামকে দেখে নিয়েছেন। ওর মুখ দেখে তিনি নিমেষের মধ্যে চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন। ষষ্ঠী দত্তর কাছ থেকে ঘটনাটা শুনলেন তিনি। বলরামের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে মাসীমা বললেন, "শক পেয়েছে। কেউ কেউ লাখ পনের না গেলে শক পায় না। সংসারটা বড় বিচিত্র জায়গা ! ষষ্ঠী, রান্নাঘরে গরম দুধ আছে। ওকে নিয়ে যা সেখানে। খানিকটা গরম দুধ খাইয়ে দে।"

বলরামকে নিয়ে ষষ্ঠী দত্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মাসীমা বললেন, "বস বাবা, বস। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, আঘাত যত বড়ই হোক, কেউ আর আমায় দুঃখ দিতে পারবে না। মনটাকে হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় না। ছুঁতে পারলে বুঝতে, আজও সেটা পাথর হ'য় না। বাবা মহীতোষ, এ যুগের সবচেয়ে বড় উন্নতিটা যখন আমার চোখে পড়ল, তখন দৃষ্টিশক্তি আমার সবচেয়ে ক্ষীণ। এমন কি তোমাকে পর্যন্ত আমি চোখে দেখতে পাই নি।" এই ব'লে মাসীমা ব'সে পড়লেন চৌকির ওপর, আমারই ঠিক পাশে। ঈষৎ পূর্বের গ্রাম্য স্বর আর তাঁর গলায় নেই। যুগের বিশ্লেষণ তাই আমার শুনতে ভালই লাগছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "সবচেয়ে বড় উন্নতিটা কি মাসীমা ?"

জবাব দিতে দেরি করলেন না তিনি। বললেন, "শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নিষ্ঠুরতা আজ চরমে উঠেছে। জান মহীতোষ, এদের মন থেকে ক্রমে ক্রমে দুঃখবোধ পর্যন্ত লোপ পাচ্ছে ? তোমায় একটা উদাহরণ দিই শোন।" এই ব'লে মাসীমা বেশ জড়সড় ভাবে পা গুটিয়ে চৌকির ওপর বসলেন, চোখ বুজে অতীত উদাহরণ অন্বেষণ করতে

লাগলেন তিনি। তার পর একটু বাদেই আবার বলতে লাগলেন, "প্রায় চল্লিশ বছর আগে এই গ্রামে আমি বউ হ'য়ে এসেছিলুম। বোধ হয় তখন আমার বয়স ছিল দশ কি বারো। হঠাৎ একদিন মাঝরাত্রে ঘটকদের গোয়ালে আগুন লাগে। তেমন কিছু একটা সর্বনেশে ব্যাপার নয়। কিন্তু চারদিকে হৈ চৈ প'ড়ে গেল। আমার শ্বশুর তো লাফিয়ে নেমে পড়লেন উঠোনে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তোমার মেসোমশাইকে ঘুম থেকে তুললেন। আমি দেখলুম, বালতি হাতে নিয়ে বাপব্যাটাতে মিলে ছুটতে লাগলেন ঘটকদের বাড়ীর দিকে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে চতুর্দিকে তুমুল কাণ্ড সুরু হ'ল। শুধু বোড়াল আর বোষ্টমঘাটা নয়, চারদিকের গ্রাম থেকেও লোক সব ছুটে আসতে লাগল। সে সময় তো বাবা আশী নম্বর আর আটাত্তর নম্বর বাস ছিল না। পরের দিন সকালবেলা শুনলুম, সোনারপুর, গোবিন্দপুর এমনকি বারুইপুর থেকেও অনেকে এসেছিল আগুন নেবাতে। কাউকেই অবশ্যি আগুন নেবাবাব জন্যে এক বালতিও জল ঢালতে হয় নি। ঘটকদের ছেলেরাই নিবিয়ে ফেলেছিল। ক্ষতি ওদের তেমন কিছু হয় নি। কিন্তু ওঁবা যখন বালতি হাতে নিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন তখন আমি দেখলুম বালতিগুলো শূন্য নয়, লাভের জলে তা একেবারে ভরপুর! ঘটকদের লোকসান হ'তে পারে ভেবে এতগুলো লোক যে ছুটে এল তার মধ্যে কি সামাজিক লাভ কিছু দেখতে পাচ্ছ না মহীতোষ?"

বললাম, "পাচ্ছি।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাসীমা বললেন, "অথচ বলরামের মত একটা কচি ছেলের সর্বনাশ দেখে কই সারা ভারতবর্ষে কেউ তো চোখের পাতাটি পর্যন্ত নাড়ে না? থাক বাবা থাক, এ সব বড় ব্যাপার নিয়ে আলোচনা ক'রে লাভ নেই। ভারতবর্ষকে যাঁরা শিক্ষার আলো দিয়ে আলোকিত করবার চেষ্টা করছেন তাঁদের দৃষ্টিতে যেন অন্ধকার না থাকে। মহীতোষ, আমি বাবা বলরামকে নিয়ে বড়. মুশকিলে

প'ড়ে গেছি। কাজকর্ম কিছু নেই। তোমাদের আপিসে—" কথাটা শেষ করলেন না তিনি।

আমার নিজের কিছু বলবার মত কথা ছিল না। তা ছাড়া সরকার-কুঠিতে ঢুকেছি কথা শুনতে, বলতে নয়। কিন্তু মাসীমা দেখলাম চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। দেয়ালের গর্ত্ত দুটোর দিকেও তিনি দৃষ্টি দিচ্ছেন না। বুঝলাম, বলরামের কাঁপুনি তাঁকে অস্থির ক'রে তুলেছে।

আলোচনা চালু করলাম আমিই। বললাম, "আজকালকার শাসনবিধি আগেকার দিনের মত নেই। শতকরা একান্ন ভাগ লোককে ভাল ক'রে খাইয়ে-পরিয়ে রাখতে পারলে রাষ্ট্রনায়কদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে না। একজন বলরামের জন্যে পৃথিবীর কোন মসনদই টলতে পারে না মাসীমা।"

"তোমার খবর হয়তো মিথ্যে নয় বাবা। কিন্তু আমাকেও তো একটা ছোটখাটো সংসার চালাতে হয়। কই কাউকে তো এক বেলার জন্যেও না খাইয়ে রাখতে পাবি না। শুধু একান্ন ভাগের কথা যদি ভাবতুম, তা হ'লে তোমার মাসীমাব হোটেলে উদ্বৃত্ত দেখতে পেতে। কিন্তু এখন কি দেখছ? সরকার-কুঠির সবগুলো দেয়াল থেকে পলস্তারা খ'সে পড়েছে।" এই ব'লে মাসীমা শুধু একটা দেয়ালের ওপরই দৃষ্টি ফেললেন। তার পর আঁচল দিয়ে চোখ মুছে পুনরায় বলতে লাগলেন, "ষষ্ঠী যেদিন বলরামকে নিয়ে এল সেদিনটা ছিল মাসের শেষ তারিখ। হিসেবের ভাত হাঁড়িতে আর একটাও ছিলনা। তবুও কি বলরামকে উপোস করিয়ে রাখতে পারলুম? না বাবা, তোমাদের রাষ্ট্রনীতি যত ভালই হোক, আমাদের হোটেল-নীতিকে হেসে উড়িয়ে দিতে পারবে না। এখানে শতকরা এক শ' ভাগ লোকেরই ক্ষিদে পায় এবং তাদের খাওয়াতেও হয়। আমাদের হিসেবে এক পারসেন্ট লোকও মানুষ। একান্ন আর উনপঞ্চাশ ভাগের মধ্যে এক তিলও পার্থক্য নেই। হ্যাঁ বাবা মহীতোষ,

আমাদের হোটেল-নীতির মধ্যে কি অসভ্যতার গন্ধ পাচ্ছ? আমাদের জংলী ভাবছ, না? কিন্তু সোঁদরবন তো এখান থেকে অনেক দূর।”

“দূর আর কই? যেখান থেকে নম্বর দেওয়া বাস চালু হয়েছে তার দূরত্ব বোধ হয় আধ মাইলও নয়। আমার মনে হয়, গড়িয়ার খালটা মরা বটে, কিন্তু এটাই বোধ হয় ছু' অঞ্চলের সীমানির্দেশ করছে।” এই ব'লে হেসে ফেললাম আমি।

মাসীমা মুখ নীচু ক'রে ব'সে রইলেন। খোলা দরজা দিয়ে দেখলাম সরকার-কুঠির বাগানে অন্ধকার নেমে এসেছে। কলকাতার রাস্তায় ঠিক এমন অন্ধকার কোন দিনও চোখে পড়ে নি। ঘরে ব'সে বাইরের দিকে চেয়ে থাকতে ভাল লাগছে। রাত্রির রূপ এখানে স্বাভাবিক। ঘড়ি না দেখেও ব'লে দেওয়া যায় দিন শেষ হয়েছে। কলকাতার ব্যবস্থা আলাদা। সেখানে অন্ধকারকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে রাস্তার ছ'ধারে আলোর সারি।

তবুও মাঝে মাঝে এখানে-সেখানে যেটুকু অন্ধকার আমার চোখে পড়েছে তার কোন রূপ নেই, দেহ নেই। কৃত্রিমতার ঔজ্জ্বল্য কলকাতার অন্ধকারকে কুৎসিত ক'রে রেখেছে।

ঘরের নৈঃশব্দ্য ক্রমশঃ ভারী হ'য়ে উঠছিল। আমি একটু ন'ড়ে চ'ড়ে বসলাম। মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন, “উঠছ নাকি?”

“না। আসল খবরই তো আমার এখনও জানা হয় নি। মিসেস রায় কেমন আছেন?”

“কাল বাবা রাত্রির দিকে জ্বর এসেছিল। কিন্তু আজ সকাল থেকে সে ভালই আছে। বুকের বাঁ দিকটাতে একটু জখম হয়েছে।”

কথাটা আমার পুরোপুরি বিশ্বাস হ'ল না। মাসীমা বোধ হয় সুতপার জখমটাকে ছোট ক'রে দেখাতে চাইছেন। আমি তাই বললাম, “গতকাল তিনি যখন মাটিতে প'ড়ে গেলেন তখন অনেকগুলো লোকের পা-ই তাঁর গায়ের ওপর পড়েছিল।”

"হ্যাঁ বাবা, তুমি ঠিকই বলেছ। একটা লোকের জুতোর তলায় বোধ হয় নাল বাঁধা ছিল।"

সুতপা রায়ের জন্যে উদ্বেগ অনুভব করলাম। মাসীমা বুঝতে পারলেন তা; তিনি ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, "সুতপার আসল জখমটা তুমি দেখ নি। বলি ও মহীতোষ, তোমাদেব ছোটসাহেব তো ওকে একবার দেখতে এলেন না?"

আমি একটু চমকে উঠলাম। মনেব ভাব গোপন রেখেই মাসীমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "লাহিড়ী সাহেবের আসবার কথা আছে নাকি?"

"না কথা কিছু নেই, এলে ভাল হ'ত। তাঁব কাছেই তো মেয়েটা চাকরি করে।"

"হয়তো আসবেন। সুয়েজ খাল বন্ধ ব'লে তিনি আপিসেব কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। খবব দেওয়ার দরকার থাকলে—"

"না, না বাবা, দরকাব কিছু নেই।" একটু থেমে মাসীমাই আবাব বললেন, "লালু যখন মুখ থুবড়ে গড়িয়াব খালে প'ড়ে গেল, তখন ওর জন্যে আমি খুব গর্ববোধ করেছিলুম। লালু পেট্রিয়ট, আমি তার মা। দেশেব স্বাধীনতার জন্যে যে ছেলে ইংবেজের গুলি খেয়ে মরেছে তাব মা হওয়ার মত সৌভাগ্য গড়িযার আব কোন মায়েরই হয় নি। কিন্তু—মহীতোষ, তুমি কি মাসীমার হোটেলে এক পেয়ালা চাও খাবে না?"

"খাব। একটু পবেই খাব। আপনার আগের কথাটা কিন্তু শেষ হয় নি।"

"কি যেন বলছিলাম?"

"পেট্রিয়ট লালু সরকারেব কথা।"

"ও হ্যাঁ। পেট্রিয়ট কথাটা শুনলে এখন হেসে হেসে ম'রে যেতে ইচ্ছে করে। ভগবান রক্ষে করেছেন, ও কথাটা এখন আর খুব বেশী শোনা যায় না। নইলে—মহীতোষ, সুয়েজ খালের সম্বন্ধে কি যেন বলছিলে?"

"ইংরেজ আর ফরাসীরা মিলে খালটা জবরদখল করতে চেয়েছিল। ওঁরা বলছেন, ইংরেজদের সাম্রাজ্যভোগের নেশা এখনও কাটে নি।"

"ওরা কারা ?"

"ভারতবর্ষের যাঁরা মাথাওয়ালা লোক। ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন দেশ। অতএব এঁরা যা বলবেন তা মেনে নিতেই হবে। হয়তো ইংরেজরা সত্যিই মানুষের সর্বনাশ করতে চায়।"

"কি জানি বাবা, এঁদের কথা শুনলে আমার তো হাসি পায়। কেন পায় জান ?"

"না।"

হঠাৎ কান খাড়া ক'রে মাসীমা পেছনের জানালার দিকে মুখ ঘোরালেন। কি যেন শোনবার চেষ্টা করছিলেন তিনি। একটু পরে আমিও শুনতে পেলাম, কে যেন দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসছে। মাসীমা এবার আমার দিকে চেয়ে বললেন, "না, তপা নয়। ভেবেছিলুম, মেয়েটা বুঝি নিচে নামছে। মহীতোষ, তুমি তো আমাদের হোটেলটা একদিনও ভাল ক'রে দেখলে না। দু'দিনই সন্ধেবেলায় এলে। একদিন দুপুরের দিকে এস বাবা। চার দিকটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাব। গড়িয়া খালটা সরকার-কুঠির পেছন দিয়ে পুব দিকে চ'লে গেছে। এপারে আমরা থাকি। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, এপারের সব ক'টি মানুষই হতভাগ্য। ইংরেজ কিংবা ফরাসীদের সঙ্গে এদের কারো সম্পর্ক নেই। অনেকে ফরাসী কথাটা পর্যন্ত কানে শোনে নি। তবুও এদের জীবনের মাটি সর্বনাশের বারুদ লেগে নিষ্ফলা হ'য়ে গেল। তোমরা সুয়েজ খাল দেখেছ, গড়িয়া খাল দেখ নি। ওপারের প্রতিবেশী রাম আর শ্যামবাবু থেকে সুরু ক'রে সবাই যেন অনবরত চেষ্টা করছে এদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেবার জন্যে। এদের বুকের ওপর দিয়ে প্রতিদিন যে সব পাগুলো পার হ'য়ে যাচ্ছে সেগুলো সব স্বদেশী পা বাবা। বলরামকে দেখলে না ? সুতপার কতটুকু দেখেছ ? দেখতে হবে ষষ্ঠীকেও।

চিরুনির ভাঙা-দাঁতের মত ভাঙা-মানুষের একটা লম্বা মিছিল রোজই আমার চোখের সামনে দিয়ে গড়িয়ার খালটা পার হ'য়ে যায়। আমি চোখে ভাল দেখতে পাই না, তবুও আমি বুঝতে পেরেছি যে, সমাজ ও রাষ্ট্রের পাগুলো কি কালো! কে রে? বাইরে কে? ভেতরে আয় না—ও চণ্ডী! এস, কখন এলে? মহীতোষ, এর নাম হচ্ছে চণ্ডী ভটচাজ, বামুন। আমার বাপের বাড়ীর পাশের বাড়ীতে এরা থাকত। এখান থেকে মাইল ছয় দক্ষিণে। গোবিন্দপুরের নাম শোন নি?"

"আজ্ঞে না।"

"সোনারপুর থেকে বেশী দূরে নয়। নেতাজী সুভাষ বোসদের আদিবাড়ী ওই অঞ্চলেই ছিল। যাক গে। চণ্ডী এখন বালিগঞ্জ অঞ্চলে জ্যোতিষী করে, থাকে আমার হোটেলে। বলি হ্যাঁ চণ্ডী, কত রোজগার করলে আজ?"

"শনির দশা না কাটলে রোজগারের অঙ্ক আর বাড়বে না। মাসীমা, আর মাত্র আঠারো মাস বাকী। তার পর—হেঃ, বৃহস্পতির খেলাটা একবার দেখে নিয়ো। তোমার বাকিবকেয়া চুকিয়ে দিতে চণ্ডী ভটচাজ এক মিনিটও দেরি করবে না।"

"আঠারো মাস যদি অপেক্ষা করতে পারি, তা হ'লে দু'চার মিনিট দেরি হ'লেও অসুবিধে আমার হবে না। চণ্ডী, এবার বল্, তপার কোষ্ঠীতে কি দেখলি? বিচার শেষ হয়েছে তো?"

চণ্ডী ভটচাজ ফতুয়ার পকেটে হাত ঢুকোলেন। বিচারের ফলাফল সম্ভবত তিনি পকেটেই রেখেছিলেন। মনোযোগ দিয়ে লোকটিকে দেখছিলাম আমি। ফতুয়ার বাঁ দিকের পকেটটা নেই, খুলে প'ড়ে গেছে। বোধ হয় অনেক দিন ধ'রে তিনি অনেক লোকের ভাগ্যের বোঝা বহন ক'রে ঘুরে বেড়িয়েছেন বালিগঞ্জের বড় বড় বাড়ীগুলোর সামনে দিয়ে। ভাগ্যবানদের ফলাফল ব'য়ে বেড়াবার মত ফতুয়ার কাপড়টা শক্ত নয়। ঘাড়ের দু'দিকে দেখলাম ডবল তালি পড়েছে।

প্রথম তালিটা ফুটো হওয়ার পরে দ্বিতীয় তালি লাগাতে হয়েছে তাঁকে। মেটে রঙের ফতুয়ার ওপর লাল কাপড়ের তালি। চণ্ডী ভটচাজকে এতটা মনোযোগ দিয়ে দেখছিলাম ব'লেই হয়তো মাসীমা গম্ভীর সুরে বললেন, "চণ্ডীর গণনায় বেশী ভুল থাকে না। আর থাকলেই বা কি? ও তো কারো ক্ষতি করছে না! চণ্ডী তার পেট চালাবার জন্যে রোজগার করছে। দু'মুঠো ভাতের জন্যে ওকে বারো ঘণ্টার চেয়েও বেশী মেহনত করতে হয়। হ্যাঁ বাবা মহীতোষ, দেশের যাঁরা নেতা তাঁরা ক'ঘণ্টা মেহনত করেন?"

"আমি, মানে—সত্যি কথা বলতে কি, প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কোন খবরই রাখি না।"

"ভোট দাও নি?" চেঁচিয়ে উঠলেন মাসীমা।

"না। আপিস সেদিন ছুটি ছিল ব'লে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলুম। আমাদের হোটেলের পাঁচ তলায় প্রচুর হাওয়া পাওয়া যায়।"

চণ্ডী ভটচাজ এবার আমার দিকে চেয়ে বললেন, "আপনাকে আমি বোধ হয় কোথাও দেখে থাকব।"

"অসম্ভব নয়। আপিস কোয়ার্টারে দেখা হ'তে পারে। সেদিকে যান না?"

"দৈবে সৈবে।...ওদিকটায় গেলে হয়তো উপার্জন কিছু বাড়ে, কিন্তু যেতে ইচ্ছে করে না। নাঃ, উপোস ক'রে থাকলেও যাব না।"

"কেন?"

জবাব দিলেন মাসীমা। তিনি বললেন, "চণ্ডী যেতে চাইলেও আমি যেতে দেব না।" মাসীমা ভাবলেন একটু। তার পর আবার তিনি বললেন, "ও অঞ্চলে বড্ড বেশী শিক্ষিত লোকের ভিড়। চণ্ডীকে সবাই ভিক্ষুক মনে করে। আমার হোটেলে যারা থাকে তারা কেউ ভিক্ষে করে না। এবার বল্ দিকি বাছা, তপার সময়টা কেমন? আর কতদিন ওকে ভুগতে হবে?"

পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করলেন চণ্ডী ভটচাজ। শেষবারের মত ভেবে তিনি ঘোষণা করলেন, "ভাল সময় আসতে বাধ্য।"

"কতদিন বাকী তাই বল্ না রে।" অনুরোধ করলেন মাসীমা।

"বেশী দিন আর অপেক্ষা করতে হবে না। সৌভাগ্যের স্থুরু তাঁর এখান থেকেই হবে।"

"বলিস কি চণ্ডী? হিসেব ক'রে বললি, না অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়লি?"

"হিসেব ক'রেই বললুম। রাহুর দৃষ্টি ওর পক্ষে ক্ষতিকারক। এবার সেটা জায়গা বদল করছে।" এই ব'লে চণ্ডী ভটচাজ আমার দিকে দৃষ্টি দিয়ে ঘোষণা করলেন, "সৌভাগ্য এমন জিনিস মাসীমা যে, সময় এলে তার পা গজায়। নিঃশব্দে সে হেঁটে চ'লে আসে, এসে দাঁড়িয়ে থাকে মাথার কাছে। ডাকবারও দরকার হয় না—" দ্বিতীয় বার আমার দিকে দৃষ্টি দিয়ে তিনি ঘোষণা শেষ করলেন, "সৌভাগ্যকে কেউ নেমন্তন্ন ক'রে আনতে পারে না, সে হঠাৎ আসে।"

চণ্ডী ভটচাজের গণনায় ফাঁকি আছে মনে ক'বে মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন, "মহীতোষের দিকে অমন ক'রে চেয়ে কি দেখছিস চণ্ডী? তুই বোধ হয় ভেবে নিয়েছিস, মহীতোষ হচ্ছে গিয়ে তপাদের আপিসের ছোটসাহেব?"

"তা কেন ভাবতে যাব? লাহিড়ী সাহেবকে আমি চিনি না বুঝি?"

"চিনিস? তুই যে আমায় অবাক করলি চণ্ডী!"

"সেদিন তাঁর বাড়ী গিয়েছিলুম। দেওদার স্ট্রীটে সাহেবি কায়দায় দেখলুম বাড়ীঘর সাজানো। বললুম, এসব তাঁকে এক দিন ছেড়ে চ'লে যেতে হবে। লাহিড়ী সাহেব হচ্ছেন গিয়ে আমার বড় মক্কেল। স্ত্রীর খুব অসুখ যাচ্ছে।"

"কি অসুখ?" আগ্রহের আতিশয্যে মাসীমা খাড়া হ'য়ে বসলেন।

"মাথার অসুখ। তাঁকে ব'লে এলুম, সেরে যাবে, গোমেদ পরবার জন্যে উপদেশ দিয়ে এসেছি।"

"কই তপার মুখে তো এসব কথা কিছু শুনি নি?"

আমি আর চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারছিলাম না। ভাবছিলাম উঠে পড়ব। হঠাৎ উঠে পড়বার কারণটা খুঁজতে গিয়ে দেখি, তপন লাহিড়ীকে আমি ঈর্ষা করছি। মনের সুস্থতা ফিরিয়ে আনা দরকার। সুতপা রায়কে এখন পর্যন্ত আমি চিনি না। কিন্তু তপন লাহিড়ীই বা ওকে চেনবার সুযোগ পেলেন কি ক'রে? ধৈর্য ধরলাম আমি।

"মাসীমা, মাসীমা কোথায়?" বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন একজন ভদ্রলোক। মুখটা তাঁর দেখতে পেলাম না। তিনি বাইরে থেকে পাঞ্জাবীটা খুলতে খুলতে এলেন। মাথার দিকটাতে পাঞ্জাবীটা আটকে গেছে। মাসীমা বললেন, "বোতাম খোল নি, পাঞ্জাবীটা মাথার ওপর দিয়ে গলবে কি ক'রে বিজয়?"

"ওঃ, তাই তো। আগে বোতামগুলো খুলে নিচ্ছি। সুতপা কেমন আছে মাসীমা? আমার সেই ডাক্তার বন্ধুটিকে খবর দিয়েছি। বাড়ী ফেরবার মুখে সে একবার এসে দেখে যাবে। আজ আর জ্বর আসে নি তো?"

"না। তোমার পকেট থেকে টাকা প'ড়ে গেল যে বিজয়। মহীতোষ, বিজয় হচ্ছে ইস্কুলের মাস্টার। কাল এর সঙ্গে তোমার দেখা হয় নি?"

"না।"

"ছাত্র পড়িয়ে ওর ফিরতে একটু রাত হয়। আগে এক ঘণ্টা ত্রিশ মিনিটের মধ্যে চারটে টিউশনি করত—"

বাধা দিয়ে বিজয়বাবু বললেন, "এক ঘণ্টা ত্রিশ মিনিট নয়,

এক ঘণ্টা পনের মিনিট। মশাই, মাসীমা আমার রোজগার কমিয়ে দিলেন। এখন একটাই করি।”

“তা কি করব বাছা? মাসীমার হোটেলে যারা থাকবে তাদের নীতি একটা মানতেই হবে। বিজয়ের কীর্তিটা তা হ'লে শোন।”

“আমি উঠছি মাসীমা। তুটো নতুন কোষ্ঠী তৈরির অর্ডার পেয়েছি।”

এই ব'লে চণ্ডী ভটচাজ উঠলেন। বিজয়বাবু হাসতে হাসতে বললেন, “মাত্র তুটো? তা হ'লে জ্যোতিষসম্রাট হ'তে আপনার কত দিন লাগবে ভটচাজ মশাই?”

“সম্রাট হওয়ার দরকার কি?” জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বিজয়বাবুর দিকে চেয়ে মাসীমা বললেন, “সম্রাটদের যুগ শেষ হ'য়ে গেছে। চণ্ডী যা রোজগার করে তার একটি পয়সাও কালো নয়। পয়সা ওরা চেনে। প্রাচীন কালে ভটচাজদের গঙ্গা দিয়ে চাঁদসদাগরের নৌকো চলত। মহীতোষ, তুমি বোধ হয় জান না যে, একসময়ে গড়িয়ার ওপাশ দিয়ে পঞ্চবটির গা ঘেঁষে গঙ্গাব ছিল গতি। শোনা যায়, চাঁদসদাগর পঞ্চবটীর কালীমন্দিরে যাওয়া-আসার সময় পুজো দিয়ে যেতেন। এখন সেই গঙ্গা বহু দূরে স'রে গিয়েছে, কিন্তু নামটা র'য়ে গেছে। আমার বাপের বাড়ীর সামনের পুকুরটাকে ঘোষেদের গঙ্গা বলে। চণ্ডীদেরটার নাম তো শুনলেই। যারা চাঁদসদাগরের পুণ্যি পেয়েছে তারা পয়সা চেনে। কালো পয়সাতে ওবা হাত দেবে না। বিজয়, তোমার সেই গল্পটা বলব নাকি?”

“ও তো শুধু আমার একলার গল্প নয়—”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই তো বলি বিজয় বাঁড়ুয্যে হচ্ছে এ অঞ্চলের একমাত্র আদর্শ শিক্ষক। কিন্তু বাবা প্রথম যখন এখানে থাকতে এলে, তখন কি ছিলে? বুঝলে মহীতোষ, এক ঘণ্টা পনের মিনিটের মধ্যে বিজয় চারটে টিউশন ক'রে বাড়ী ফিরে আসত। ইস্কুলে যা মাইনে পেত তার চেয়ে বেশী রোজগার ছিল বাইরে। কিন্তু আমার কেমন সন্দেহ হ'ল,

কচি কচি ছেলেগুলোর পরকাল নষ্ট করছে আমাদের বিজয়। বিপ্রদাসবাবু দেখি একদিন সন্ধেবেলা এখানে এসে উপস্থিত। উনি ওই রক্ষিতের মোড়ে থাকেন। তাঁর ছেলেকে বিজয় প্রাইভেটে পড়াত। বিপ্রদাসবাবু বললেন যে, তাঁর মেজো ছেলে প্রথম হ'য়ে ক্লাসে প্রমোশন পেয়েছে। পাস করার মত ছেলে সে নয় ব'লেই তো-তিনি বাড়ীতে মাস্টার রেখেছিলেন। সে প্রথম হ'ল কি ক'রে? আর তাও মাত্র ছ'মাস মাস্টার রাখবার পরে! এমন পয়লা নম্বরের সোনার-চাঁদ তো বিপ্রদাসবাবুর তিন পুরুষের মধ্যে একটিও জন্মায় নি। ছেলেকে ডেকে নিয়ে এসে তিনি পরীক্ষা করতে বসলেন। তিনটি সরল অঙ্কের মধ্যে তিনটিই সে ভুল করল। এক লাইন বাংলা লেখার মধ্যে পাঁচটা বানান ভুল। তার পর—"

মাসীমার গল্প বলার ভঙ্গি দেখে চণ্ডী ভটচাজ হাসছিলেন। বিজয়-বাবু মাথা নিচু ক'রে বসেছিলেন। আমি শুধু গল্প শুনছিলাম না, সমগ্র সরকার-কুঠির চরিত্রটা বোঝবার চেষ্টাও করছিলাম। পলস্তারা-খসা ভাঙাচোরা বাড়ীটার মেরুদণ্ড এখনো খুবই মজবুত। বোধ হয় মাসীমা তাঁর নিজের মেরুদণ্ডের বাঁধুনি দিয়ে সরকার-কুঠির মেরুদণ্ড খাড়া রেখেছেন। অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে মাসীমার গল্প শুনতে লাগলাম।

তিনি বিজয়বাবুর দিকে চেয়ে বললেন, "এতে লজ্জার কিছু নেই বিজয়, বরং অপরাধ স্বীকার করার মধ্যে গৌরব আছে। শুনেছি খ্রীস্টভক্তরা পুরোহিতের কাছে গিয়ে সদাসর্বদা নিজেদের পাপের কথা কবুল ক'রে আসে। নিয়মটা ভাল। গল্পটা এবার শোন। তার পর বিপ্রদাসবাবু বোধ হয় ছেলেটাকে মারধোর করলেন। ওমা, মার খেয়ে ছেলেটা বলে কি জানো? বলে যে, পরীক্ষার প্রশ্নগুলো ওর জানাই ছিল। জানিয়েছে বিজয়। মাস্টারীতে ওর খুব নাম। ওর ছেলেরা সব ভাল নম্বর পেয়ে পাস করে। বিপ্রদাসবাবু যখন এলেন বিজয় তখন বাড়ী ছিল না। তাঁর কথা শুনে আমার তো

ম'রে যেতে ইচ্ছে করছিল। ওর হ'য়ে আমি বিপ্রদাসবাবুর কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিলুম। জানি, এমন অপরাধের ক্ষমা নেই। পৃথিবীর সর্বত্রই তো শিশুবধকে মহাপাপ মনে করে। বিপ্রদাসবাবু যাওয়ার সময় দুঃখ ক'রে ব'লে গেলেন, একা বিজয়বাবুকে দোষ দিয়েই বা কি করব? হয়তো আরও অনেকে এমন কাজই ক'রে বেড়াচ্ছেন। নীতিহীন মানবসমাজের ভবিষ্যৎ আমি দেখতে পাচ্ছি। কাল থেকে বিজয়বাবুর আর পড়াবার দরকার নেই। ওদের ইস্কুলেও আর ছেলেটাকে রাখা চলে না। বললুম, বিজয়কে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কাল থেকে সে শুধু আপনার ছেলেকেই পড়াবে। মাইনে যা আপনি দিচ্ছেন, তাই-ই দেবেন। বিপ্রদাসবাবু তাঁর স্বীকৃতি জানিয়ে ছড়ি দোলাতে দোলাতে এই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মহীতোষ, আমি যেন দেখলুম বিপ্রদাসবাবুর চতুর্দিকে শতাব্দীর অন্ধকার ক্রমশই ঘন হ'য়ে আসছে। তিনি ছড়ির আঘাতে অন্ধকার দূর করবার চেষ্টা করছেন বটে, কিন্তু পারছেন না। ছুটে গেলাম পেছন দিকে। গড়িয়ার খালে দেখলাম মাত্র এক ফুট জল! মরতে পারলাম না। লালুও তো ঠিক এইখানেই মরেছে। তার তপ্ত নিশ্বাস আমার গায়ে লাগতে লাগল। ব'সে পড়লুম মাটিতে। কি যেন খুঁজছিলাম আমি। হঠাৎ মনে হ'ল পেলুম বুঝি! কিন্তু আর কি পাওয়া যায়? লালুর ঘাড়ের রক্ত শুকিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। বিপিন চাটুজ্যের হাতে আজ নতুন অস্ত্র। হ্যাঁ রে, তোরা কি কেউ ওর হাত থেকে অস্ত্রটা ছিনিয়ে নিতে পারিস না? সুয়েজ খালের ওপারের লোকগুলোর জন্যে তোরা কেঁদে মরছিস, লালুর জন্যে একটু কাঁদ। সারা দেশ যে ওকে ভুলে গেল রে।"

আমি বললাম, "মাসীমা, আপনি একটু স্থির হ'য়ে বসুন। বিজয়বাবু, কাউকে দিয়ে দু' পেয়ালা চা আনানো যায় না?"

"ঠাকুরকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। মাসীমা, এ গল্প তুমি আর কোনদিনও কাউকে বলতে পারবে না।"

"না বাবা, আর বলব না। লালু প্রতিশোধ নিয়েছে। কুশিক্ষার বিষ খেয়ে হাজার হাজার লালু আজ আত্মহত্যা করছে। তা করুক, আমি তো তা বন্ধ করতে পারব না। যাচ্ছিস বিজয় ?"

"হ্যাঁ। তোমাদের চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

"টাকাগুলো যে মাটিতে প'ড়ে রইল—"

মাটি থেকে তিনখানা দশ টাকার নোট কুড়িয়ে নিয়ে বিজয়বাবু বললেন, "তোমার কাছে রেখে দাও। এ মাসের টাকা তোমার শোধ হ'য়ে গেল। বিপ্রদাসবাবুর কাছ থেকে আজ মাইনে পেয়েছি। মাসীমা, এই টাকাটা হ'ল আমার নতুন স্তুরুর প্রথম উপার্জন।"

নোট তিনখানা হাতে নিয়ে মাসীমা বললেন, "এ টাকা কালো নয়।"

চণ্ডী ভটচাজ আগেই চ'লে গিয়েছিলেন। বিজয়বাবুও গেলেন। মাসীমাকে একলা পেয়ে এবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "মিসেস রায় কেমন আছেন ?"

"না বাবা তেমন ভাল নেই সে।" মাসীমা উঠে পড়লেন।

"তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।"

"দেখি, সে নিচে নামতে পারে কি না।" মাসীমা এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে।

পেছনে পেছনে আমিও গেলাম। অনুরোধ করলাম, "তাঁর কাছে আমায় একবার নিয়ে চলুন না। তিনি নিজেই আমায় আসবার জন্যে বলেছিলেন।"

"কিন্তু তা তো হয় না। তপা তো ঘরে একলা থাকে না, অন্য একজনও থাকে।"

"বেশ, বেশ"—মাসীমার সঙ্গে সঙ্গে আমিও বাইরে বেরিয়ে এলাম, "আজ থাক, কাল আবার আসব। মিসেস রায়কে বলবেন—"

"তুমি চা খেয়ে যেয়ো মহীতোষ।" এই ব'লে একতলার অন্ধকারে

তিনি অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন। সেই অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়লেন সরকার-কুঠির মালিক শ্রীবসন্তকুমার সরকার, এখানকার মেসোমশাই। তিনি বললেন, "চলুন একসঙ্গে ব'সে চা খাওয়া যাক। গড়িয়ার ইতিহাস শুনতে আপনার ভালই লাগবে।"

সুতপার বিবৃতি

ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে মহীতোষের কথা মনে পড়ল প্রথম। কি ক'রে যে সে এত কাছে এসে পড়ল ভেবে আশ্চর্য হলাম খুবই। পুরুষ-মানুষকে কাছে আসতে দেব না ব'লেই তো আমি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা চেয়েছিলাম। প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে টাকাগুলো আমি মুঠোর মধ্যে ধ'রে রেখেছিলাম সারাদিন। রাত্রে বিছানায় গিয়ে যখন এলিয়ে পড়লাম তখন একশ' টাকার বড় নোট তুখানা আমার সঙ্গেই ছিল। সে রাত্রির রোমাঞ্চ আমার নারীজীবনের একমাত্র কুশল-সংবাদ।

আমার তু'পাশে নোট তুখানা প'ড়ে ছিল। ঘরে আলো জ্বেলে রেখেছিলাম। সারারাত তেল পুড়ল। ওদের ভাল ক'রে দেখবার জন্যে পলতের মুখে আগুন রেখেছিলাম প্রচুর। ভোর না হওয়া পর্যন্ত আগুনের তেজ সেদিন কমে নি।

শুধু একটা রাত্রির মধ্যে তাদের দেখবার সাধ আমার ফুরিয়ে যায় নি। দ্বিতীয় দিন মধ্যরাত্রে মনে হয়েছিল, তুটো নোট জোড়া লেগে এক হ'য়ে গেল। ক্রমে ক্রমে তার হাত-পা গজাল। চোখও ফুটল শ টাকার নোটের। তৃতীয় রাত্রির সুরুতে বোধ হয় সেই কাগজখানাই পুরুষমানুষ হ'ল।

দেখতে বেশ লম্বাচওড়া। লাল টুকটুকে ঠোঁটের ভাঁজে মৃতু মৃতু হাসি। আমি দেখলাম, লোভের ঢেউ লেগে লেগে হাসির রেখাটি ভাঙছে। তার পর পলতেটার পরমায়ু গেল ফুরিয়ে। ঘরময় অন্ধকারের নেশা। আমার দেহের সৈকতে পূর্বরাগের পুলক।

আর বেশীদূর ওকে এগোতে দিই নি। ঘটনাটা পাঁচ বছরের পুরনো, তবু আমার মনে আছে ওকে আমি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম মেঝের ওপর। পা-দিয়ে মাড়িয়ে দিয়েছিলাম শ টাকার নোট। সেই রাত্রির ইতিহাসে আজও বোধ হয় আমার হিংস্রতার দাগ

লেগে আছে। আমার নবলব্ধ স্বাধীনতার প্রমাণ আমি রেখে এসেছি!

দু শ টাকা আমার প্রথম উপার্জন। আমার একলার। আমার মুঠোর মধ্যে শ টাকার নোট দুখানা মাথা গুঁজে প'ড়ে ছিল বাহাত্তর ঘণ্টার ওপর। ওদের আর্তনাদের ভাষা আমি অনুভব করেছি বটে, কিন্তু মুক্তি তাদের দিই নি। মাত্র বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে আমি বুঝেছিলাম, সমাজের মুঠো এবার আলগা হয়েছে। আমার জীবনের পঁচিশটা বছর তারই মুঠোয় আবদ্ধ হ'য়ে ছিল।

চতুর্থ দিন সকালবেলা মাসীমাকে বলেছিলাম, "এই নাও টাকা। এবার থেকে আমরা তোমার সত্যিকারের পেইং গেস্ট হলাম।"

"কাল বুঝি মাইনে পেয়েছিস?" জিজ্ঞাসা করলেন মাসীমা।

বললাম, "কাল নয়, মাইনে পেয়েছি পয়লা তারিখে।"

"তবে যে পয়লা তারিখে আমি টাকা চাইলাম, তুই বললি—না বাপু তোদের ব্যাপার কিছু বুঝি না। দিগম্বর মুদী কাল আমায় জানিয়ে গেছে বাকিতে আর এক পয়সার নুনও দিতে পারবে না। তপা, তোরা কি মাসীমার দুঃখ কোন দিনই দেখতে পাবি নে? এবার বোধ হয় হোটেলের দরজা বন্ধ করতে হবে। পরের ঝক্কি ব'য়ে বেড়াবার বয়স আর নেই।"

নোট দুখানা মাসীমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলেছিলাম, "পরের ঝক্কি বইবে না তো কি করবে তুমি? তোমার নিজের ঝক্কি তো কিছু নেই। মাসীমা, তোমার হোটেলের দরজা খোলা রেখেছেন পঞ্চানন ঠাকুর। চেষ্টা করলেও তুমি বন্ধ করতে পারবে না।"

"না বাপু, তোদের কথা আমি বুঝি না। পয়লা তারিখে টাকা ক'টা দিয়ে দিলে দিগম্বর কাল আমায় এমন ক'রে কথা শোনাতে পারত না।"

মনের কথা সেদিন মাসীমার কাছে চেপে গিয়েছিলাম। পয়লা তারিখে কেন টাকা দিই নি তার কারণটা তাঁকে বলি নি। দিগম্বরের

অপমান তাঁকে বিঁধেছিল। পরে একদিন বলেছিলাম, "মাসীমা, প্রথম মাসের মাইনে যেদিন পেলাম সেদিন আমার কি মনে হয়েছিল জান?"

"তুই বল, আমি শুনি।"

"আমার সারা জীবনের দাসত্ব সব ঘুচে গেল।"

"বলিস কি তপা? এই তো সেদিন দস্যু ইংরেজরা দেড় শ' বছরের দাসত্ব সব ঘুচিয়ে দিয়ে ভারতবর্ষের বন্দর থেকে বিদায় নিয়ে গেল—ওরে ওরা যে গেল তাও তো কম দিন হয় নি—" মনে মনে হিসেব ক'রে মাসীমাই আবার বললেন, "হ্যাঁ, পাঁচ বছর হ'য়ে গেছে। অথচ তুই বলছিস তোর দাসত্ব ঘুচল এ মাসের পয়লা তারিখে!"

"মাসীমা, তুমি ছাড়া আমার মনের কথা কেউ বুঝবে না। ইংরেজদের সঙ্গে আমার পরিচয় খুব কম। কিন্তু তুমি নিজেই তো দেখেছ, সমাজ আমায় মুক্তি দেয় নি। স্বদেশের চেনা লোকগুলোই তো আমার পায়ে শেকল পরিয়েছিল। এবার আমি স্বাধীন। টাকার স্বাধীনতা যার নেই সে তো সর্বহারা! মাসীমা, পয়লা তারিখে তোমায় টাকা দিই নি তার কারণ, আমি পরীক্ষা ক'রে বুঝতে চেয়েছিলাম যে, সত্যিই আমি স্বাধীন কিনা। কোন্ তারিখে টাকা দেব তা কি আমার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না? করে, নিশ্চয়ই করে। ইচ্ছে না থাকলে তোমায় আমি চার তারিখের সকালবেলায়ও টাকা দিতাম না।"

"দিগম্বর যে আমায় অপমান করল?"

"আমার মুক্তির দিনটিতে দিগম্বরের কথা মনে পড়ে নি।"

আমার কথা শুনে মাসীমা সেদিন কি ভেবেছিলেন জানি না। জানবার চেষ্টাও করি নি।

মহীতোষ আজ আসবে। সে আমায় ময়দান থেকে তুলে নিয়ে এসে সরকার-কুঠিতে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়োজন আমি অস্বীকার করি নি। সেই জন্যেই আমি তাকে

দ্বিতীয় বার আসবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। সে এসেছিল। আমার সঙ্গে দেখা হয় নি। একতলায় নেমে আসবার মত শক্তি আমার ছিল না। বুকের ডান দিকটাতে আঘাত লেগেছিল খুব। মাসীমা দেখেছিলেন, আধ ইঞ্চির মত গর্ত হয়েছিল দুটো পাঁজরার মাঝখানে। মাসীমার বিশ্বাস, জুতোর তলায় লোহার নাল বাঁধা না থাকলে ক্ষতের গভীরতা আধ ইঞ্চির চেয়ে কমই হ'ত।"

আমি আরোগ্য হ'য়ে উঠেছি। পনের দিনের বেশী ছুটি আমায় নিতে হয় নি। মহীতোষের কাছে শুনেছি, লাহিড়ী সাহেব আমার খোঁজ নেন নি। মাদ্রাজী স্টেনোর কাজ তিনি পছন্দ করেন। পছন্দ যে করেন তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। পনের দিন পরে কাজে যোগ দেওয়ার সময় ছোট সাহেবের সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয় তখন তিনি ফাইলের দিকে চেয়ে বলেছিলেন, "আরও দু'এক মাসের ছুটি নিলেই তো পারতেন। বড্ড শুকিয়ে গেছেন।"

তিনি বোধ হয় সেই মুহূর্তে সুয়েজ খালের কথা ভাবছিলেন। খালটায় প্রচুর জল থাকা সত্ত্বেও একটা জাহাজও ভারতবর্ষের বন্দরে এসে পৌঁছতে পারছে না। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সুরুতেই লাভের অঙ্ক শুকিয়ে যাচ্ছে। আমি জানি, তিনি আমায় দেখেন নি। আগের চেয়ে শরীর আমাব খারাপ হয় নি। আমি এত বেশী রোগা যে শুকিয়ে যাওয়ার মত আধ ইঞ্চি মাংসও আমার উদ্বৃত্ত নেই। আমি তাঁকে বলেছিলাম, "আমি ভাল হ'য়ে উঠেছি। ছুটি নেওয়া দরকার নেই সার।"

"তা হ'লে নোট নিন।" এই ব'লে ছোট সাহেব ফাইল নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিলেন। ব্যস্ততার মাঝখানে হঠাৎ তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "বেশী দিনের ছুটি চেয়ে আপনি কি বড়বাবুর কাছে লোক পাঠান নি?"

"না সার।"

"তা হ'লে—আচ্ছা নোট নিন। হ্যাঁ দেখুন, আজ যেন পাঁচটার

সময় চ'লে যাবেন না, পাঁচটার পরেও কাজ করতে হবে। খুব প্রেসার আছে আজ। চিঠিপত্র অনেক জ'মে রয়েছে। গত পনের দিনে কোন কাজই হয় নি। সুন্দরম্ ব'লে যে মাদ্রাজী ছেলেটি আছে তার স্পীড বড় কম।"

বললাম, "ছেলেমানুষ, আস্তে আস্তে স্পীড তার বাড়বে।"

তার পর তিন মাস কেটে গেছে। মহীতোষ এর মধ্যে সরকার-কুঠিতে এসেছে বারদশেক। কিন্তু কয়েক দিন তার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। পাঁচটার মধ্যে তাকে গড়িয়ায় পৌঁছবার সময় দিয়ে আমি গড়িয়া থেকে বেরিয়ে এসেছি তিনটের আগে। রবিবারের ছুটির দিনগুলো আমি সরকার-কুঠিতে ব'সে নষ্ট করতে চাই নি। একদিন মাসীমা আমায় বলেছিলেন, "তপা, মহীতোষ সেই রাত আটটা পর্যন্ত ব'সে ব'সে চ'লে গেল। এ কি রকম ব্যবহার?"

"কেন? কি করলাম?"

"তুই তাকে পাঁচটার সময় আসতে বলেছিলি না?"

"বলেছিলাম। তোমরা কি তার সঙ্গে কথা কও নি?"

"মহীতোষ আমাদের সঙ্গে কথা কইতে আসে না। তুই তো খুকী নোস—তোকে কি আমায় নতুন ক'রে বর্ণপরিচয় শেখাতে হবে? তা ছাড়া এই নিয়ে তুই বোধ হয় চার দিন ওর সঙ্গে ইয়ারকি মারলি।"

"ইয়ারকি?"

"তা নয় তো কি? ওকে পাঁচটার সময় আসবার জন্যে ব'লে এলি আর তুই রাত ন'টা পর্যন্ত বাড়ি নেই! হ্যাঁ রে, ব্যাপারটা কি?"

ভেবে চিন্তে মাসীমাকে জবাব দিয়েছিলাম, "পরীক্ষা ক'রে দেখলাম, আমার স্বাধীনতা আজও অটুট আছে কিনা। শুধু কথা দেওয়ার অধিকার থাকলে চলবে কেন? কথা ভাঙার অধিকারও আমার থাকা চাই। মাসীমা, পরাধীনতার ফাঁস অনেক সময় চোখে দেখে চেনা যায় না, হাত দিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখতে হয়।"

"বলিস কি তপা! ওই মহীতোষই না তোকে ময়দান থেকে তুলে নিয়ে এসেছিল ?"

"আবার ওই মহীতোষরাই একদিন পায়ের তলায় মাড়িয়ে দিতে পারে।"

"না বাপু তোর কথা আমি বুঝতে পারি না। ওরে ও তপা, বল্ তো কি চাস্ তুই ?"

"আগুন। শতাব্দীর গায়ে গলিত মাংসের কুচিগুলো বাত্নুড়ের মত ঝুলছে। আগুনের গোলা মেরে মেরে ওদের পুড়িয়ে দিতে চাই। এ আগুন কেউ নেবাতে পারবে না। গড়িয়ার খালে জল নেই। মাসীমা, কাল যখন আমি ফিরলাম তখন বেশ রাত হয়েছে। খালের দিক থেকে কি রকম একটা আওয়াজ আসছিল। আমি গিয়ে উপস্থিত হলাম তোমাব গোয়ালের পিছন দিকটাতে। তুমি বল, ওই জায়গায় জলেব গভীবতা সবচেয়ে বেশী। দেখবার জন্যে মুখ নিচু করলাম আমি। হঠাৎ আমার মাথার ওপব দিয়ে হাওয়া বইতে লাগল, গরম হাওয়া। হাওয়াতে আওয়াজ ছিল। মুহূর্তের মধ্যে আমি দেখলাম, জল সব শুকিয়ে গেল! খালের বুকটা আমাব চেয়েও শুকনো হ'য়ে উঠল। মাসীমা, কাল রাত্রে লালুদার নিশ্বাস আমার গায়ে লেগেছে।"

হাতেব পাঞ্জা প্রসারিত ক'রে মাসীমা তাঁর ছু'হাত দিয়ে কান ছুটো ঢেকে ফেলেছিলেন।

সকালের দিকে ঘুম ভাঙল আজ। ববিবার ব'লে বিছানায় শুয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। ওপাশের খুপরিটাতে কোন সাড়াশব্দ নেই, রতন এখনও ঘুমুচ্ছে। গত ছু'রাত্রি খুবই কষ্ট পেয়েছে সে।

বতন আগে আমার ঘবেই ঘুমোত, আলাদা বিছানায়। গত এক মাস থেকে ওকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমারই ঘরের সংলগ্ন ছোট্ট একটা বারান্দা ছিল, কঞ্চির বেড়া দিয়ে বারান্দাটাকে ঘিরে দিয়েছেন মাসীমা। খরচ যা লেগেছিল সবই আমি দিয়েছি।

বিছানায় শুয়ে টেবিলের দিকে হাত বাড়ালাম। ঘড়িটা টেনে নিয়ে দেখলাম পৌনে আটটা। এবার উঠতে হয়। মহীতোষকে আসতে বলেছি বারোটার মধ্যে। মহীতোষ আজ মাসীমার হোটেলে খেতে আসবে, কাল তাকে আমি নেমন্তন্ন ক'রে এসেছি। বলরামকে নিয়ে ষষ্ঠীদার বাজারে যাওয়ার কথা আছে। বেশী খরচার জন্যে কাল রাত্রিতেই ষষ্ঠীদাকে কুড়িটা টাকা আমি দিয়ে রেখেছিলাম। বোধ হয় এতক্ষণে সে ফিরে এসেছে।

হাতমুখ ধুয়ে তৈরী হ'তে মিনিট পনের লাগল। ছুটির দিনে বিন্দুমাত্র তাড়া ছিল না। তবুও তাড়াতাড়ি কাপড়-চোপড় বদলে নিয়েছি। একতলায় নামতে হবে, রান্নার দায়িত্ব শুধু মাসীমার একলার নয়, আমারও। হ্যারিসন রোডের হোটেলে যা রান্না হয় তার স্বাদ নাকি গত পাঁচ বছরের মধ্যে একটুও বদলায় নি। মহীতোষ আজ নতুন স্বাদের অন্বেষণে সরকার-কুঠিতে আসছে।

সিঁড়ির মুখেই দেখা হ'য়ে গেল ষষ্ঠীদার সঙ্গে। বলরামের মাথায় মস্ত বড় ঝুড়ি। পোনা মাছের ল্যাজটা ঝুড়ির ওপর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে রয়েছে। ষষ্ঠীদা সেই দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল, হাসিতে তার জয়ের বিজ্ঞাপন। বাজারের সবচেয়ে বড় পোনা মাছটা আজ তার সামর্থ্যের ঝুড়িতে লম্বা হ'য়ে শুয়ে রয়েছে।

আমাকে দেখে বলরামও দাঁড়িয়ে রইল। চৌদ্দ বছর বয়সের বলরামের মাথায় কুড়ি টাকার বাজার! আনন্দে আর গর্বে বলরাম তার বুকের ছাতি চওড়া করবার চেষ্টা করছিল। খালি গা, শার্ট দুটো আজকাল ষষ্ঠীদার বাক্সেই থাকে। আমি দেখলাম, কুড়ি টাকার সওদা থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে জল পড়েছে বলরামের বুকে। হঠাৎ মনে হ'ল, সারাটা পথ সে কাঁদতে কাঁদতে আসছে, হয়তো কেঁদেছে, কিন্তু এ কান্না আনন্দের।

ষষ্ঠীদা বলরামকে ইশারা করল। তারপর দুজনে চ'লে গেল রান্নাঘরের দিকে। সিঁড়ির মুখে আমিই শুধু দাঁড়িয়ে রইলাম একা।

দাঁড়িয়ে থাকতেই আমি চেয়েছিলাম। পেছন থেকে ষষ্ঠীদাকে দেখছিলাম আমি। লোকটির মধ্যে কি অদ্ভুত পরিবর্তন এসেছে!

মাসীমার হোটেলে আমার চেয়েও ষষ্ঠীদা পুরনো বাসিন্দা। ষষ্ঠীদাকে কেউ কখনও কথা বলতে শোনে নি। হ্যাঁ এবং না দুটি শব্দ দিয়েই সে সারা পৃথিবীর সঙ্গে কথার সম্পর্ক বজায় রেখেছে। মেসোমশাই বলেন, গত দশ বছরের মধ্যে ষষ্ঠীদা নাকি দশটার বেশী কথা বলেনি। এমন একটি অবাঙালী চরিত্রের দিকে চেয়ে মাসীমা বলেন, "ষষ্ঠীর মনে বিদ্বেষ আছে। হয়তো এ বিদ্বেষ ওর সংসারের প্রতি, কিন্তু এমন নিঃশব্দে তো কাউকে কখনও বিদ্বেষ পোষণ করতে দেখিনি। তপা, এই ধরনের বিদ্বেষ বড় সাংঘাতিক—এর চেয়ে মারাত্মক রকমের বিষ সাপের মুখে তো দূরের কথা, বৈজ্ঞানিকদের বইয়ে পর্যন্ত নেই।"

মাসীমার কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু অবিশ্বাসই 'বা করি কি ক'রে?

একতলার চানঘরের পাশে ষষ্ঠীদা থাকে। ঘরখানা খুবই ছোট, চানঘরের ভেজা আবহাওয়া সারা দিনে শুকোয় না ব'লে তার নিজের ঘরখানা আর্দ্রতার আক্রমণ থেকে মুক্তি পায় না। মেসোমশায়ের কাছে শুনেছি, ষষ্ঠীদা যখন প্রথম এল তখন সে দোতলার বড় ঘরখানাতেই ছিল। মাসের প্রথম তারিখে টাকাপয়সা সে চুকিয়েও দিত। তার পর বছর তিন পরে তাকে নিচে নেমে আসতে হয়। হয়তো সরকার-কুঠির পলস্তারার মত তার আয়ের পলস্তারাও খ'সে পড়েছিল। অল্প ভাড়ার সবচেয়ে খারাপ ঘরে এসে তাকে একদিন আশ্রয় নিতে হ'ল। ষষ্ঠীদার অতীত ইতিহাস হয়তো মাসীমাই শুধু জানেন।

বিজয়বাবু নাকি মাঝে মাঝে মাঝরাত্রিতে দেখেন যে, লণ্ঠন জ্বালিয়ে ষষ্ঠীদা বুকের তলায় বালিশ দিয়ে বিছানায় শুয়ে লেখাপড়া করে। বিজয়বাবু উঁকি দিয়ে দেখেছেন, ষষ্ঠীদার হাতে কলম, ফাউণ্টেন

পেন। সামনে তার একটা বাঁধানো খাতা। বিজয়বাবুর খবর শুনে মাসীমা সেদিন হেসে হেসে খুন! তিনি আমাদের ডেকে বলতে লাগলেন, "বিজয় মাস্টারের কথা শোন্—ষষ্ঠীর হাতে নাকি ও ফাউণ্টেন পেন দেখেছে?"

আমি ব'লেছিলাম, "বিজয়বাবু হয়তো ঠিকই দেখেছেন। কেন, ষষ্ঠীদা কি ফাউণ্টেন পেন কিনতে পারে না?"

"পারবে না কেন? ষষ্ঠীর যদি একটা ফাউণ্টেন পেন থাকে, আমি নিশ্চয়ই দেখতাম। ষষ্ঠীর যা ঐশ্বর্য তার কোন কিছুই গোপন নেই। তা ছাড়া, কলম দিয়ে ও কি লিখবে? বিজয় বোধ হয় হাতে ওর তুলি দেখেছে। ষষ্ঠী আজকাল প্রধান নায়িকাদের ছাড়া অন্য কারও মুখে রং মাখায় না। চিত্রতারকাদের বাড়ী যায় ষষ্ঠী। ও হচ্ছে গিয়ে আজকাল ও-লাইনের শিল্পীসম্রাট। বলি ও বিজয়, তোমার কি ইস্কুলে যাওয়ার সময় হয় নি? পুরো মাইনে নিচ্ছ, লেট হ'লে চলবে কেন? ষষ্ঠীকে নিয়ে অমন ঠাট্টা ক'রো না বাছা। লেখাপড়ার লাইন হচ্ছে গিয়ে তোমাদের—হ্যাঁ রে তপা, তোরও কি আজ আপিস নেই? লেট হ'লে ছোটসাহেব রাগ করবেন না?"

মাসীমা জানতেন, সেদিন আমাদের আপিস বন্ধ ছিল। তবুও তিনি আমায় আপিসে যাওয়ার জন্যে তাগাদা দিতে লাগলেন বার বার। আমি বুঝতে পারলাম, ষষ্ঠীদার গোপন খবর নিয়ে তিনি আর আলোচনা করতে চান না। হয়তো তিনি মনে মনে ব্যথা পেয়েছেন। তিনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতেন যে ষষ্ঠীদার কোন ঐশ্বর্যই তাঁর চোখে গোপন নেই। কিংবা ফাউণ্টেন পেনের গোপন ঐশ্বর্য তিনি একাই জানতে চান ব'লে মাসীমা আমাদের সামনে হেসে হেসে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

রান্নাঘরে এসে দেখি বলরাম মাথা থেকে ঝুড়িটা নামিয়ে ফেলেছে। ষষ্ঠীদা লিস্ট দেখে দেখে জিনিসগুলো সব মিলিয়ে মেঝের উপর রাখছে। মাসীমা ব'সে ছিলেন সামনেই।

সরকার-কুঠিতে দু'জন রাঁধুনি বামুন দরকার, কিন্তু শম্ভু ঠাকুর একলাই রাঁধে। মাসীমাকে অবশ্য সারা সকালই রান্নাঘরে থাকতে হয়। তিনি বলেন, "ভাড়া করা লোক দিয়ে সংসারের সব কাজ চলে না। বিশেষ ক'রে খাবার জিনিস মেয়েদের হাতেই থাকা উচিত।"

আমাকে দেখতে পেয়ে মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই এখানে কি করতে এলি ?"

বললাম, "তোমাকে খানিকটা সাহায্য করতে চাই।"

"সাহায্য ? ও বুঝতে পেরেছি—বলরাম, মাছটা তোল তো ঝুড়ি থেকে।" মাসীমা মুখ নিচু ক'রে হাসতে লাগলেন।

আমি জানি, মাসীমা আমায় ভুল বুঝলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, "হাসছ যে ?"

"না বাপু, দু'একটা রান্না তুই নিজে হাতে আজ রাঁধ্। হ্যাঁ রে, মহীতোষ তো বাঙাল, খুব ঝাল খায় বুঝি ?"

ঝুড়ি থেকে মাছটা টেনে তুলতে গিয়ে বলরাম দেখি চেয়ে রয়েছে মাসীমার দিকে। হাত থেকে ওর পোনামাছটা প'ড়ে গেল মেঝের উপর। রান্নাঘর থেকে সে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

আমি বললাম, "কোথায় যাচ্ছিস বলরাম ? দাঁড়া, মাছটা যে তোকেই কেটে দিতে হবে।"

"পারব না।"

"কেন ? এত বড় মাছ মাসীমা তো কাটতে পারবেন না।"

"আমিও পারব না—"

"কেন, কি হ'ল ?"

"তোমরা আমাদের বাঙাল বল কেন ?"

বলরামের কথা শুনে মাসীমা উঠে এসে ওকে জড়িয়ে ধরলেন। হাসতে হাসতে বললেন, "আয় বাছা, আয়—পেটে ভাত নেই, কিন্তু মেজাজ আছে ষোল আনা। বলরাম, তুই যদি মাছটা কেটে না দিস, তা হ'লে আমরা সবাই আজ উপোস ক'রে থাকব !"

বলরাম ফিরে এল। আমি এবার বললাম, "ষষ্ঠীদা যে তোকে দিনরাত রিফিউজীর বাচ্চা ব'লে গাল দেয় তখন তো তোর গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগে না—"

বঁটির মুখে পোনামাছের ঘাড়টা ঠেকিয়ে দিয়ে বলরাম বলল, "ষষ্ঠীদা আমায় গাল দেয় না, ভালবাসে।"

পোনামাছ তখন দু'টুকরো হ'য়ে মাটিতে প'ড়ে গেছে। মাসীমা মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললেন, "ভালবাসে? তোকে কেন ভালবাসতে যাবে রে মুখপোড়া? ষষ্ঠী কি তার মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে দেবে?"

"ষষ্ঠীদা নিজেই তো বিয়ে করে নি।" এই ব'লে বলরাম উঠে পড়ল। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে সে বলল, "আমি আসছি, টাইগারের থালাটা নিয়ে আসি। রক্তটুকু ধ'রে রাখব।"

তাজা মাছ, ঘাড় থেকে অনেকটা রক্ত পড়েছে। মেসোমশাই একটা কুকুর পোষেন। তার নাম হচ্ছে টাইগার। এতদিন কুকুরটার যত্নআত্তি কিছু হয় নি। বলরাম আসবার পর থেকে টাইগারের গায়ে জোর বেড়েছে। রাত্রি জেগে পাহারা দেয় সে। নতুন লোক দেখলে দিনের বেলায়ও চেঁচায়।

বলরাম বেরিয়ে যাওয়ার পরে মাসীমা হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে গেলেন। আমি দেখলাম, তিনি মাছটার ঘাড়ের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন, তাজা রক্ত ক্রমে ক্রমে শুকিয়ে উঠছে। আমি বুঝতে পারলাম, বিয়াল্লিশের সেই পুরনো দৃশ্যটা মাসীমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে।

বলরাম ফিরে আসবার আগে ষষ্ঠীদা বলল, "কুড়ি টাকায় কুলোয়নি তপাদি, তিনটে টাকা তোমার বেশী খরচ হয়েছে। আমি এবার চলি, আজও আমায় ডিউটিতে যেতে হবে।"

"কখন ফিরবে?"

"তিনটের মধ্যে। তোমরা খেয়ে নিও—"

"তা কি ক'রে হয় ষষ্ঠীদা ?"

এই সময় বলরাম ফিরে এসে ঘোষণা করল, "মাসীমা, নতুন লোক এসেছে।"

"ক'জন ?" জিজ্ঞাসা কবলেন মাসীমা।

"একজন।"

"দাঁড়া, আমি যাচ্ছি। তপা, বলরামকে দিয়ে মাছটা কাটিয়ে নিস—"

মাসীমাব পিছু পিছু ষষ্ঠীদাও ঘব থেকে বেরিয়ে গেল।

টাইগাব নতুন মানুষ দেখেছে। বান্নাঘবে ব'সে আমি ওর গলার আওয়াজ পাচ্ছিলাম। বড্ড বেশী ঘেউ ঘেউ কবছে। মাছ কাটতে কাটতে বলবাম বলল, "দুটো বদ্দা খেলেই মুখ ওব বন্ধ হ'য়ে যাবে।"

"দুটোতে বোধ হয় বন্ধ হবে না, এত বেশী বক্ত খাওয়াচ্ছিস ওকে—"

"দেখবে ? যাই—" বলবাম উঠে পড়ছিল, আমি বললাম, "না, থাক, বেলা বাড়ছে, তাড়াতাড়ি বান্না চাপাতে হবে। মসলা-বাটাও হয নি—"

"সব আমি ঠিক ক'বে দেব। আচ্ছা তপাদি, মহীতোষবাবু তোমাদেব আপিসে কাজ কবেন ?"

"হ্যাঁ।"

"আমায় একটা কাজ দাও না তোমাদের আপিসে ? মাইনে বেশী দিতে হবে না।"

"কম মাইনেব কাজ তো আমাদেব আপিসে নেই।"

আমাব কথা শুনে বলবাম গম্ভীব হ'য়ে গেল। অন্যমনস্কভাবে টুকবোগুলো গুনতে লাগল সে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "টাকা দিয়ে কি করবি ?"

"মাসীমাকে দেব। একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না। আমায় তুমি বুঝিয়ে দেবে তপাদি ?"

"দেব। কি কথা রে?"

শম্ভু ঠাকুরের দিকে মাছের থালাটা এগিয়ে দিয়ে বলরাম জিজ্ঞাসা করল, "দু'মুঠো ভাতের জন্যে মানুষকে সারাদিন কাজ করতে হয় কেন? কাজ করলেই খেতে পাব, আর কাজ না করলে উপোস করব এমন নিয়ম কে তৈরি করেছে তপাদি?"

সহসা জবাব দিতে পারলাম না। জবাব দিলামও না। আমি শুধু জিজ্ঞাসা করলাম ওকে, "কাজ করতে তোর ভাল লাগে না?"

"না।"

"তবে কি করতে চাস তুই?"

"বাঁশী বাজাতে চাই।"

"কই, আমরা তো কেউ তোর বাঁশী শুনি নি?"

"টাইগার শুনেছে। আর—আর ষষ্ঠীদাও শুনেছে। গেল রবিবার আমরা তিন জনাতে মিলে হাঁটতে হাঁটতে চ'লে গিয়েছিলাম অনেক দূরে। এখান থেকে প্রায় তিন ক্রোশ দক্ষিণে। ষষ্ঠীদা হাঁফিয়ে পড়ল, একটা পুকুরের পাড়ে এসে বসলাম আমরা। ষষ্ঠীদা বলল, পুকুরটার নাম হচ্ছে মান্নাদের গঙ্গা। পাঁচ-দশ মিনিট জিরিয়ে নিলাম আমি, তার পর বাঁশী বাজাতে লাগলাম। প্রায় এক ঘণ্টা একটানা বাজালাম। ষষ্ঠীদা বলল, 'টাইগার ঘুমিয়ে পড়েছে। এ বাজনা কলকাতার মত ছোট ছোট স্টুডিওতে দাম পাবে না। বলরাম, এ হচ্ছে কুচো চিংড়ির দেশ। তোকে বোম্বাই যেতে হবে, আমি নিয়ে যাব। সেখানকার ফিল্ম কোম্পানীতে আমার কাজের অভাব হবে না। এখন বাড়ী চল, অনেক বেলা হ'য়ে গেল।' তপাদি, আমি বাঁশী বাজাই, দাম দিয়ে কি করব? কিন্তু ষষ্ঠীদা বলে, 'দাম না দিলে টাইগারকে আধখানা গৎও শোনাতে পারবি নে। কলকাতা হচ্ছে গিয়ে নগদ কারবারের জায়গা।' ভাবছি, আমি আবার বাঘা যতীন কলোনীতেই ফিরে যাব।"

টাইগারের গলার আওয়াজ আবার শুনতে পেলাম। বলরাম

বলল, "নতুন লোক দেখেছে, বাবুটি সাহেবের মত দেখতে। আমাদের এখানে মানাবে না।"

"মহীতোষবাবুকে মানাবে?"

"হ্যাঁ—মাসীমার হোটেলের যুগ্যি লোক তিনি। কবে তিনি এখানে থাকতে আসবেন তপাদি?"

ইতিমধ্যে টাইগার দরজার বাইরে অপেক্ষা করছিল, বলরামকে ডাকতে এসেছে সে। একেবারে সম্পূর্ণ নতুন লোক না হ'লে টাইগার এতটা বিচলিত হ'য়ে পড়ত না। বলরামকে বললাম, "যা তো একবার দেখে আয় কে এল।"

একটু বাদে মাসীমা নিজেই এসে ঢুকলেন বান্নাঘরে। একটু কুঁজো হ'য়ে হাঁটেন তিনি। মুখ দেখে কিছুই আমি বুঝতে পারলাম না। বোধ হয় পয়লা তারিখে আগাম টাকা দেওয়ার মত লোক নয়। মাসীমার হোটেলে যারা আসে তারা সব বাকীতে খাওয়ার খদ্দের।

পিঁড়িটা টেনে নিয়ে মাসীমা বসলেন। একটু জিরিয়ে নিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, "আজ তো সরকার-কুঠি একেবারে ভাঙা। দেখাবার মত কিছু নেই এখানে। তবুও সাহেবটি সব দেখতে চাইলেন, বাগানটা দেখলেন ঘুরে ঘুরে। আম আর কাঁঠালগাছগুলো ম'রে যাচ্ছে দেখে দুঃখপ্রকাশ করলেন তিনি। পেছন দিকটাতেও নিয়ে গেলাম, গড়িয়া খালে জল নেই, তাও দেখলেন তিনি।"

"এত বেশী দেখালে কেন, পয়লা তারিখে টাকা দেবেন তো?"

"তা তুই যাই বলিস না কেন, আমাদের চণ্ডীর গণনায় ভুল থাকে না। ও বলে, সময় হ'লে সৌভাগ্য নিজে থেকে মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। তপা, সাহেবটি দোতলার ঘরগুলোও সব দেখলেন। বাইরে থেকে তোর ঘরটাও আমি দেখালাম। দিনদুপুরে দরজায় তালা লাগিয়ে এসেছিস কেন?" প্রশ্ন ক'রে মাসীমাই তাঁর নিজের জবাব তৈরি করলেন, "সৌভাগ্য যখন আসে তখন সে তালা ভেঙেই ঘরে ঢুকে পড়ে। ওরে ও তপা, কাপড়টা বদলে আয়।

মুখে একটু পাউডার মাখিস মা। না, না, নতুন ক'রে কনে সাজতে তোকে বলছি না রে মুখপুড়ী! তোর দিকে যে কেউ একবার মুখ তুলে চায় না—অমন করছিস কেন? মুখ তুলে কেউ চেয়ে দেখলেই গায়ে ফোস্কা পড়ে নাকি? এবার যা, ছোটসাহেব তোকে ডাকছেন।"

"কে!"

"লাহিড়ী সাহেব। গাড়ি নিয়ে একাই বেড়াতে বেরিয়েছিলেন ভোরবেলা। উত্তরভাগ পর্যন্ত গিয়েছিলেন—সাহেবটি বড় ভালমানুষ রে তপা! চা পাঠাচ্ছি—হ্যাঁ রে, মাসীমার হোটেলে আজ তাঁকে খেতে বল্ না। এখানে উদ্বৃত্ত কিছু নেই বটে, কিন্তু অভাবও তো কিছু দেখতে পাচ্ছি নে।"

উনুনে কেটলী চাপালেন মাসীমা।

বসন্ত সরকারের বিবৃতি

॥ এক ॥

বেলা তো কম হয় নি। বোধ হয় বারোটাই বাজল। মহীতোষের আসবার সময় হ'ল। তপা এখনও ফেরে নি। দোতলার বারান্দা থেকে আমি দেখেছি, মেয়েটা তপন লাহিড়ীর সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে বড় রাস্তার দিকে। এখানে দাঁড়িয়ে তাঁর গাড়িটাও আমি দেখতে পেয়েছিলাম। বেশ বড় গাড়ি। চ্যাপ্টা মত, লম্বা ধাঁজের মাস্টার বিয়ুইক। ছাই রঙের ছাউনির তলায় লালরঙের 'বডি'। সুতপা ছোট সাহেবের পাশে গিয়েই বসল।

কলকাতার দিকে গাড়িটাকে ফিরে যেতেও দেখলাম। গড়িয়া খালের ওপর দিয়ে যেতে হয়। বারান্দা থেকে পোলটা স্পষ্ট দেখা যায়। যাওয়ার সময় সুতপা কিছু ব'লে যায় নি। কখন ফিরবে তাও আমরা কেউ জানি না। রান্নাঘরের দায়িত্ব সব শম্ভু ঠাকুরের ওপর পড়ল। লালুর মা তো সেখানে শেষ পর্যন্ত থাকবেনই।

সরকার-কুঠির বড় ফটক দিয়ে মহীতোষকে ঢুকতে দেখলাম। বারোটার মধ্যেই তার আসবার কথা ছিল। মহীতোষ যা বলে তাই করে। বারোটা মানে এগারোটা কিংবা সাড়ে বারোটা নয়। আমি নীচে নেমে গেলাম। বাগানের মাঝামাঝি জায়গায় ওর সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। বললাম, "চল, সরকার-কুঠিটা ঘুরে ঘুরে দেখবে, খিদে পায় নি তো ?"

"না, খানিকটা সময় ঘুরে বেড়ানো যাক।" বলল মহীতোষ।

ওকে নিয়ে আমি চ'লে এলাম সরকার-কুঠির পেছনে। এক সময়ে একটা ভাল রাস্তা ছিল এইখানে। গাড়িবারান্দার সামনে থেকে রাস্তাটা বাগানের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে চ'লে এসেছে খালের কিনার পর্যন্ত। রাস্তাটা তৈরি করিয়েছিলেন আমার বাবা। দু'দিকে আম আর কাঁঠাল গাছের সারি। মাঝে মাঝে লিচু আর পেয়ারা

গাছও আছে। গাছগুলোতে আজও ফল হয়। আগে এর চেয়ে অনেক বেশী হ'ত। যত্নের অভাবে এরা আজ আমার মতই বুড়ো হ'য়ে গেছে।

রাস্তাটাও নষ্ট হ'য়ে গেছে। লাল সুরকির চিহ্ন পর্যন্ত নেই। দু'দিকের ঘাস লম্বা হ'য়ে হ'য়ে নুয়ে পড়েছে রাস্তার ওপর। ঘাসের চেয়ে বেশী জন্মেছে আগাছা। ক্ষিধে পেলেও গরু পর্যন্ত এতে মুখ লাগায় না। খালের ওপারে লক্ষ্মণ গোয়ালার খাটাল। আমি একদিন গিয়েছিলাম লক্ষ্মণের কাছে। অনুরোধ করেছিলাম, দু'দশটা গরু আর মোষ এখানে এনে ছেড়ে দেবার জন্যে। লক্ষ্মণ আমার অনুরোধ রাখে নি। সে বলেছিল, "বাবু, এক-একটা গরুর দাম হাজার টাকা। এরা বনজঙ্গল চিবোয় না।" লক্ষ্মণ মিথ্যে বলে নি। ওর গরুগুলো যা পায় তা খায় না। কিন্তু পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় কি দেখেছিলাম ?

খালের পারে এসে মহীতোষ বলল, "গড়িয়ার পোলটা এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।"

বললাম, "আরও একটু নীচে নেমে এস।" আমার সঙ্গে সঙ্গে মহীতোষ নীচে নামল। গড়িয়া খালের পুরোটাই এখান থেকে দেখা যায়। মহীতোষের চোখে নীল চশমা লাগানো ছিল। চশমাটা সে খুলে নিয়ে বলতে লাগল, "এটা সত্যিই মরা খাল। মাঝে মাঝে অনেক জায়গায় এক ফোঁটাও জল নেই। দূর থেকে মনে হয়, দুটো অংশকে পৃথক করবার জন্য দাগ কাটা হয়েছে। হয়তো কোন এক সময়ে সত্যিই তাই ছিল। দুই জমিদারের দুই এলাকা। কিন্তু প্রথম যেদিন আমি সরকার-কুঠিতে প্রবেশ করি সেদিন আমার অন্য রকমের ধারণা হয়েছিল।"

"কি রকমের ?"

"হঠাৎ আমার মনে হয়েছিল যে, গড়িয়ার খালটা বুঝি দুটো সভ্যতার মাঝখানে একটা সীমারেখা।"

"তোমার ধারণা মিথ্যে নয় মহীতোষ। কলকাতার সভ্যতাকে বুক দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছিল গড়িয়ার খাল। এর বুকে অনেক জল ছিল। আজ দেখছ এখানে জলের কত অভাব। কিন্তু এর বুকের জল শুকোতে অনেক সময় লেগেছে। বিনাযুদ্ধে এ নত হয় নি। ভারতবর্ষের সভ্যতার মত খালটারও সারা বুকে রয়েছে সংগ্রামের দাগ। শেষ পর্যন্ত এ বোধ হয় মরবে না। তুমি কি বল মহীতোষ ?"

"এর বুকে কল বসানো দরকার। পুরনো মাটি ফেলে দিতে হবে। এর বুকের গর্ত গভীর না হ'লে জল সব শুকিয়ে যাবে।...ওই দেখুন, পোলের ওপর দিয়ে বাস যাচ্ছে। এটাই বোধ হয় আশী নম্বর বাস ?"

"তুমি তো এসপ্লানেড থেকে পাঁচ নম্বর ধরেছ ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আশী নম্বরটা কত দূর পর্যন্ত যায় ?"

"উত্তর ভাগ পর্যন্ত। একদিন চল, ওই অঞ্চলটা ঘুরে আসি।" এই ব'লে আমি ওপরে উঠে এলাম। খুব কড়া রোদ উঠেছে আজ।

সবচেয়ে বুড়ো আমগাছটার তলায় এসে বসলাম আমরা। এ শুধু বুড়ো নয়, বড়ও। মাটির তলা থেকে একটা শিকড় ওপর দিকে বেরিয়ে পড়েছে। বেশ মোটা শিকড়। শক্তও খুব। আমরা তুজনেই ব'সে পড়লাম শিকড়ের ওপর। মহীতোষ একটু ইতস্তত করছিল। জামাকাপড় ওর শুধু পরিচ্ছন্ন নয়, দামীও। তপার সঙ্গে ওর ভাব জমছে। তাই বোধ হয় মহীতোষ আজকাল দামী দামী জামাকাপড় প'রে গড়িয়ায় আসে। গড়িয়ার বাসে এত ভিড় যে মোটা ক'রে কলপ-দেওয়া কাপড়ের ইস্ত্রি পর্যন্ত নষ্ট হ'য়ে যায়।

মহীতোষ আমার পাশেই বসল। পকেট থেকে রুমালটা বার ক'রে শিকড়ের ওপর বিছিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম আমি, কিন্তু দিলাম না। হঠাৎ আমার মনে পড়ল, মহীতোষের কাপড়ে নস্যির দাগ লাগতে পারে। মহীতোষকে সুপুরুষই বলা যায়। বাঁ হাতের কব্জিতে সে ঘড়ি বেঁধেছে। ভেজিটেবল ঘি খেলে ওর কব্জির হাড় এত চওড়া

হ'ত না। মহীতোষ ঘড়িতে সময় দেখল। সময় আমি জানতে চাই নি, তবুও সে ঘোষণা করল, "প্রায় সাড়ে বারোটা।"

আমি জানি মহীতোষের ক্ষিধে পায় নি। সে সুতপার কাছে যেতে চাইছে। কিন্তু সুতপা কই? ওকে তো বলাও যায় না যে, ছোট সাহেবের সঙ্গে সুতপা বেড়াতে বেরিয়েছে। প্রসঙ্গটা চেপে যাওয়ার জন্যে আমি ওকে বললাম, "সরকার-কুঠির ইতিহাসটা তোমার শোনা উচিত।"

"বিয়াল্লিশের সেই ইতিহাস আমি কখনও ভুলব না।" বলল মহীতোষ।

"তুমি লালুর কথা ভাবছ?" আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম, "লালুর কথা মনে রেখে কি করবে?"

"একথা কেন বলছেন মেসোমশাই? লালুকে ভুলে যাওয়া পাপ। সে যে ভারত-ইতিহাসের এক স্মরণীয় অধ্যায়!"

"ভোট কুড়োবার আগে অনেকে এমন কথাই বলেন। কিন্তু এটা তো ভোটের সিজন নয়। মহীতোষ, জোড়া বলদের ভাষা দেয়ালের গায়ে লেখা রয়েছে আমি দেখতে পেয়েছি। কিন্তু···থাক। আজ আর রাজনীতির আলোচনা নিয়ে সময় নষ্ট করতে চাই নে। বিয়াল্লিশের পরে এখানে রাজনীতির নোংরা জল ঢুকতে পারে নি। খালটা তো শুকনোই। তবুও সরকার-কুঠির সারা দেয়ালে নতুন ইতিহাসের পলস্তারা আমি দেখলাম। সুতপা রায় এখানে এল। সে এল ইতিহাসের একটা আলগা মলাটের মত নয়। সে এল একটা নতুন অধ্যায়ের উত্তপ্ত সূচনার মত। এসে দখল করল দোতলার বড় ঘরখানা। তখন অবিশ্যি গড়িয়ার জঙ্গল অনেক সাফ হ'য়ে গেছে। তার পাঁচ বছর আগে আমার চাকরি গেল। লালুকে ধরিয়ে দিলে আজ আমি সরকারী পেনসন পেতাম পৌনে দুশ' টাকা।"

মহীতোষ জিজ্ঞাসা করল, "মিসেস রায় কি জানেন যে, আমি এসেছি?"

"বারোটার মধ্যে তুমি আসবে তা সে জানে। চল ওঠা যাক। সরকার-কুঠির আধুনিক ইতিহাসটা তোমায় অন্য একদিন শোনাব।"

"ভাল লাগছে শুনতে। আপনি বলুন—অন্তত যতক্ষণ না খাওয়ার জন্যে ডাক আসছে ততক্ষণ শুনি। মিসেস রায় এখানে কবে এলেন থাকতে? মাসীমার হোটেল বোধ হয় তখনও খোলা হয় নি?"

মহীতোষের মনস্তত্ত্ব বুঝতে আমার কষ্ট হ'ল না। সরকার-কুঠির প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি ওর আগ্রহ নেই। শুধু সুতপার কথাই সে শুনতে চায়। কিন্তু শুনেই বা মহীতোষের লাভ কি? সুতপা তো কুমারী নয়। ওর স্বামী আছেন। যতদূর জানি তিনি বেঁচেই আছেন। এইটুকুই শুধু আমরা জানি। তিনি কোথায় আছেন এবং কি কাজ করেন সে সম্বন্ধে সুতপা কিংবা আমরা সঠিক ক'রে কিছু বলতে পারব না। হয়তো তিনি আবার বিয়ে ক'রে কলকাতার কোন অঞ্চলে নতুন ঘরসংসার পেতেছেন। সুতপার স্বামীকে আমরা চিনি।

কিন্তু মহীতোষের তাঁকে চেনবার দরকার কি? সুতপা বিবাহিতা ব'লে মহীতোষ তাকে ভালবাসতে পারবে না কেন? প্রশ্নটা কঠিন, হয়তো জটিলও।

মহীতোষ একটু চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। এ চঞ্চলতা ওর সুতপার কাছে পৌঁছবার জন্যে। আমি বলতে লাগলাম, "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার বছরখানেক আগের কথা। চাকরি তো আমার বিয়াল্লিশ সনেই চ'লে গিয়েছিল। টাকা-পয়সার অভাব এত বেশী হ'য়ে পড়ল যে, তোমার মাসীমাব চোখেও তা ধরা পড়ল। গত কয়েকটা বছরের মধ্যে এক দিনের জন্যেও তাঁর চোখের জল আমি শুকোতে দেখি নি। চোখের চারদিকে লোনা জল জ'মে জ'মে চামড়ার ওপরে গজিয়ে উঠল বড় বড় ক্ষত। গাঁদাফুলের গাছ থেকে পাতা ছিঁড়ে নিয়ে এলাম। তারই রস দিয়ে ক্ষতের ওপরে প্রলেপ লাগিয়ে দিতাম আমিই। তাঁর দৃষ্টিশক্তি যে এরই মধ্যে অনেকটা ক'মে এসেছে তাও আমি বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু একদিন তাঁর

কথা শুনে সত্যিই আমি চমকে গেলাম! তিনি বললেন, 'প্রত্যেক দিন সন্ধেবেলা কোথায় যাও আমি জানি। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ভিক্ষে করতে বেরুচ্ছ, না? পৈতৃক বাড়িটা রেখে আর কি করবে, বেচে দাও। একদিন দেখবে নতুন পৃথিবীতে সংস্কারের কোন দাম থাকবে না। ভালমন্দ, সৎ-অসৎ কথাগুলোর মূল্য ব্যক্তিগত বিচারের ওপর নির্ভর করবে। এদের মূল্য শাশ্বত নয়।'

তাঁর সঙ্গে তর্ক করবার মত বুদ্ধি আমার ছিল না, আজও নেই। বুঝতে পারলাম, তিনি আমার শূন্য তহবিলের খবরটা জেনে ফেলেছেন। বাড়ীটা বেচে ফেলবার জন্যে দালালদের কাছে যাওয়া-আসা আরম্ভ করলাম। সেই সময় এই দিকটাতে জমি কিংবা বাড়ীর দাম তেমন বাড়ে নি। গড়িয়ার পোলের এ পাশে কেউ বড় একটা আসতেও চাইত না। ঘন জঙ্গলে সমাকীর্ণ ছিল আমাদের এই গোটা অঞ্চলটাই। পোলের ওপর থেকে সরকার-কুঠির ছাদটা পর্যন্ত দেখা যেত না। আজ তো তুমি এখান থেকে আশী নম্বর বাসটাও দেখতে পেলে মহীতোষ।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। প্রায় পনের মিনিট পর পর একটা ক'রে আশী নম্বর যাচ্ছে। সবসুদ্ধ চারখানা দেখলাম।"

"তুমি ঠিকই দেখেছ। তার মানে এক ঘণ্টার হিসেব দিলে। সুতপা একটু বাইরে গেছে। ও ফিরে না আসা পর্যন্ত কি তুমি অপেক্ষা করতে চাও না?"

"আজ তো রবিবার, তু'এক ঘণ্টা দেরি ক'রে খেলে আমার কিছু অসুবিধে হবে না।" বলল মহীতোষ। সুতপা যে বাড়ী নেই, সে খবরটা ওকে দিতেই হ'ল। আমি দেখলাম, মহীতোষ এবার সুস্থির হ'য়ে বসল। শুধু সুস্থির হ'য়ে বসল না, সে আমায় অনুরোধও করল, "পুরনো ইতিহাস শুনতে ভাল লাগছে। কিচ্ছুই বাদ দেবেন না, সবটুকুই বলুন।"

আমি পুনরায় বলতে লাগলাম, "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার

বোধ হয় এক বছর আগে বিকেলবেলার দিকে গড়িয়ার জঙ্গলে হঠাৎ একটা জীপগাড়ি ঢুকে পড়ল। গুলি-খাওয়া বুনো শুয়োরের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করতে করতে জীপগাড়িটা যেন আক্রমণকারীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে! জঙ্গলের নিরেট নিস্তব্ধতা ভেঙে চৌচির হ'য়ে গেল। আমি ওই বড় ফটকটার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ভাঙাচোরা কাঁচা রাস্তাটার ওপরেও লম্বা লম্বা বুনো ঘাসের কিছু অভাব ছিল না। গাড়িটা এগিয়ে আসতে লাগল এই দিকেই। বুনো ঘাসের বুক চিরে একটা সকরুণ আর্তনাদও বোধ হয় বেরিয়ে এল। আমি দেখলাম, ভাঙাচোরা রাস্তাটার ওপর দাগ পড়ল। গভীর দাগ। হ্যাঁ, তা প্রায় ছ'ইঞ্চি তো হবেই। জীপগাড়িটার বলিষ্ঠতা লক্ষ্য করবার মত। এর চাকার তলায় ছিল নতুন বিপ্লবের তেজোদ্দীপ্ত গর্জন। গর্জন না শুনলে সুতপা বোধ হয় সরকার-কুঠিতে আশ্রয় নিতে আসত না। আজ মনে হচ্ছে, সুতপা আসবে ব'লেই বুঝি সেদিন বায়না নিয়েও শেষ পর্যন্ত বাড়ীটা আমি বেচে ফেলতে পারি নি। একটু দাঁড়াও মহীতোষ, নস্যি নিয়ে নি। জানি বদ-অভ্যাস। কিন্তু মানুষের একটা অন্তত বদ-অভ্যাস থাকা উচিত। তুমি কি বল, মহীতোষ?"

বদ-অভ্যাস সম্বন্ধে মহীতোষ কোন মতামত দিল না। সে জিজ্ঞাসা করল, "জীপগাড়িতে কে ছিল?"

"একজন ইংরেজ। বোধ হয় বছর ত্রিশ বয়স হবে—ক্যাপটেন। সামরিক পোশাক তাঁর পরাই ছিল। হিন্দী ভাষা খুব ভাল ক'রেই শিখেছে। গড়িয়া পোলের পশ্চিম দিকে যে চওড়া পিচের রাস্তাটা দেখলে ওটা এঁকেবেঁকে চ'লে গিয়েছে রিজেণ্ট পার্ক হ'য়ে টালিগঞ্জে। গোটা রিজেণ্ট পার্কে তখন শুধু মিলিটারী ক্যাম্প ছিল। সাহেবটি সেখান থেকেই এসেছে। এসে বলল যে, সে এখানে থাকতে চায়। তোমার মাসীমা তো তাকে দেখেই ক্ষেপে উঠলেন। আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এই মুখপোড়া বাঁদরটা কি চায়?

ইতিমধ্যে সাহেবটিকে আমি ব'লেই দিয়েছিলাম যে, সরকার-কুঠি মেস কিংবা হোটেল নয়। আমার কথা শুনে ক্যাপটেন খুব নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়ল। তার হাবভাব থেকে মনে হ'ল, সে যেন অনেক দিন ধ'রে ঠিক এমন একটি জায়গাই খুঁজে বেড়াচ্ছিল। দু'দশ মিনিট ভেবে চিন্তে ক্যাপটেন বলল, অল্ রাইট, আমি তোমাদের পেইং গেস্ট হ'য়ে থাকব। মাসে কত ক'রে লাগবে? আড়াই শ'? অল্ রাইট, তিনশ' ক'রেই দেব। এই ব'লে সে পকেট থেকে টাকা বার করল। আগাম তিনশ' টাকাই সে দিতে চাইল। আমি বললাম যে, ওল্ড লেডীকে জিজ্ঞেস না ক'রে টাকা নেওয়া চলবে না। মহীতোষ, এর পর তোমার মাসীমার কথা শুনে আমি তো হতভম্ব হ'য়ে গেলাম। মনে হ'ল, দীর্ঘ ত্রিশ বছর এক সঙ্গে বসবাস করবার পরেও আমি আমার নিজের স্ত্রীকে চিনি না। তিনি হঠাৎ দেখি বেরিয়ে পড়লেন সাহেবটির সামনে। জিজ্ঞাসা করলেন, কেয়া মাংতা? ক্যাপটেনের মুখে হাসি! সাম্রাজ্যলিপ্সু ইংরেজের মুখে তো শুধু লোভের হাসিই থাকবার কথা —আমরা দেখলাম, লোভ তো দূরের কথা হাসির মধ্যে তার দেওয়ার আকাঙ্ক্ষাটাই সবচেয়ে প্রবল। তা ছাড়া হাসির মধ্যে এমন একটা সরলতা ফুটে উঠল যে, তোমার মাসীমা আমায় বললেন, এমন হাসি তো এদেশে কোন শিশুর মুখেও দেখা যায় না! যায় না তার কারণ, এখানে বোধ হয় প্রতিটি শিশু জন্মেই বুড়ো হ'য়ে পড়ে। মহীতোষ, কথাটার মধ্যে খানিকটা সত্য নিশ্চয়ই আছে। অন্তত সবটুকুই এর মিথ্যে নয়। ক্যাপটেনের সঙ্গে তোমার মাসীমার আলাপ জমতে পাঁচ মিনিটও লাগল না। দোতলা এবং একতলার ঘরগুলো তিনি ওকে দেখাতে লাগলেন। তোমার মাসীমার মন্তব্য আমি বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়েও শুনতে পাচ্ছিলাম। প্রত্যেকটা ঘরে ঢুকেই তিনি একই মন্তব্য প্রকাশ করছিলেন—এহি কামরাই সবসে আচ্ছা হায়। ক্যাপটেন কি ভাবছিল জানি না, আমি তো নিজের মনে হাসতে হাসতে খুন! শেষ পর্যন্ত দেখি, পেছন দিকের ঐ ভাঙাচোরা গোয়ালটাই পছন্দ

করল ক্যাপটেন। আমরা সত্যিই খুব অবাক হলাম। সাহেবটি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ারকি করছে? না, ঠাট্টা-ইয়ারকি নয়। জীপগাড়ি থেকে সে তার জিনিসপত্র নামিয়ে নিয়ে এল। বিছানা, বাক্স, ফোল্ডিং খাট এবং ছবি আঁকবার একটা মস্ত বড় ইজেল। বোধ হয়, আধ ঘণ্টার মধ্যে সে নিজের হাতে গোয়ালটা ঝেড়ে পুছে পরিষ্কার ক'রে ফেলল। সাজিয়ে ফেলল ঘর। তার পর সে জিজ্ঞাসা করল: আন্টি, আলোর কি বন্দোবস্ত হবে? সরকার-কুঠিতে তখনও ইলেকট্রিক লাইট আসে নি। তোমার মাসীমা ছুটে গিয়ে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন নিয়ে এলেন। এনে বললেন, কেরোসিন তেল যোগাড় ক'রে আন। কণ্ট্রোলের দোকানে তালা ঝুলছে, এক ফোঁটাও তেল নেই। ডবল দাম দিলে মারোয়াড়ী দোকানদার নিজেই বাড়ী এসে তেল পোঁছে দিয়ে যায়। ক্যাপটেন বলল: না আন্টি, ব্ল্যাক-মার্কেট থেকে তেল কেনবার দরকার নেই। তেল আমি ক্যাম্প থেকে নিয়ে আসছি। এই ব'লে ক্যাপটেন মুহূর্তের মধ্যে জীপগাড়িতে চেপে উধাও হ'য়ে গেল।

তিন শ' টাকা হাতের মুঠোয় নিয়ে তোমার মাসীমা যে কতক্ষণ পর্যন্ত নিঃশব্দে গোয়ালের মধ্যে ব'সে ছিলেন আজ আর তা মনে নেই। অন্তত আধ ঘণ্টা তো হবেই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি ভাবছ?

—ভাবছি, ইয়োরোপের লক্ষ লক্ষ তাজা তাজা ছেলেমেয়েগুলো যখন যুদ্ধের আগুনে পুড়ে মরছে, আমাদের সোনার চাঁদেরা তখন টাকা লুটছে চোরাবাজার থেকে! কাল রাত্রে স্বপ্নের মধ্যে লালুর সঙ্গে কথা হ'ল। সে বলল, 'মা, দেখছ তো লক্ষ লক্ষ লালু আজ পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে। ভারতবর্ষের লালুরা তো প্রায় হাজার বছর ধ'রে সুখশান্তিতে জীবন কাটাচ্ছে। থানেশ্বরের কলঙ্কের পর প্রায় সাড়ে সাত শ' বছর পর্যন্ত আমাদের কিছু করতে হয় নি। নিশ্চিন্ত মনে সময় কাটিয়েছি। রাজ্যশাসনের ঝামেলা বহন করেছে পাঠান

আর মোগলেরা। তার পর তৃতীয় পানিপথ যুদ্ধের কলঙ্ক আমাদের আরও পৌনে দু শ' বছর ঘুম পাড়িয়ে রাখল। দোষ আমাদের নয় মা। সবটুকু দোষই সেই দুটি লোকের যাঁদের দুষ্কৃতির জন্যে থানেশ্বর আর পানিপথে হাজার বছরের দাসত্ব পাকা হ'য়ে রইল। দেশের জন্যে সর্বস্ব পণ করার শিক্ষা আমাদের নেই। রক্তপাতের মধ্য দিয়েই তো মা তেমন শিক্ষা আমাদের পেতে হবে। নইলে স্বাধীনতা পেলেও আমরা তা ধ'রে রাখতে পারব না। মা, শুধু ইংরেজদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। তপা যে তিলে তিলে পুড়ে মরছে তার জন্যে দায়ী তোমাদের দেশ, তোমাদের সমাজ।' লালুর কথা শোনবার পর থেকে আমার দৃষ্টির অস্পষ্টতা যেন অনেকটা ক'মে গেছে। স্বাধীনতা কথাটার একটা নতুন ব্যাখ্যাও যেন আমার কাছে ক্রমশই স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। সে ব্যাখ্যার পটভূমি জুড়ে রয়েছে সারা পৃথিবী। ভারতবর্ষের সীমায়িত সাম্রাজ্য তার একটা অংশ ছাড়া আর কিছু নয়। সত্যিই লালুর ছেলেমানুষি আরি বোধ হয় আমায় ব্যথা দিতে পারবে না।··মহীতোষ, ক'টা বাজল ?"

চমকে উঠে মহীতোষ তার হাতঘড়িতে সময় দেখল। দেখে বলল, "আড়াইটা।"

"তা হ'লে তপার জন্যে আর অপেক্ষা করা চলে না। চল আমরা খেয়ে নিই গে।"

"কিন্তু···কিন্তু মিসেস রায় কি এবেলা আর ফিরবেন না ? তা ছাড়া আপনার গল্পটাও তো শেষ হয় নি। ক্যাপটেন যে কেরোসিন তেল আনতে ক্যাম্পে গেলেন সেখান থেকে তিনি ফিরলেন কখন ?"

"খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে ক্যাপটেনকে নিয়ে আলোচনা করা যাবে। আমরা না খেলে তোমার মাসীমারও খাওয়া হবে না।"

মহীতোষকে নিয়ে খাওয়ার ঘরে প্রবেশ করলাম আমি। তপার ব্যবহারে আমরা সবাই আজ শুধু বিরক্ত বোধ করলাম না, ক্ষুণ্নও হলাম।

॥ দুই ॥

মহীতোষের খাওয়ার ধরন দেখে লালুর মা দেখলাম একটু চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন। ভাল ক'রে খাচ্ছে না সে। কি খাচ্ছে সে, তাও মহীতোষ যেন জানতে চায় না। লালুর মা জিজ্ঞাসা করল, "কি বাবা, ভাল ক'রে খাচ্ছ না তো? মাসীমার হোটেলের রান্না কি হ্যারিসন রোডের হোটেলের চেয়ে খারাপ হয়েছে?"

"কি যে বলেন!" মহীতোষ যেন ঘুম থেকে উঠল, "কি যে বলেন মাসীমা! চমৎকার রান্না হয়েছে। মনে হচ্ছে, বহু কাল পরে আমি খেতে বসলাম। আমাদের হোটেলে আমি তো ঠিক খাই না, নিয়মরক্ষা করি। থালায় ক'রে যা এনে হাজির করে তাই খেয়ে নিই। শুধু মাছি কিংবা পোকামাকড় দেখলে ফেলে দিই।"

লালুর মা বলল, "তা হ'লে ছানার ডালনাটা আর একটু খাও বাবা। পোনামাছটা নিজে রাঁধবে ব'লে তপা সেই ভোরবেলাতেই হেঁসেলে এসে ঢুকেছিল···কিন্তু কোথা থেকে কি একটা খবর এসে পৌঁছল, অমনি হুট ক'রে মেয়েটা ছুটল···যাওয়ার সময় অবশ্যি সে বার বার ক'রে ব'লে গেছে, মহীতোষবাবুর যেন কোন রকম অসুবিধে না হয়। হ্যাঁ বাবা, তোমাব কি কোন অসুবিধে হচ্ছে?"

"অসুবিধে?" আলুবখরার চাটনী চাটতে চাটতে মহীতোষই বলল, "মাসীমার হোটেলে কোনদিনই কারও অসুবিধে হবে না।··· মিসেস রায় বুঝি আজ বাইরেই খাবেন?"

"এত বেলা পর্যন্ত যখন ফিরল না তখন—তপার কথা কিছু বলা যায় না বাবা। হয়তো সমস্ত দিন উপোস ক'রে থাকবে।"

"উপোস ক'রে কোথায় থাকবেন তিনি?"

হাসতে হাসতে লালুর মা বলল, "কিচ্ছু বলা যায় না। হয়তো দুপুরের শো-তে সিনেমা দেখতে বসেছে। সন্ধের শো-তেও আবার সেই সিনেমাটাই দেখবে। পাগলী! বলে, মাসীমা, হাউসের মধ্যে

ঠাণ্ডা, সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা গায়ে গরম হাওয়া লাগে নি। এই সন্দেশটা আবার ফেলে রাখলে কেন মহীতোষ?"

"গলায় আটকে যাচ্ছে। বড্ড বেশী খেয়ে ফেললাম।"

"এক ঢোক জল খেয়ে গলাটা পরিষ্কার ক'রে নাও। খাবার জিনিস নষ্ট করতে নেই বাবা। মহীতোষ, সংসারে তোমার আর কে কে আছেন?"

"মা। তিনি বড়দার কাছেই থাকেন, ঢাকায়।"

"ঢাকায়? সে তো বাবা পাকিস্থান? সেখানে ওঁরা থাকেন কি ক'রে? রিফিউজী ক্যাম্পে বুঝি?"

"এদেশের খবরের কাগজগুলোতে সেই রকমই খবর বেরোয়। বড়দা ব্যাঙ্কে চাকরি করেন। বাবা একটা দোতলা বাড়ী তৈরি ক'রে রেখে গিয়েছিলেন। বড়দারা দোতলায় থাকেন। একতলায় ভাড়াটে।"

খাওয়া শেষ হ'তে সাড়ে তিনটেই বাজল। বাইরে আবার আমরা বেরিয়ে এলাম। মহীতোষ দেখলাম একটু অস্বস্তি বোধ করছে।

আমি বললাম, "সিগারেট খাওয়ার অভ্যেস আছে নিশ্চয়ই। হয়তো আমার সামনে খেতে তোমার লজ্জা করছে। আমি নিজেই অনুমতি দিচ্ছি তুমি খাও। আমিও একটু নস্যি নিয়ে নিই।"

মহীতোষ সিগারেট ধরাল। আমি তাতে খুশীই হলাম। ভেবেছিলাম, ওর বোধ হয় কোন বদ অভ্যাসই নেই। সিগারেটে বার দুই টান দিয়ে মহীতোষ জিজ্ঞাসা করল, "দোতলার একটা আলাদা ঘর নিয়ে থাকলে মাসিক কত টাকা খরচ পড়ে?"

"আমি ঠিক খবর রাখি নে। তোমার মাসীমাই বলতে পারবেন। কেন, তুমি এখানে উঠে আসতে চাও নাকি?"

"প্রত্যেক দিনই একটু একটু ক'রে লোভ বাড়ছে আমার।"

"আজ তোমার মাসীমার হোটেলে যা খেলে তার সবই সুতপার টাকায় রান্না হয়েছে। প্রত্যেক দিনকার রান্নায় কিন্তু এত স্বাদ থাকে না। আইটেমের সংখ্যা থাকে এর সিকি ভাগ।"

"তবুও মনে হয়, প্রতিদিনকার সাধারণ স্বাদেও আকর্ষণ থাকবে অনেক বেশী।"

"হয়তো তোমার কথাই ঠিক। স্বাদ নির্ভর করে যার যার ব্যক্তি-গত রুচির ওপর। তোমরা একটু বেশী ঝাল খাও, না মহীতোষ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"সুতপা তোমার খবর রাখে।"

মহীতোষের সিগারেট খাওয়া শেষ হ'ল। আর বোধ হয় ওকে ধ'রে রাখা ঠিক হবে না। এখান থেকে সরকার-কুঠির বড় ফটকটা দেখা যায়। সুতপা কি গাড়ি চেপেই ফিরবে, না পাঁচ নম্বর ধরবে? বাসে চেপে আসাই ওর উচিত। সকালবেলা ছোটসাহেবের মাস্টার বিয়ুইক ফটকের গায়ে ধাক্কা খেয়েছে। ফটকের পলস্তারা খানিকটা খ'সে পড়েছিল। আমার বাবা যখন ফটকটা তৈরি করেন, তখন তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি যে, এক শতাব্দী পরে এখানে এত বড় একটা গাড়ি ঢুকে পড়বে। শতাব্দীর ব্যবধান বড় কম সময় নয়। কল্পনায় অনেক কিছু দেখতে পাওয়া যায় স্বীকার করি, হয়তো আমাদের পূর্বপুরুষেরা খানিকটা দেখতেও পেয়েছিলেন, কিন্তু আমার বাবা এই বিয়ুইক গাড়িটা দেখতে পান নি। সামাজিক নিয়ম সম্বন্ধে কি এই কথাটা খাটে না? আমি এই মুহূর্তে সুতপার কথাই ভাবছি। বহু পুরাতন সামাজিক বিধিনিষেধগুলো তপা যদি না-ই মানে? আমি তো দেখতে পাচ্ছি, ওর মনের ফটকটা এত চওড়া যে, ওর আধুনিকতম অসামাজিক আচরণের মাস্টার বিয়ুইকটাও অতি অনায়াসে সেখান দিয়ে যাওয়া-আসা করছে। মহীতোষকে নেমন্তন্ন ক'রে সে হয়তো খেতে বসেছে ছোটসাহেবের সঙ্গে। কিছুদিন আগে মহীতোষের কোল চেপে গড়ের মাঠটা পার হ'ল সুতপা, আর আজকেই সে কলকাতার একাধিক রাস্তা পার হচ্ছে তপন লাহিড়ীর মোটরগাড়ি চেপে। বুড়োমানুষের চোখ দিয়ে ওর সবটুকু আমি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছি না। তা ছাড়া তপা যুবতী, ওর মন

এবং দেহের রহস্য আমাদের মত বুড়ো লোকের পক্ষে দেখা সম্ভবও নয়। আর দেখলেই বা কি, যার অনুভবশক্তি লোপ পেয়েছে তার এসব ব্যাপারে ফতোয়া দেওয়া অমার্জনীয় অপরাধ। আঙুর ফল-গুলোর নাগাল পেলাম না ব'লে তাদের টক ঘোষণা করবার চেয়েও বড় অপরাধ এটা।

মহীতোষ এবার জিজ্ঞাসা করল, "কেরোসিন তেল নিয়ে সাহেবটির বুঝি সেদিন ফিরে আসতে খুবই দেরি হয়েছিল, না মেসোমশাই ?"

আমার অন্যমনস্কতা ধ'রে ফেলেছে মহীতোষ। বললাম, "না, তেমন খুব বেশী দেরি হয় নি, সন্ধের মধ্যেই সে ফিরে এল। এক টিন তেল পেয়ে তোমার মাসীমা তো আনন্দে আত্মহারা! অনেক দিন হ'ল তিনি সরকার-কুঠির একতলায় দোতলায় একই সঙ্গে আলো জ্বালাতে পারেন নি। আজ যেন তিনি সুদে-আসলে সব উশুল করবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন। সাহেবটি তো তাঁর পেছনে 'আন্টি, আন্টি' ক'রে আঠার মত লেপটে রইল। তাঁর হ'য়ে সে-ই আলো জ্বালিয়ে দিচ্ছে। চৌকির তলা থেকে ভাঙা লণ্ঠন টেনে বার করল ক্যাপটেনই। আমি তো অবাক হ'য়ে কাণ্ড দেখছি দু'জনের। তোমার মাসীমা ক্রমাগত তার ওপর আদেশ দিয়ে যাচ্ছেন, আর সে প্রত্যেক-বারই বলছে 'অল্‌রাইট'।

'রাত্তিরে কি খাবে সাহেব ? কড়াইয়ে শুধু একটু দুধ আছে।'

'অল্‌রাইট, শুধু দুধ খেয়েই থাকব।' জবাব দেয় ক্যাপটেন।

'তা কি ক'রে হবে, বাছা ? টাকা দিলে তিনশ', শুধু একটু দুধ খাইয়ে রাখি কি ক'রে ? যাও না, বাজার থেকে ক'টা আণ্ডা আর পাঁউরুটি কিনে নিয়ে এস।' সাহেব অমনই ব'লে বসল, 'অল্‌রাইট—আঙ্কেল্‌কে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।'

মহীতোষ, সত্যি সত্যি আমাকে সে টেনে টুনে ঠেলাঠেলি ক'রে জীপগাড়িতে তুলল। গড়িয়ার নির্জনতায় প্রচণ্ড কোলাহল তুলল সামরিক কর্মচারীটি। পরের দিন সকালেই খালের ওপারের খাটাল

থেকে লক্ষ্মণ গয়লা এসে হাজির। সে সাতশ' গরু আর তিনশ'টি মোষের মালিক। কোনদিনও সে আমাদের সরকার-কুঠিতে পায়ের ধুলো দিত না। কখনও-সখনও ডেকে পাঠালে সে নিজে আসত না, ত্ব' তিনটে চাকর পাঠিয়ে দিত। তাদের বলত, 'দেখে আয়, বুড়ো-বাবু কি চায়। টাকা ধার চাইলে বলিস, আজকাল ত্বধের কারবারে এক পয়সাও নাফা হয় না।' দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তৃতীয় বৎসরেই লক্ষ্মণ গোয়ালা লক্ষপতি হয়েছিল। হাসপাতাল আর মিলিটারী ক্যাম্পে ত্বধ সাপ্লাই দিয়ে কলকাতায় সে বাড়ী কিনল ত্বটো। যাই হোক, পরের দিন সকালবেলা সে এসে দাঁড়াল আমার সামনে। হাত তুলে মস্তবড় একটা সেলামও করল লক্ষ্মণ। জিজ্ঞাসা করলাম, 'হঠাৎ কি মনে ক'রে ?'

'হুজুরকে দেখতে এলাম। মাঈজীর তবিয়ৎ ভাল আছে তো ?'

'হ্যাঁ। তোমার কারবার কেমন চলছে ?'

'বড় খারাপ হুজুর। শুনছি লড়াই নাকি থেমে যাবে। মিলিটারী সাহেব আপনাব কোঠিতে কেন আসল হুজুর ? কোথা থেকে আসল ?'

'রিজেণ্ট পার্কেব ক্যাম্প থেকে। এখানে মাস ত্বই থাকবে। সাহেব এখানে ব'সে ছবি আকবে।'

'সে তো আচ্ছা বাত। মগর সাহেবকে বোলুন না, রিজেণ্ট পার্ক ক্যাম্পে ত্বধ সাপ্লাই কো লিয়ে। ওখানে সাপ্লাই দিচ্ছেন একজন বাঙালীবাবু। আরে রাম কহো, ও কি ত্বধ দিচ্ছে ? সোব পানি। বাঙালীবাবু গোরু কোথা পাবে ? বুঢ়াবাবু, আপকো ভি থোরা কুছ মুনাফা মিল জায়েগা। সোব লিখাপড়ি কোরে লিন।'

'লিখাপড়ি'র দরকার হ'ল না। ব্যর্থমনোরথ হ'য়ে লক্ষ্মণকে তখনি ফিরে যেত হ'ল। ওকে বুঝিয়ে দিলাম যে, আমার এই বুড়ো বয়সে মুনাফার আর দরকার হবে না।

ক্রমে ক্রমে সাহেবটিকে চিনতে পারলাম আমরা। ধনী লোকের

ছেলে। লেখাপড়া করেছে প্রচুর। যুদ্ধের সময় সৈন্যদলে ভর্তি হ'তে হয়েছে। ছেলেবেলা থেকেই ছবি আঁকার প্রতি ঝোঁক ছিল খুব, আঁকতেও পারে ভাল। পৃথিবীর বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে এই ক'বছর ঘুরে বেড়িয়েছে। বহুবার মরতে মরতে বেঁচে গেছে। তোমার মাসীমার কাছে গল্প করছিল একদিন, 'আন্টি, তুমি বিশ্বাস কর, মৃত্যু যখন সামনে এসে দাঁড়ায় তখন প্রত্যেকটি মানুষই মরতে ভয় পায়। দেশের জন্যেই হোক, আর প্রেমের জন্যেই হোক সুস্থ মানুষ সহজে জীবন দিতে চায় না। জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে একটা সুতোর মাত্র ব্যবধান, কিন্তু মানুষের কাছে সেই সুতোটারই দাম সবচেয়ে বেশী। কি ভীষণ অভিজ্ঞতা! দু'শ' গজ তফাৎ থেকে শত্রুপক্ষের সঙ্গে গুলি-ছোঁড়াছুঁড়ি হচ্ছে, কানের কোণ ঘেঁষে গুলি বেরিয়ে যাচ্ছে প্রতি সেকেণ্ডে, আমি তখন কি ভাবছি জান? মা, বউ, শিল্প এবং দেশের কথা সব মন থেকে মুছে গেছে। শুধু ভাবছি, হায় ভগবান জীবনটা যেন বাঁচে! আন্টি, এমন অভিজ্ঞতা যাদের জীবনে বহুবার ঘটেছে, তাদের মধ্যে অনেকেই আজ বেঁচে থেকেও মৃত।' ইজেলের দিকে আঙুল তুলে সাহেবটিই আবার বলল, 'এই শিল্পই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, নইলে আজ আমি পুরোপুরি জন্তু ব'নে যেতাম। আন্টি, ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, পৃথিবী থেকে যুদ্ধ যেন চিরদিনের জন্যে লোপ পেয়ে যায়।'

মহীতোষ, তোমার মাসীমার মনের অবস্থা বুঝতে আমার বাকি রইল না। এই তো সেদিন লালুই নাকি স্বপ্নে তাঁকে বলেছে যে, দেশের জন্যে ভারতবর্ষ আজও জীবন দিতে শেখে নি। লালু যুদ্ধ চায়, রক্তপাত চায়, আর ইংরেজটি প্রার্থনা করে যে, যুদ্ধ যেন চিরদিনের জন্যে বন্ধ হ'য়ে যায়।

লালুর মায়ের মনে ক্রমেই পরিবর্তন আসতে লাগল। তিনি যে খুব বুদ্ধিমতী তা বোধ হয় তুমি বুঝতে পারছ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রতি তাঁর যেন তেমন-আর আগ্রহ নেই। সামাজিক

মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি ঝোঁক বাড়ল তাঁর। তিনি আমায় একদিন বললেন, 'পৌনে দু'শ বছরে ইংরেজরা আমাদের যত না ক্ষতি করতে পেরেছে তার চেয়ে বেশী ক্ষতি করেছে লক্ষ্মণ গয়লারা। ইংলিশ চ্যানেল আর গড়িয়া খালের পার্থক্য আমি বুঝতে পারছি।'

বুঝলাম, স্বাধীনতা কথাটার নতুন ব্যাখ্যা নিয়ে লালুর মা মত্ত হ'য়ে উঠেছেন। বোধ হয় বিশেষ কোন দেশের ভৌগোলিক স্বাধীনতার চেয়ে তিনি ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে বেশী কাম্য ব'লে মনে করেন। স্বদেশপ্রেমের ধোঁয়াটে অংশটা চোখে পড়ল তাঁর। এমনকি তিনি যেন বিপিন চাটুজ্জেকেও ক্ষমা করবার জন্যে পুরনো মনটার সংস্কার সাধন করতে লাগলেন। হয়তো করলেনও। কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁর লুকনো সত্তা প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। গোটা মানবসমাজটার মা হ'তে গিয়ে হঠাৎ তাঁর মনে প'ড়ে যায় যে, তিনি শুধু লালুরই মা। হয়তো এ দ্বন্দ্ব তাঁর আজও মেটে নি। কোনদিনও মিটবে ব'লে কি তোমার মনে হয়, মহীতোষ?"

জবাবটা এড়িয়ে গিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, "সাহেবটি কি ঐ গোয়ালটার মধ্যে দু'মাসই রইল?"

"দু'মাসের বেশীই রইল। ছবি সে ভাল আঁকত সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। মস্তবড় একটা ক্যানভাসের ওপর একদিন দেখি গড়িয়া খালটা ফুটে বেরিয়েছে। দু'দিকে জংলী ঘাসের সবুজ শীর্ষ—মাঝ-খানটায় লাল রঙের ঢেউ। গড়িয়া খালে এত রক্ত কোথা থেকে এল? সাহেবের পাশে ব'সে তোমার মাসীমা তার ছবি আঁকা দেখতেন। রান্নাবান্না আর তাঁকে করতে হয় না। সাহেবের পরামর্শে তিনি শম্ভুঠাকুরকে তখন কাজে নিয়োগ ক'রে ফেলেছেন। তোমার মাসীমা শুনি সাহেবকে প্রশ্ন করছেন, 'খালে তো জল নেই, এত রক্ত কোথা থেকে যোগাড় করলে?'

'ইতিহাস থেকে, আন্টি।'

'কাদের ইতিহাস ?'

'মানবজাতির।'

'মানবজাতির রক্ত এখানে আসবে কেন রে মুখপোড়া, সে তো যাবে তোদের ঐ ইংলিশ চ্যানেলে ?'

তোমার মাসীমার গালে চুমু খেল ক্যাপটেন। খেয়ে বলল, 'রাগ ক'রো না, আণ্টি। তোমার ছেলে কি ইংলিশ চ্যানেলে গিয়েছিল মরতে ?'

'আমার ছেলের খবর তুমি জানলে কি ক'রে ?'

'বা রে! তোমার বুকে সেদিন কান পেতে কি শুনলাম ?'

মহীতোষ, একদিন দুপুরবেলা সাহেবকে তার স্টুডিয়োতে দেখতে পেলাম না। আমি দোতলায় গিয়ে উঠলাম। দেখি, তোমার মাসীমার ঘরের একটা দরজা রয়েছে খোলা, অন্যটা ভেজানো। ঘরের ভেতরের দৃশ্য দেখে আমি অবাক হ'য়ে গেলাম! সত্যি সত্যি সাহেবটি তোমার মাসীমার বুকের ওপর মাথা রেখে শুয়ে শুয়ে বিলেতের গল্প বলছে। সংসারে তার বাবা আছেন, মা নেই। আপন ভাইবোন কেউ নেই। বাবা দ্বিতীয় বার বিয়ে করেছেন। অনেক টাকা তাঁর। নানা রকমের ব্যবসা আছে। ভারতবর্ষের বহু কারবারেও তাঁর টাকা খাটছে প্রচুর। যুদ্ধের সুরুতে ক্যাপটেন বিয়ে করেছিল। প্রেমের বিয়ে নয়, সামাজিক বিয়ে। তিন মাসের বেশী একসঙ্গে থাকতে পারে নি। তাকে চ'লে আসতে হয় যুদ্ধক্ষেত্রে। ইটালী দেশ দখলের সময় সে খবর পেল যে, নাৎসী বৈমানিকদের বোমা খেয়ে স্ত্রী তাঁর মারা গেছেন। স্ত্রীও তার নারীসৈনিক দলে ভর্তি হয়েছিলেন।

লালুর মা বোধ হয় মনে মনে সাহেবটির মা হওয়ার চেষ্টা করছিলেন। সন্ধের সময় জীপগাড়িতে ক'রে তাঁকে সে নিয়ে যায় লেকের দিকে বেড়াতে। কোন কোন দিন গঙ্গার ধারেও যায়। সময়টা তাঁর ভালই কাটছিল। সংসারের অভাব অনটনও কমল।

তিনশ' টাকায় শুধু সাহেবের নয়, আমাদের খরচও সব মোটামুটি কুলিয়ে যাচ্ছিল। সাহেব একদিন তোমার মাসীমাকে বলল, 'আণ্টি, তোমার বাড়ীটার মধ্যে অনেক জায়গা প'ড়ে রয়েছে। রাঁধবার জন্যে একজন 'কুক'ও রাখা হ'ল। আরও ক'জন পেইং-গেস্ট রাখলে কেমন হয়? না, না, মিলিটারী লোকদের কথা আমি বলছি না। ইণ্ডিয়ান পেইং-গেস্টই তুমি রাখ।'

তোমার মাসীমা তাতে আপত্তি করলেন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি ক্যাপটেনের সব কথাতেই সায় দিতে লাগলেন। তখনি অবশ্যি আমরা পেইং-গেস্ট রাখি নি। রাখতে যখন আরম্ভ করলাম, তখন সাহেবটি ভারতবর্ষ ত্যাগ ক'রে বিলেতে চ'লে গিয়েছে। চ'লে যাওয়ার দিনটির কথা মনে পড়লে আমার বুড়ো বয়সেও চোখের পাতা ভিজে আসে, মহীতোষ।

তারই জন্যে শেষ পর্যন্ত সরকার-কুঠি রক্ষা পেল। শুধু তাই নয়, যাওয়ার সময় সে ব'লে গিয়েছিল যে, সুতপাকেও যেন আমরা বক্ষিতের মোড় থেকে তুলে নিয়ে এসে সরকার-কুঠিতে জায়গা দিই। সুতপাকে চিনিয়েছিলেন তোমার মাসীমাই। জীপগাড়িতে চেপে তিনি মাঝে মাঝে যেতেন রক্ষিতের মোড়ে, তপাদের বাড়ী। সেই-খানেই তপার সঙ্গে আলাপ হয় ক্যাপটেনের।

তপাকে আমরা নিয়ে এসেছিলাম সত্যি, কিন্তু এসেছিলাম অনেকদিন পরে। সে কাহিনী আজ নয়, অন্য একদিন বলব। সন্ধে হ'য়ে এল। সমস্তটা দিন তোমার বোধ হয় নষ্টই হ'ল। কানের কাছে বুড়ো লোকটা সারা দিন বকবক করল। তপার ব্যবহারে সত্যিই আমি আজ ব্যথা পেয়েছি, মহীতোষ। তোমায় নেমন্তন্ন ক'রে ডেকে এনে সে সারাদিনের জন্যে বাইরে বেরিয়ে গেল। আমি লজ্জিত।"

"না, না—জীবনে বোধ হয় এই প্রথম আমার একটা দিন এত ভাল কাটল। মেসোমশাই, আমি ভাবছি, মিসেস রায়ের কোন বিপদ ঘটে নি তো?"

"কলকাতা শহরে সবকিছুই ঘটতে পারে। কিন্তু খবর না পেলে এত বড় জায়গায় কি ক'রেই বা খোঁজ করব ওর? জান মহীতোষ, ওই মেয়েটার জন্মেই শেষ পর্যন্ত আমার সরকার-কুঠি বাঁধা দিতে হয়েছে?"

"কেন?" মহীতোষের স্বরে উৎকণ্ঠা।

"চিকিৎসার জন্মে অনেক টাকা খরচ করতে হ'ল।"

"মিসেস রায়ের অসুখ হয়েছিল বুঝি? কি অসুখ? মানে, নিশ্চয়ই সাংঘাতিক রকমের ব্যাধি। অসুখটা কি মেসোমশাই?"

"ঠাণ্ডা—মানে, তপার প্রকৃতি একেবারে ঠাণ্ডা! গরম সহ্য করতে পারে না। মহীতোষ, সে তু'বার পর পর একই বই দেখে। সিনেমা হাউসের ঠাণ্ডা ও গায়ে লাগায়।"

"কিন্তু ব্যারামটা কি?"

"ওই যে বললাম ঠাণ্ডা—ঠাণ্ডা ব্যাধি—ওই যে তপা আসছে। চল, ওঠা যাক।"

মহীতোষকে নিয়ে আমি এগিয়ে গেলাম ফটকের দিকে। বকতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ওর মুখের দিকে চেয়ে ওকে আর বকতে পারলাম না। শুধু মুখে নয়, সুতপার সারা দেহে যেন উষ্ণতার একটা মোলায়েম প্রলেপ পড়েছে আজ। জমাটবাঁধা বরফের ওপরে এই বুঝি প্রথম, সত্যিই প্রথম এই সূর্যের তাপ পড়ল! তপন লাহিড়ীই কি তপার জীবনে প্রথম সূর্য?

আমাদের দেখতে পেয়ে সুতপা বলল, "ক্ষমা চেয়ে সময় নষ্ট করতে চাই নে। কাল আপিসে দেখা হবে, মহীতোষবাবু।" এই ব'লে আমাদের সামনে দিয়েই সে চ'লে গেল।

সুতপা ঘর্মাক্ত। সদ্যস্নাতার দেহলাবণ্য সুতপার দেহেও দেখতে পেলাম আজ। মহীতোষ কি দেখল জানি না। সে শুধু হাত তুলে সুতপা রায়কে নমস্কার জানাল।

লেখকের বিবৃতি

॥ এক ॥

মহীতোষ চ'লে গেল। সারাটা দিন গল্প শুনেছে। শুনেছে তা ঠিক, কিন্তু সরকার-কুঠির বড় ফটকটার দিকে সে দৃষ্টি রেখেছিল সর্বক্ষণ। ঐ পথ ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন পথ ছিল না মাসীমার হোটেলে প্রবেশ করবার। মহীতোষের ধারণা মিথ্যে হয় নি। সুতপার সঙ্গে ওর ঐ প্রবেশপথের সামনেই দেখা হয়েছিল। মাত্র এক মিনিটের জন্যে। আগামীকল্য আপিসে দেখা হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দোতলার ঘর পর্যন্ত পৌঁছতে সুতপার দু'মিনিটের বেশী সময় লাগে নি।

সময়ের হিসেবটা বসন্ত সরকারের। তিনি লক্ষ্য করেছেন, সুতপার পদক্ষেপে অশোভন তাড়া রয়েছে। কি যেন সে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছে আজ। সুতপার দেহের ভূমিতে নতুন আবেগের অঙ্কুর! বসন্ত সরকারের বুড়ো চোখে অন্বেষণের আগ্রহ ছিল প্রচুর—কিন্তু সুতপা অপেক্ষা করল কই? দু'মিনিটের মধ্যেই সে দুমদাম ক'রে উঠে গেল দোতলায়। সরকার-কুঠির পুরনো কাঠের সিঁড়িতে এমন আওয়াজ বড় শোনা যায় না। বসন্ত সরকার একতলার বারান্দায় উঠে এলেন।

সন্ধ্যে পার হ'য়ে গেছে। একটু আগেই পার হ'ল। কিন্তু সরকার-কুঠির চারদিকে যেন মধ্যরাত্রির পরিবেশ! হোটেলের বাসিন্দারা কেউ এখনও ফিরে আসে নি। বোধ হয় আসে নি! বিজয় মাস্টার এখন রক্ষিতের মোড়ে ছাত্র পড়াচ্ছে। চণ্ডী ভটচাজ ফেরে সবার আগে। আকাশে তারা ওঠবার পরে সে হোটেলে ব'সে মক্কেলদের গ্রহ-নক্ষত্র খোঁজে। বিচার ক'রে পরের দিন তাকে পৌঁছে দিতে হয় শুভফলের সংবাদ। পয়সা খরচ ক'রে কেউ অশুভ সংবাদ শুনতে চায় না। বসন্ত সরকার হাঁটতে লাগলেন দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির দিকে।

থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি। একতলার স্নানঘরটার বাঁ পাশ দিয়ে একটা আলোর রেখা ভেসে উঠেছে। এ আলো কোত্থেকে আসছে? স্নানঘরটার ঠিক পাশেই তো ষষ্ঠীর ঘর। সিঁড়ির তলায় দাঁড়িয়ে বসন্ত সরকার উঁকি দিয়ে দেখলেন, ষষ্ঠী আজ ঘরেই আছে। মেঝের ওপর মাদুর পেতেছে সে। বুকের তলায় বালিশ দিয়ে ষষ্ঠী দত্ত কি যেন লিখে যাচ্ছে—ওর তন্ময়তা লক্ষ্য করলেন বসন্ত সরকার। তিনি আরও লক্ষ্য করলেন, ওর তক্তপোশের ওপর বলরাম আজ প্রমোশন পেয়েছে। সেও বুকের তলায় বালিশ দিয়ে উপুড় হ'য়ে শুয়েছে। সামনে ওর স্লেট। দিশী স্লেটের বুকটা বড্ড বেশী এবড়ো-খেবড়ো। বলরাম তারই ওপর অ, আ, ক, খ লেখবার চেষ্টা করছে। বোধ হয় আজকেই ওর হাতেখড়ি হ'ল।

তিনি আর সেখানে অপেক্ষা করলেন না। চণ্ডী ভট্চাজের ঘরেও আলো দেখতে পেলেন তিনি। সেই দিকেই হাঁটতে লাগলেন বসন্তবাবু। সুতপার সঙ্গে কথা বলতে হ'লে আরও একটু অপেক্ষা করতে হবে তাঁকে। সুতপা কি একবার নিচে নামবে না আজ?

বলরাম এবার ষষ্ঠী দত্তের চৌকির ওপর সোজা হ'য়ে উঠে বসল। হাতের পেন্সিলটা কানের পাশে গুঁজে সে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা ষষ্ঠীদা, অ, আ, ক, খ যে শিখতেই হবে তেমন কথা কোন্ শাস্তরে লেখা আছে?"

"মেলাই বকছিস বলরাম—শাস্তরে লেখা না থাকলে কি নাম সই করতে শিখবি নে? ভাত খাওয়ার কথা তো শাস্তরে লেখা নেই, তবে খাস কেন?"

বলরাম চৌকির কিনারায় পা ঝুলিয়ে বসল। তারপর সে বলল, "খিদে লাগে ব'লেই তো ভাত খাই।" পেটের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে বলরামই বলতে লাগল, "তুমি যাই বল ষষ্ঠীদা, তুনিয়ার স-ব শাস্তরের চেয়ে এই জায়গাটুকু অনেক বড়।" একটা বেশ বড় রকমের ঢেঁকুর তুলল বলরাম। তাড়াতাড়ি মুখের কাছে হাতটা তুলে

এনে ঢেঁকুরের হাওয়া হাতে লাগিয়ে সে আবার বলল, "পোনামাছের ল্যাজাটা এখনও পেটের মধ্যে তাজা রয়েছে ষষ্ঠীদা। হাতের চেটোতে ঢেঁকুরের গন্ধ লেগে গেল। খুব খেয়েছি আজ, বারণ করলাম, মাসীমা তবু আমার থালার ওপর ল্যাজাটা ধপাস ক'রে ফেলে দিয়ে বললেন, খা মুখপোড়া, যত পারিস খা। তপা নেই ব'লে মহীতোষ তো কিছুই খেলে না। ষষ্ঠীদা, তপাদি নেই ব'লে বাবুটি কম খেলেন কেন? একজন বাড়ী নেই ব'লে অন্য জনের খিদে থাকবে না, তেমন নিয়ম কি ধর্মশাস্তরে লেখা আছে?"

"চেপে যা বলরাম, চেপে যা—" ষষ্ঠী দত্ত কলম রেখে সোজা হ'য়ে বসল, "ব্যাপারটা কি শুনি? সন্ধের সময় আজ একটু বিশ্রাম করবার জন্যে ঘরে ঢুকলাম, আর তুই দেখছি ধর্মশাস্ত্রের ঢিল ছুঁড়ছিস ঘন ঘন। তোর মনে আজ এত ধর্ম এল কি ক'রে বলরাম?"

"মনে নয় ষষ্ঠীদা, পেটে। যত বলি আর খাব না, মাসীমা তবু বলেন, খা, গলা পর্যন্ত ভ'রে নে। গুনে গুনে পাঁচটা রসগোল্লা আমার থালার ওপব ফেলে দিলেন তিনি! ধর্ম কি আর বইতে লেখা থাকে ষষ্ঠীদা, ধর্ম সব পেটে।" এই ব'লে বলরাম চৌকি থেকে নেমে এসে ব'সে পড়ল মাদুরের ওপর। তার পর ষষ্ঠী দত্তর কানের কাছে মুখটা এগিয়ে নিয়ে নিচু স্বরে সে বলতে লাগল, "সাহেবটি বড় ভালমানুষ। তিনি যখন বসবার ঘরে ব'সে তপাদির সঙ্গে গল্প করছিলেন, তখন আমি চ'লে গেলাম ফটকের কাছে। ইয়া বড় মোটরগাড়ি—দেখলাম, গাড়িতে অনেক ধুলো। গড়িয়ার রাস্তায় ধুলো ছাড়া আর আছেই বা কি? এখানে যে আসবে তার গায়ে ধুলো লাগবেই। কোমর থেকে গামছাটা খুলে নিয়ে আমি গাড়িটা সাফ ক'রে ফেললাম। টাইগার আমার সঙ্গেই ছিল। বিশ্বাস না হয় টাইগারকে জিজ্ঞেস কর। একটু বাদেই সাহেবটি এলেন। গাড়ির গতরে একটুও ধুলো নেই দেখে তিনি

তো অবাক! পকেট থেকে একটা টাকা নিয়ে তিনি বললেন, 'বখশিশ।' আমি টাকা নিলাম না। বললাম, বখশিশ চাই না, একটা চাকরি চাই। তপাদির দিকে চেয়ে সাহেবটি জিজ্ঞেস করলেন, ছেলেটি কে? তপাদি বললেন, রিফিউজী, ষষ্ঠীদা রাস্তা থেকে ধ'রে এনেছে। আমি বললাম, রাস্তা থেকে নয়, স্টুডিয়োর সামনে থেকে। এক্টর হ'তে গিয়েছিলাম। তপাদি, তুমি ভাবছ আমি রিফিউজী ব'লে আমার কোন ঠিকানা নেই? ঠিকানা আছে। বাঘা যতীন কলোনীর ঠিকানায় চিঠি লিখে দেখো না, আমি পাব। ওখানকার পিওন ভোলাদা আমায় চেনে। কলোনীতে সে'ও একটা ঘর তৈরী করেছে। যাদবপুরের বাজার থেকে ঘরের খুঁটি চারটে মাথায় ক'রে নিয়ে এল কে? ইয়া মোটা মোটা চারটে খুঁটি একবারে আনতে পারি নি, চার বারে এনেছি। খুশী হ'য়ে ভোলাদা আমায় আট আনা পয়সা দিয়ে বলল, যা, হোটেলে গিয়ে পেট ভ'রে ভাত খেগে যা। আট আনায় পুরো একটা ফিষ্টি খাওয়া যায়। আমার কথা শুনে সাহেবটি আজ কি বললেন জান ষষ্ঠীদা?"

"না—"

"তিনি বললেন, নামসই করতে শিখলে একটা কাজ তিনি জুটিয়ে দিতে পারবেন।"

"সেই জন্যে তুই আমার পয়সা দিয়ে স্লেট-পেন্সিল কিনে নিয়ে এলি?"

"হ্যাঁ। নামসই করতে শিখলে আমার চাকরি জুটবে। ষষ্ঠীদা, অ, আ, ই আমি লিখতে পারি। চাকরিটা যদি একটু বড় হয়, তা হ'লে এক বছরের মধ্যে একশ' টাকা জমিয়ে ফেলতে পারব। তার পর তুমি আর আমি রওনা হ'য়ে যাব—কি যেন জায়গাটার নাম বললে তুমি? ও হ্যাঁ, বোম্বাই।"

"এই কি তোদের পেশা? দুধ খাইয়ে সাপ রেখেছি ঘরে।

তুই চাকরি করতে যাবি? আর আমি এখানে একলা একলা থাকব?" এই ব'লে ষষ্ঠী দত্ত চৌকির ওপর থেকে শ্লেটটা হাতে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল সামনের বারান্দাব দিকে। সরকার-কুঠির পলস্তারা-খসা কোন্ একটা দেয়ালের গায়ে ধাক্কা খেয়ে শ্লেটটা বোধ হয় ভেঙে চুবমার হ'য়ে গেল। বলরাম নিজের কান দুটো হাত দিয়ে চেপে ধ'রে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল বাইরের দিকে। কিছুই সে দেখতে পেল না—সরকার-কুঠির বারান্দায় শুধু ঘন অন্ধকার।

বসন্ত সরকাব চণ্ডী ভট্চাজের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলেন, তার পর জিজ্ঞাসা করলেন, "কি লিখছ, চণ্ডী?"

"ফলাফল—" চণ্ডী ভট্চাজ খাগেব কলমটা দোয়াতের গায়ে ঠেকিয়ে রেখে বলল, "কালই সব ব'লে দিতে হবে। জরুরি কাজ এটা।"

বসন্ত সরকাব চণ্ডী ভট্চাজের পাশেই এসে বসলেন। সঙ্গে চশমা ছিল না, তবুও তিনি রাশি নক্ষত্রের ছকটাব দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন দেখছ? দুটো ছক কেন? বিয়ের সম্বন্ধ নাকি?"

"না। স্বামী আর স্ত্রী। মহাশয়টি ভাগ্যবান। মাসে প্রায় দু'হাজাব টাকা মাইনে পান। তা ছাড়া তিনশ' টাকা বাড়ীভাড়া দেয় কোম্পানী। মোটরগাড়িও কোম্পানী কিনে দিয়েছে। ড্রাইভারকে মাইনে দিতে হয় না, দুপুরেব খাওয়াও কোম্পানীর পয়সায় চলে।"

"ছক থেকেই এসব হিসেব বার করলে নাকি চণ্ডী?"

"না—মহাশয়টির নিজের মুখ থেকেই সব শুনেছি। মেসো-মশাই, বিলেতী কোম্পানীর ব্যবস্থাই আলাদা। স্বাধীন ভারতবর্ষে এরা টাকা ছড়াচ্ছে দু'হাতে।"

"কি বললে? ছড়াচ্ছে না সরাচ্ছে? দু'দশ জন ভাগ্যবান

বাঙালীর দিকে চেয়ে তুমি ওদের সুখ্যাতি করলে বটে, কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি জান? অনাবশ্যক খরচ বাড়িয়ে বাড়িয়ে গবর্নমেণ্টকে ট্যাক্স দিচ্ছে কম। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ বণিকের মনে অনেক জ্বালা। তোমার গণনায় এসব কথা ধরা পড়বে না চণ্ডী। দু'হাজার টাকা মাইনে-পাওয়া মহাশয়টির নাম কি?"

"তপন লাহিড়ী।"

বসন্ত সরকার সহসা উঠে পড়লেন। বললেন তিনি, "যাই—দেখি তপার সঙ্গে একটু দেখা ক'রে আসি। সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়িয়েছে। মহীতোষকে নেমন্তন্ন ক'রে ডেকে এনে নিজেই সমস্তটা দিন অনুপস্থিত রইল। চণ্ডী, লাহিড়ী সাহেবের কোষ্ঠীতে কি দেখলে? কোন দিন কি তিনি বড়সাহেব হ'তে পারবেন? কিন্তু আমি ভাবছি, সাধারণ একজন মধ্যবিত্ত বাঙালী দু'হাজার টাকার বেশী মাইনে পাবেই বা কেন।" এই ব'লে বসন্তবাবু দরজার দিকে পা বাড়ালেন। চণ্ডী ভটচাজ পেছন থেকেই বলল, "লাহিড়ী সাহেব আর্থিক উন্নতি দেখবার জন্যে কোষ্ঠী বিচার করাচ্ছেন না।"

"তবে?" ঘুরে দাঁড়ালেন বসন্তবাবু।

"পারিবারিক গোলযোগ—" চণ্ডী ভট্‌চাজ চোখ থেকে চশমা খুলতে লাগল। খুলতে মিনিট-দুই সময় লাগল। অনেক দিনের পুরনো চশমা। সুতো দিয়ে কানের সঙ্গে বেঁধে রাখতে হয়। শুধু কোষ্ঠীবিচার করবার জন্যেই সে চশমা পরে। বালিগঞ্জের রাস্তা দিয়ে হাঁটবার সময় বড় বড় বাড়ীগুলো চেনবার জন্যে তাকে চশমা পরতে হয় না।

বসন্ত সরকার অপেক্ষা করছিলেন। চণ্ডী ভট্‌চাজ বলল, "লাহিড়ী সাহেবের স্ত্রীর সময়টা ভাল যাচ্ছে না। তাঁর রাশিচক্রের মধ্যে সবিশেষ গোলমাল চলছে। আরও কিছু দিন চলবে ব'লে মনে হয়। একটি পুত্রসন্তান হয়েছিল। ছ'মাস বয়স না হ'তেই সন্তানটি

মারা গেছে। মাস দুই আগে তার মৃত্যু ঘটে। আর ঠিক সেই সময় থেকেই মিসেস লাহিড়ীরও অসুখ হ'ল।”

“কি অসুখ ?”

“মাথার অসুখ ব'লেই তো মনে হয়। দিনরাত চুপ ক'রে ব'সে থাকেন। কাজ করেন না কিছু, কথা কন না কারো সঙ্গে। মাঝে মাঝে শুধু নিজের মনে বলেন, পাপ করেছি, পাপ করেছি—সেই জন্যেই খোকা বাঁচল না।”

“তার পর ?” বসন্ত সরকারের আগ্রহ বাড়ল।

“লাহিড়ী সাহেবের সাজানো-গোছানো সংসার ভেঙে পড়ছে। মিসেস লাহিড়ী কি যে পাপ করেছেন কিছুই তিনি বুঝতে পারছেন না। প্রশ্ন করলেও জবাব পান না।”

“তুমিই বা জবাব দেবে কি ক'রে চণ্ডী ? এর জবাব তো জ্যোতিষ-শাস্ত্রে নেই। তুমি তো মনস্তত্ত্বের ডাক্তার নও।”

“শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করতে বলছেন লাহিড়ী সাহেব।”

“কত টাকা পারিশ্রমিক পাবে ?”

“হিসেব এখনও দিই নি মেসোমশাই। মনে হয় শ'খানেক টাকার মধ্যে কুলিয়ে যাবে।”

বসন্তবাবু একটু হাসলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে তিনি বললেন, “পাপের প্রায়শ্চিত্ত অত অল্প টাকায় হয় না, চণ্ডী।” চ'লেই যাচ্ছিলেন বসন্ত সরকার। ফস ক'রে তিনি ব'লে বসলেন, “সন্তানটির জন্মের পেছনে বোধ হয় রহস্য ছিল।”

কোষ্ঠী দুটো একধারে সরিয়ে রেখে চণ্ডী ভট্চাজ বলল, “ব্যাপার দেখে তাই তো মনে হয়। সন্তানটি না জন্মালেই ভাল হ'ত। কিন্তু—” একটু ভেবে নিয়ে চণ্ডী ভট্চাজই বলল, “কোষ্ঠীতে দেখতে পাচ্ছি সন্তান তাঁর হ'তই এবং প্রথম সন্তান যে বাঁচবে না তাও গণনায় ধরা যাচ্ছে।”

“এ ছাড়া আর কিছু ধরতে পারছ না, চণ্ডী ?”

“পারছি...মেসোমশাই, মহিলাটি অন্য পুরুষের প্রতি অনুরক্তা।”

"ভট্চাজ !"

"গণনায় আমার ভুল নেই।"

"তপার কানে যেন একথা তুলে দিও না চণ্ডী।"

"তপার বিরুদ্ধে তোমরা ষড়যন্ত্র করছ বুঝি? আহা, মেয়েটির যে কেউ নেই রে—" বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন মাসীমা। চণ্ডী ভট্চাজের দিকে চেয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তপার কোষ্ঠীতে কিছু পাওয়া গেল না কি রে? খারাপ কিছু?"

"না না মাসীমা। তপাদির তো ভাল সময় আসছে।"

"তোর কথা মিথ্যে নয়, চণ্ডী। ভাল সময় বোধ হয় আজ সকাল থেকেই সুরু হয়েছে। পঞ্চানন ঠাকুরের পায়ে ফুল-বেলপাতা দেওয়ার শুভলগ্ন কি এল, চণ্ডী?"

বসন্ত সরকারের সারা দেহে যেন দুর্নীতির খোঁচা লাগল। লালুর মাকে তিনি আজও বুঝে উঠতে পারলেন না। পঞ্চানন ঠাকুরকে তিনি দেবতা ব'লে মানেন, অথচ তাঁর মন্দিরে তিনি গত পনের বছরের মধ্যে একবারও প্রবেশ করেন নি। দেবতার কাছে মানুষ কল্যাণভিক্ষা করে। কিন্তু লালুর মা কি ভিক্ষা করছেন? সুতপার স্বামী ফিরে আসুক তা তিনি চান না—অথচ ছোটসাহেব আজ সকালবেলা এখানে এসেছিলেন ব'লে লালুর মা মনে মনে পঞ্চানন ঠাকুরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। পুজো দেবার শুভলগ্ন খুঁজে বেড়াচ্ছেন তিনি! এর চেয়ে নিকৃষ্টতর দুর্নীতি মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন বসন্তবাবু। দোতলায় উঠতে লাগলেন তিনি। সুতপার ঘরের দরজা যদি খোলা থাকে, তা হ'লে তিনি ওকে জিজ্ঞাসা করবেন, মহীতোষকে এমন ক'রে বার বার অপমান করবার জন্য সুতপা কি দায়ী নয়?

সুতপার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। বসন্তবাবু দোতলার বারান্দায় পায়চারি করতে লাগলেন। যত দেরিই হোক সুতপাকে

তো একবার অন্তত বাইরে আসতেই হবে। খাওয়ার জন্যে নামতে হবে একতলায়।

সুতপা স্নানঘরে ঢুকেছে। বড্ড বেশী গরম পড়েছে আজ। দুপুরের দিকে কলকাতার উত্তাপ ছিল একশো সাত ডিগ্রী। বাইরে দাঁড়িয়েই বসন্তবাবু বুঝতে পারলেন সুতপার স্নান এখনো শেষ হয় নি। কল দিয়ে জল পড়ছিল।

সত্যিই পড়ছিল। সুতপা ঘরে ঢুকে ঘামে-ভেজা কাপড়-চোপড় সব খুলে ফেলেছিল তখ্খুনি। স্নানঘরে ঢোকবাব আগে একবার উঁকি দিয়ে দেখে নিয়েছিল, বতন ঘুমুচ্ছে, না জেগে রয়েছে। রতনের ঘর ওর ঘরেরই সংলগ্ন। মাঝখানে দরজা। দরজার ওপরে দু'তিনটে বড় বড় ফুটো আছে। ফুটোর ওপরে চোখ রাখলে গোপন-অস্তিত্বের সবকিছুই দেখা যায়। সুতপাব বিশ্বাস, আজ পর্যন্ত রতন ওর কোন-কিছুই দেখতে পায় নি। রতন টি-বি রোগে ভুগছে। ভুগছে অনেক দিন থেকে।

জামাকাপড়গুলো চৌকির তলায় পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে সরিয়ে রাখল সুতপা। মাথার ওপরে পাখার গতি বাড়িয়ে দিল সে। মাঝখানের দরজাটার কাছে এগিয়ে গিয়ে সুতপা আঙুল নেড়ে নেড়ে রতনেব বয়স হিসেব করতে লাগল। করলও। আষাঢ় মাসের ষোল তারিখে রতন সতেরোতে পড়বে।

ফুটোর ওপর চোখ রাখল সুতপা। পোকায় খাওয়া রতনের অস্তিত্বটা দেখতে ওর ভাল লাগে। দু'টো অস্তিত্বের তুলনামূলক মূল্যবোধ সম্বন্ধে সুতপা সর্বক্ষণই সচেতন। রতন অসুস্থ ব'লে সুতপা সুস্থ বোধ করে। রতন মরছে ব'লেই সুতপা বাঁচে।

ফুটোর ওপর চোখ রেখে সুতপা উবু হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল মিনিট পাঁচেক। পাখার হাওয়ায় পিঠের দিকের ঘাম শুকোচ্ছে। স্নানের আগে ঘাম শুকোনো দরকার। আজকে ওর সামনের দিকেও ঘাম জমেছে প্রচুর।

রতনকে দেখতে পেল সুতপা। একটা পাতলা চাদর দিয়ে পা থেকে গলা পর্যন্ত ঢাকা। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর, তাও দেখল সে। বাঁচবার আগ্রহ বাড়ল সুতপার। চ'লে এল স্নানঘরে। কলের তলায় চিৎ হ'য়ে শুয়ে ভাবতে লাগল, আগামী কাল রতনের ইনজেকশন নেওয়ার দিন। সকালেই ছুটতে হবে ইনজেকশন কেনবার জন্যে। ঘরে আর স্টক নেই। মাইনের টাকা ভেঙে ভেঙে ইনজেকশন কিনতে হয়, ডাক্তারের ভিজিটও দিতে হয়। এ যাবৎ সবসুদ্ধ কত টাকা খরচ হয়েছে তার একটা হিসেব করা দরকার। মরবার আগে রতনের জেনে যাওয়া উচিত যে, তার দিদি কর্তব্যকাজ করতে কখনও অবহেলা করে নি। রতনের জন্যে সে যদি টাকা খরচ না করত? বাংলা দেশে টি-বি রোগীর সংখ্যা কিছু কম নয়। রতন ছাড়া আর কারও জন্যেই তো সে একটা টাকাও খরচ কবে নি। করবার ইচ্ছাও হয় নি কোনদিন। তবে রতনের জন্যেই বা এতগুলো টাকা নষ্ট করল কেন সে? সংসারের চার দেয়ালের মধ্যে যা কর্তব্য, পৃথিবীর বৃহত্তর ক্ষেত্রে তা তো কখন কর্তব্য ব'লে স্বীকৃত হয় না! হাজার হাজার রতনের জন্যে একটা টাকাও তার খরচ করতে হয় নি ব'লে সংসারের কোন্ লোকই ওকে আজ পর্যন্ত বিন্দুমাত্র অনুযোগ দেয় নি। তবে কি সাংসারিক আর সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ? শুধু রক্তের সম্পর্কটা সামাজিক সম্পর্কের চেয়ে বড় হ'ল কি ক'রে?

টার্কিশ তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে মুছতে সুতপা প্রশ্নটার জবাব খুঁজতে লাগল। লম্বা তোয়ালে দিয়ে দেহটাকে ঢেকে ফেলল সে। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ। জবাবটা পরে খুঁজলেও চলবে। উপস্থিত সে জামাকাপড় খুঁজতে লাগল স্নানঘরের আলনায়।

আলনাটা খালি। সুতপার মনে পড়ল, তোয়ালের ওপর নির্ভর ক'রেই সে স্নানঘরে ঢুকে পড়েছিল। ঢুকে পড়বার আগে সে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল রতনের ঘরের দরজার সামনে। মনে মনে হিসেব

করেছিল সুতপা, আসছে আষাঢ়ে রতন সতেরো বছরে পড়বে। আজ সকালে তপন লাহিড়ীর সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ার আগে, রতনের গা-হাত-পা সে গরম জল দিয়ে মুছে দিয়ে গেছে। প্রতি সপ্তাহে একবার ক'রে মুছে দিতে হয়। রতনের বয়সের কথা সুতপার কোন সপ্তাহেই মনে পড়ে নি। আজকে, শুধু আজকে সকালেই আষাঢ় মাসের তারিখটা মনে পড়ল ওর। তপন লাহিড়ীর পাশে গিয়ে বসবার সুযোগ না ঘটলে একশো সাত ডিগ্রীর উত্তাপ আজকে আর ও বহন করতে পারত না। জ্বলে-পুড়ে কিংবা একাধিক ফোস্কা নিয়ে বাড়ী ফিরত সে।

এবার স্নানঘর থেকে বেরিয়ে পড়া দরকার। রতন যতদিন বাঁচবে, প্রত্যেক দিনই বয়স বাড়বে ওর। প্রকৃতির বিশেষত্বই হচ্ছে বৃদ্ধি। টি-বি রোগের পোকাগুলোও রতনের বয়স কমাতে পারে নি। রতন বাড়ুক, বেঁচে থাক। মাইনের টাকা ভেঙে ভেঙে সুতপা ইন্‌-জেকশন কিনে আনবে। নগদ টাকা খরচ ক'রে ডাক্তারও ডাকবে সে। তাঁরই পরামর্শমত রতনের গা-হাত-পা গরম জল দিয়ে ধুইয়ে দেবে সুতপা। রক্তের সম্পর্কের জন্যে না হোক, সামাজিক সম্পর্কের জন্যেও সে কর্তব্যকাজে অবহেলা দেখাবে না। রতন মানুষ, রতন অসহায়—শুধু এইটুকু জানা থাকলেই দায়িত্ব নেওয়া চলে এবং সেই দায়িত্বের জন্যে টাকাও খরচ করা যায়। এমনি একটা নির্ভরযোগ্য উপসংহারে পৌঁছে সুতপা বেরিয়ে এল স্নানঘর থেকে।

বসন্তবাবু পায়চারি করতে করতে হাঁপিয়ে উঠলেন। কল থেকে জল পড়ার আওয়াজ আর নেই। সদ্যস্নাতার কাপড় পরাও বোধ হয় শেষ হ'ল। বসন্তবাবু দরজায় টোকা দিতে গিয়ে খোঁচা মারলেন। দরজাটা একটু ফাঁক হ'য়ে গেল। সুতপা ভেতর থেকে খিল লাগাতে ভুলে গেছে।

চমকে উঠে সুতপা জিজ্ঞাসা করল, "কে?"

"আমি—" এই ব'লে বসন্তবাবু দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিলেন।

চোখে তাঁর চশমা ছিল না। ইতিমধ্যে সুতপা সুইচ টিপে ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিয়েছে।

"একটু দাঁড়াও মেসোমশাই—" সুতপা অন্ধকারেই কাপড় পরা শেষ করল। শেষ করার আগে সে নিশ্চিন্ত বোধ করল এই ভেবে যে, মেসোমশাই আজো তাঁর চোখের জন্যে চশমা কিনতে পারেন নি। মাসীমার চশমাটাই কখনো-সখনো তিনি চোখে লাগিয়ে উকিলের নোটিশ পড়েন। সুদ এবং আসল টাকা চেয়ে উকিল নাকি আজকাল মাঝে মাঝেই নোটিশ পাঠাচ্ছেন। হাসি পেল সুতপার। ওরই অসুখের জন্যে বাড়ীটা তাঁকে বাঁধা দিতে হয়েছিল!

একটু বাদেই বসন্তবাবু ঘরে ঢুকলেন। সুতপার ঘরে চেয়ার ছিল একটা। বসন্তবাবু চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলেন তাতে। অনেক দিন হ'ল সুতপার ঘরে তিনি প্রবেশ করেন নি। চোখে তাঁর চশমা ছিল না বটে, তবু তিনি মুহূর্তের মধ্যেই যা দেখলেন তাতে মনে হ'ল, ঘরখানা আগের মতই পুরনো। নতুন আবহাওয়ার প্রমাণ পেলেন না তিনি।

চুল আঁচড়ানো শেষ করল সুতপা। ড্রেসিং-টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে সে ঘাড়ের ওপর দিয়ে ব্লাউজের ফাঁকে পাউডার ঢালছিল। বসন্তবাবুর বুঝতে আর বাকী রইল না যে, সুতপার দেহে আজ প্লাবন বইছে। ভেতরের বাষ্পে দেহটা ভিজে উঠছে বার বার। একদা এই দেহটাই বরফের মত ঠাণ্ডা ছিল! সুতপা আজ পাউডার ঢেলে ঢেলে শরীরের ঘাম শুকোচ্ছে। আলোচনা সুরু করবার আগে বসন্তবাবু নস্যি নিলেন। ঘরময় পাউডার আর নস্যির গন্ধ ভেসে বেড়াতে লাগল।

খাকী রঙের ময়লা রুমাল দিয়ে নাক মুছলেন বসন্তবাবু। তার পর জিজ্ঞাসা করলেন, "সারাটা দিন কোথায় ছিলি, তপা?"

"তোমার কি মনে হয়?" ঘুরে দাঁড়াল সুতপা।

কোন কিছু মনে হওয়ার আগে বসন্তবাবু দেখলেন, সুতপার সারা

মুখে নতুন আবেগের চাপা ইঙ্গিত। ফস ক'রে বসন্ত সরকার প্রশ্ন ক'রে বসলেন, "প্রেমে পড়লি না কি?"

"প্রেমের দরিয়ায় হাবুডুবু খাচ্ছি, মেসোমশাই।" এই ব'লে সুতপা শুয়ে পড়ল তার নিজের বিছানায়।

"মহীতোষ তো সারাটা দিন ডাঙাব ওপর ব'সে সরকার-কুঠির প্রাচীন ইতিহাস শুনে গেল বে।" সুতপার দিকে মুখ ক'রে ঘুরে বসলেন বসন্তবাবু।

"সরকার-কুঠির প্রাচীনতার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? রক্ষিতের মোড়ে গিয়ে দেখে এস, জেঠমল মারোয়াড়ী আমাদের পুরনো বাড়ীটা ভেঙে ফেলেছে। ওখানে নতুন ইমারত উঠবে। গড়িয়া খালের ধারে সারি সারি ইটের পাঁজা। পাঁজাব গায়ে আগুন লাগিয়েছে জেঠমল। আজ ক'দিন থেকে দেখছি, দিনরাত আগুন জ্বলছে। মেসোমশাই, গড়িয়া খালের এঁটেল মাটি পুড়ে পুড়ে শক্ত হ'ল।"

"তোর তাতে কি?"

গলার নিচে হাত বুলোতে বুলোতে সুতপা জবাব দিল, "এখানেও নতুন ইমারত উঠছে—মাটি আর নরম নেই।—শুধু সরকার-কুঠিটাকে ধ'রে রেখে কি করবে? এটাও দিয়ে দাও জেঠমলকে।"

"আমার দেওয়ার জন্যে সে অপেক্ষা ক'রে নেই, আইনের জোরেই সে সরকার-কুঠি একদিন দখল করবে। হ্যাঁরে তপা, তোর কি মনে নেই, জেঠমলের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলাম তোকে রোগমুক্ত করবার জন্যে?"

"রোগ বোধ হয় আমার আর নেই, মেসোমশাই।"

"সারাটা দিন যখন তপন লাহিড়ীর সঙ্গে কাটিয়ে এলি, তখন আর রোগ থাকবার কথাও নয়।"

"মেসোমশাই!"

"তপা—তপা, তুই না পঞ্চানন ঠাকুরকে পুজো করিস?"

খিলখিল ক'রে হেসে উঠল সুতপা রায়, বিছানার ওপর গড়াতে

লাগল সে। হাত দুটো আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে ফেলে রাখল বুকের ওপর। তার পর বুকের ওপর মৃদু চাপ দিয়ে সে বলতে লাগল, "তপন লাহিড়ীকে তুমি চেন না। তাঁর ওজনও ওই মাটির ঢেলাটার চেয়ে অনেক কম।" এই ব'লে চোখ বুজল সুতপা রায়। বসন্তবাবু অপেক্ষা ক'রে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর ঘর থেকে তিনি বেরিয়ে গেলেন আলোটা নিবিয়ে দিয়ে।

॥ দুই ॥

মাসীমা খবর নিয়ে জানলেন, সুতপা ঘুমোয় নি। খবর নিতে এসেছিল বলরাম। ঘরটা অন্ধকার দেখে সে বাইরে থেকেই জিজ্ঞাসা করেছিল, "তুমি ঘুমোচ্ছ নাকি, তপাদি?"

"না, ভেতরে আয়।"

"কি ক'রে আসব, অন্ধকার যে?"

"সোজা নাকবরাবর চ'লে আয়—এসেছিস? এবার ডান দিকে ঘুরে দাঁড়া। বেশ, হাতটা বাড়িয়ে দে দেখি—"

"কোন্ হাতটা বাড়াব, তপাদি?"

"ডান হাতটা।"

"যে হাত দিয়ে ভাত খাই?"

"হ্যাঁ। পুরুষমানুষেরা ডান হাত দিয়ে শুধু ভাত খায় না। বলরাম—"

"তপাদি—"

"আজ পেট ভ'রে খেয়েছিস তো?"

"খেয়েছিলাম। এখন সব হজম হ'য়ে গেছে। খুব খিদে পেয়েছে আবার। মাসীমা বললেন, তুমি না খেলে আমি খেতে পাব না। তুমি এখন খেতে যাবে না, তপাদি?"

"রাত্তিরে আজ আর আমি খাব না।"

"ঠিক বলছ ?"

"হ্যাঁ।"

"তা হ'লে যাই, মাসীমাকে খবরটা দিই গে যাই।"

ঘরের অন্ধকার খুব ঘন, সুতপা তবু বুঝতে পারল, বলরাম দরজার দিকে চ'লে গেল খুব দ্রুত গতিতে। বলরামের ডান হাতটা ধ'রে ফেলতে পারলে এত তাড়াতাড়ি সে চ'লে যেতে পারত না। খানিকটা আলাপ-আলোচনার পর বলরামকে হাতে ধ'রে বিছানার পাশে বসিয়ে রাখবে ব'লে মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছিল সুতপা। রাতের নির্জনতা আজ ওর কাছে অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। কথা বলার জন্যেও কাউকে কাছে পাওয়া দরকার।

বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে লাগল সুতপা। এ পর্যন্ত একটা রাতও এমন অসহ্য ব'লে মনে হয় নি ওর। রাতের বিস্তৃতি ক্রমশই ওর দেহের ওপরে চেপে বসতে লাগল। ওজনের আস্বাদ পাচ্ছে সরকার-কুঠির সুতপা রায়।

তপন লাহিড়ীর কথা মনে পড়ল ওর। কোনকিছু একটা মনে না পড়লে অচেতন মনের অন্ধকার অপসারিত হ'ত না। খুবই কাছে এসে পড়েছেন ছোটসাহেব। পাঁচ বছরের দূরত্ব ঘুচে যেতে পনেরটা দিনও লাগল না। পাশ ফিরে শুলো সুতপা রায়।

পনের দিন আগেই তো ওর দিকে প্রথম ছোটসাহেব মুখ তুলে চেয়েছিলেন। আপিস-ঘরে সুতপা ছাড়া অন্য কেউ তখন ছিল না, বড়বাবু পর্যন্ত চ'লে গিয়েছিলেন। লাহিড়ীসাহেব নিজের কামরায় ব'সে কাজ করছিলেন। তিনি আগেই খবর পাঠিয়েছিলেন যে, নোট নেওয়ার জন্যে সুতপাকে অপেক্ষা করতে হবে। বাড়ী ফিরতে আজ রাত হবে ওর।

সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত সুতপা তার নিজের টেবিলে ব'সে কাজ করেছে। কই, ছোটসাহেব তো ওকে এখনও ডাকলেন না ? উঠে পড়ল সুতপা। এগিয়ে গেল লাহিড়ীসাহেবের কামরার দিকে।

উঁকি দিয়ে সে দেখল ছোটসাহেব ফাইল পড়ছেন না, বই পড়ছেন। বইটাতে খবরের কাগজের মলাট দেওয়া।

বইখানার সঙ্গে সুতপার পরিচয় হয়েছিল তিন দিন আগেই। তিন দিন আগে থেকেই ছোটসাহেব বইখানা পড়ছিলেন। বাড়ী যাওয়ার সময় ফাইলের তলায় বইটা তিনি লুকিয়ে রেখে যেতেন। সুতপা লক্ষ্য করেছিল সব, মনে মনে হেসেও ছিল খুব। চল্লিশ বছর পার হওয়ার পরে ছোটসাহেব ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের মই বেয়ে অজানা জগতে পৌঁছবার চেষ্টা করছেন! সুয়েজ খালেব সঙ্কট তিনি অতিক্রম করেছেন অনেকদিন আগেই।

দরজার বাইরে থেকে সুতপা জিজ্ঞাসা করল, "আসতে পারি কি সার?" আমন্ত্রণের জন্য অপেক্ষা করল না সে, ভেতরে চ'লে এল সুতপা। লাহিড়ীসাহেব বইখানা ফাইলের তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন, "নোট নাও। রাউরকেলাতে ইস্পাত তৈরীর কারখানা বসছে—"

"আপনি একটু স'রে বসুন তো সার, ফাইলগুলো সব গুছিয়ে রাখি।"

সুতপা এগিয়ে গেল টেবিলের দিকে। লাহিড়ীসাহেব ব্যস্তভাবে ব'লে উঠলেন, "না না, এখন থাক। নোট নাও—" সামনের ফাইলটা দু'হাত দিয়ে চেপে ধ'রে তিনিই আবার বললেন, "বড্ড পরিশ্রান্ত আজ। ভারতবর্ষে ইস্পাত তৈরী হ'ল কি না হ'ল তাতে আমাদের কি, সুতপা?"

বিস্মিত দৃষ্টিতে সুতপা চেয়ে রইল লাহিড়ীসাহেবের দিকে। তার পর ধীরে ধীরে সে বলতে লাগল, "সাতটা তো বাজল, এবার বাড়ী যান সার। মিসেস লাহিড়ী হয়তো ভাবছেন।"

"সবিতা আজকাল আর আমার কথা ভাবে না। বোধ হয় কোনদিনই ভাবে নি।" তপন লাহিড়ী উঠে পড়লেন। দক্ষিণ দিকের জানালাটা খুলে দিলেন তিনি। চৌরঙ্গীর আলো ঢুকে পড়ল ঘরে।

জানালার ওপর ভর দিয়ে তিনি চেয়ে রইলেন চৌরঙ্গীর দিকেই। সুতপার বুঝতে আর বাকী রইল না যে, ছোটসাহেব আহত হয়েছেন, আঘাত পেয়েছেন খুবই। সাংসারিক গোলযোগে মনটি তাঁর সহানুভূতি-প্রয়াসী। এ সহানুভূতি সুতপা ছাড়া আর কেউ তাঁকে দেখাতে পারে না। স্ত্রীলোকের সান্নিধ্য তিনি কামনা করছেন। সুতপা জানে, সে যদি একটু ঝুঁকে দাঁড়ায় ছোটসাহেব ব'সে পড়বেন। আর সুতপা যদি ব'সে পড়ে, ভেঙে পড়বেন বণিক অফিসের তপন লাহিড়ী। গত পাঁচটা বছর তিনি ওর দিকে চেয়েও দেখেন নি। আজকে পরিস্থিতি একেবারে বিপরীত। সুতপা যদি মুখ ঘুরিয়ে নেয়?

সুতপার ঘাড়ের ওপর হাত রাখলেন লাহিড়ীসাহেব। পরিপুষ্ট বুর্জোয়া আঙুলগুলোতে তাঁর মসৃণতার ঢেউ! সুতপার শীর্ণ দেহের ঘাড়ের অস্থিতে ঢেউগুলো সব ভেঙে পড়তে লাগল। মুহূর্তের জন্যে স্বপ্ন দেখল সুতপা রায়। প্রেমের সম্পর্ক একটা গজিয়ে উঠতেও সময় লাগল না। প্রেম? সশব্দে হেসে উঠল সুতপা, শূন্যতার হাসি! মানবজীবনের অস্তিত্ব এত হাল্কা ব'লেই তো স্বপ্ন দেখার প্রলোভন সুতপাও ত্যাগ করতে পারল না। শূন্যতাকে এড়িয়ে যাওয়ার অপর নামই তো প্রেম।

নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হ'ল সুতপা। ঘুরে দাঁড়িয়ে সে বলল, "অনেক রাত হয়েছে। স্ত্রীর কাছে এবার আপনি ফিরে যান।"

"তুমি কোথায় ফিরে যাবে, সুতপা?"

"মাসীমার হোটেলে।"

"সেখানে কি আছে?"

"বাঁচবার জ্বালা।"

"চল, তোমায় আমি পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"না, আমি পাঁচ নম্বর ধরব।"

লাহিড়ী সাহেব এগিয়ে এলেন সুতপার কাছে—খুবই কাছে।

বললেন তিনি, "ড্রাইভারকে ছেড়ে দিয়েছি, আমি নিজেই তোমায় পৌঁছে দেব। সুতপা—"

লাহিড়ীসাহেবের সুরে লোভের আবেগ। ফস ক'রে তিনি সুইচটা টিপে দিলেন, ঘর অন্ধকার হ'ল। কার্জন পার্কের কলরব থেমে গেছে। ট্রাম চলার আওয়াজও তেমন নেই। এসপ্লানেডের কোণ থেকে শুধু বিজ্ঞাপনের আলো জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ল আপিস-ঘরটায়। সুতপা আর লাহিড়ীসাহেবের মাঝখানে কেবল একটা মুহূর্তের ব্যবধান দুলতে লাগল অস্থিরভাবে। এসপ্লানেডের মোড়ে রাতের বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা না থাকলে এমন মুহূর্তটাও দেখতে পেত না সুতপা। সে জানে মুহূর্তটাকে অগ্রাহ্য করলে অস্তিত্বকেও অগ্রাহ্য করা হয়। মুহূর্ত মানেই জীবন। পরের মুহূর্তটার সবটুকুই স্বপ্ন, সবটুকুই শূন্যতা। সতীত্ব-রক্ষা ওর কাছে স্বপ্নমাত্র, তবুও সে স'রে এল লাহিড়ীসাহেবের কাছ থেকে। সবিতা দেবীর দেহের মধ্যে অধিকারের পরিতৃপ্তি রয়েছে ব'লেই লাহিড়ীসাহেব নতুন দেহের সান্নিধ্য চাইছেন। তপন লাহিড়ী পুনরায় এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন সুতপার কাছে।

সুতপা জিজ্ঞাসা করল, "কি চান আপনি ?"

"ভালবাসতে চাই।"

আলো জ্বালিয়ে দিল সুতপা রায়। দিয়ে বলল, "নির্জন আপিস-ঘরে স্টেনোগ্রাফারকে ভালবাসবার জন্যে আলো নিবিয়ে দেবার দরকার কি ? আপনি এবার বাড়ী যান, আমি চললাম। পাঁচ নম্বর ধ'রে গড়িয়ায় পৌঁছতে আমার দেড় ঘণ্টা লাগবে। চলি, সার ?"

"একটু দাঁড়াও।" এই ব'লে ছোটসাহেব ডান দিকের ড্রয়ার খুললেন।

এই ড্রয়ারটা সুতপা চেনে। ড্রয়ারের গায়ে লেবেল লাগানো রয়েছে—কনফিডেনশিয়াল।

নতুন একটা মুহূর্তের জন্ম হ'ল। এই মুহূর্তটির মধ্যেও অস্থিরতার

বীজ লুকনো। অসহায় বোধ করতে লাগল বণিক-আপিসের স্টেনোগ্রাফার মিসেস সুতপা রায়। মানবজীবনের মূলে সত্যিই কোন রহস্য নেই, আছে অসহায়তা।

ছোটসাহেব ড্রয়ার থেকে একটা ফাইল বার করলেন। দু'চারটে পাতা ওলটালেন তিনি। তার পর ফাইলটা এগিয়ে ধরলেন সুতপা রায়ের চোখের সামনে। সুতপা পড়ল। কাগজের ওপরে মাত্র তিনটে লাইনই লেখা ছিল। শ্যামনগরের দিকে কোম্পানী একটা নতুন কারখানা খুলেছে। সেখানকার ম্যানেজার একজন অভিজ্ঞ স্টেনোগ্রাফার চাইছেন। সুতপাকে সেখানে বদলী করার প্রস্তাব পেশ করেছেন বড়বাবু। এখন শুধু লাহিড়ীসাহেব সই করলেই বদলীর ব্যবস্থাটা পাকা হ'য়ে যায়।

সুতপা বলল, "গড়িয়া থেকে প্রত্যেক দিন শ্যামনগরে যাওয়া তো সম্ভব নয়।"

সিগারেট ধরিয়েছিলেন ছোটসাহেব, তখনি তিনি জবাব দিলেন না। সিগারেটে মৃদু মৃদু টান দিতে লাগলেন। কষ্ট পাক সুতপা, যন্ত্রণাভোগের সময়টা বিলম্বিত হোক।

সুতপা পুনরায় বলল, "আমার একটি ভাই আছে। আমিই তাকে দেখাশুনা করি, আমাকে শ্যামনগরে যেতে বলার অর্থ হচ্ছে আমায় চাকরি থেকে বরখাস্ত করা।"

এর পরেও লাহিড়ীসাহেব কিছু বললেন না। নতুন একটা সিগারেট ধরালেন। সুতপার আর্থিক স্বাধীনতার সৌধ এরই মধ্যে ভেঙে চুরে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। পায়ের তলার মাটিতে ওর কম্পন উঠেছে! এখন কি করবে সুতপা রায়? মানুষ নাকি স্বভাবতই ক্ষমাশীল, দয়াবান, কল্যাণকামী এবং ধর্মপ্রবণ? শুধু তাই নয়, মানুষের দেবসুলভ চারিত্রিক সম্পদের গল্পও ওর শোনা আছে অনেক। ছোটসাহেবও তো মানুষ। তাঁর দেবত্বের প্রতি আবেদন জানানো ছাড়া সুতপা আর দ্বিতীয় পথ দেখতে পেল না। অসহায়

সুতপা মনে মনে হাসতে লাগল। হাসতে হাসতেই সে দেবত্বের চোরাবালিতে পা ঢুকিয়ে দিল।

রাত্রির মাদকতা ক্রমশই ঘনতর হচ্ছে। পনের দিন আগের ঘটনাটা মনে মনে আলোচনা করবার পরেও সুতপা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। বিছানা থেকে উঠে পড়ল সে। রতনের ঘরে এসে নিচু স্বরে ডাকল সুতপা, "রতন, রতন—"

সাড়া পেল না রতনের। রতন ঘুমুচ্ছে। রাত এখন কত? রতনের বিছানার পাশে ছোট টেবিলের ওপরে একটা ঘড়ি ছিল। ঘড়িটা দেখবে মনে ক'রেই সুতপা ব'সে পড়ল ওর বিছানার পাশে। ঘড়িতে সময় দেখল, সাড়ে বারোটা।

টিক্ টিক্ ক'রে ঘড়িতে আওয়াজ হচ্ছে। রতনের আয়ু ক'মে যাচ্ছে এক এক সেকেণ্ড ক'বে। প্রত্যেকটি মানুষেরই আয়ু কমছে বটে, কিন্তু সুতপা তাতে বিব্রত বোধ করে না। শুধু রতনের জন্যেই ওর ভাবনা। রতন এত বেশী অসুস্থ ব'লেই সুতপা ওর আয়ুর হিসেব করে সেকেণ্ড গুনে গুনে। রতন ম'রে গেলে সুতপার জীবনে আবার নতুন সঙ্কট আসবে, বেঁচে থাকবার সঙ্কট। অসুস্থ রতনের জন্যেই সুতপা বেঁচে থাকবার তাগিদ অনুভব করে।

রতনের গায়ের ওপর আলগা ভাবে হাত রাখল ও। হাতের তালুতে ওর টি-বি রোগের তাপ লাগল। কাল সকালে ইন্‌জেকশন কেনবার জন্যে ছুটতে হবে। শ্যামনগরে বদলি হ'য়ে গেলে মুখে ওর জল দেবারও লোক থাকবে না। বদলি হওয়ার প্রস্তাব পাকা হয় নি বটে, কিন্তু বাতিলও হয় নি। সুইচ টিপে আলোটা নিবিয়ে দেবার পরে সেদিন ছোটসাহেবের সঙ্গে আর কোন কথা হয় নি, কথা তিনি বলতে চান নি। আলোটা শুধু জ্বালিয়ে দিয়ে ছোটসাহেব বেরিয়ে গিয়েছিলেন আপিস থেকে। পাঁচ নম্বর ধ'রেই ওকে ফিরে আসতে হয়েছিল গড়িয়ায়।

সেই থেকে লাহিড়ীসাহেব নোট নেওয়ার জন্যে ওকে আর ডাকেন নি, তিনি বোম্বাই গিয়েছিলেন আপিসের কাজে। বোম্বাইয়ের আপিসটাই এঁদের সবচেয়ে বড়। এ ক'টা দিন সুতপার মনে হয়েছিল যে, সে শুধু একা নয়, পরিত্যক্তা। পৃথিবীটাকে যাঁরা বিরাট এবং জনসঙ্কুল ব'লে কল্পনা করেন, তাঁরা মানুষের এই নির্দয়-একাকিত্বের সত্য কখনও স্বীকার করেন না। অন্তরের গুহায় প্রতিটি মানুষই কি একা নয়?

রতনের দেহ থেকে সুস্থতা সব লোপ পেয়েছে। ওর গায়ে হাত বুলোচ্ছিল সুতপা। টি-বি রোগের পোকাগুলো মাংস তো সব খেয়েছেই, এখন বোধ হয় রতনের হাড় চাটছে ওরা। এই আষাঢ়েই রতন সতের বছরে পড়বে। ফস ক'রে হাতটা সরিয়ে নিয়ে এল সে। রতন জেগে গেছে।

"দিদি, তুমি আজ সারাদিন কোথায় ছিলে? আজ তো রবিবার।"

"রবিবার? রবিবার মানে কি, রতন?"

"যে দিনটাতে আপিস-আদালত সব বন্ধ থাকে। মানুষ যেদিন কাজ করে না।"

"আমাদের জীবনে রবিবার ব'লে বিশেষ কোন দিন নেই। কতকগুলো মুহূর্ত আছে মাত্র। প্রত্যেকটা পরের মুহূর্তই এক-একটা অন্তহীন গহ্বর।"

"কিসের গহ্বর দিদি?"

"শূন্যতার। তুই এখন ঘুমো, রতন।" এই ব'লে সুতপা রতনের পায়ের দিকটা চাদর দিয়ে ঢেকে দিতে লাগল। চিৎ হ'য়ে শুয়েছিল রতন। এবার সে এপাশ ফিরে শুয়ে পুনরায় প্রশ্ন করল, "সারাটা দিন তুমি কোথায় ছিলে?"

"ছোটসাহেবের সঙ্গে। তিনি আজ সকালে এখানে এসেছিলেন।"

"দিদি, লোকে যদি নিন্দে করে? তা ছাড়া, জামাইবাবু যদি কখনও শুনতে পান—"

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সুতপা। কথা বলল না সে। নিজের ঘরে এসে ও শুধু ভাবল যে, টি-বি রোগের পোকাগুলোকে যতটা মারাত্মক সে মনে করেছিল, ততটা মারাত্মক ওরা সত্যিই নয়। সংস্কারের দেহে ওরা আজও দাঁত বসাতে পারে নি।

সামনের দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়াল সে। সরকার-কুঠির বাগানটা এখান থেকে দেখা যায়। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, নইলে বড় ফটকটাও স্পষ্ট দেখা যেত। ছোটসাহেব আজ মাস্টার বিয়ুইক গাড়ি নিয়ে ওই ফটক দিয়েই ঢুকে পড়েছিলেন সরকার-কুঠিতে। পুরনো ফটকের পলস্তারা নাকি খ'সে পড়েছে আজ। ছোটসাহেবের চেয়ে গাড়িটার বলিষ্ঠতা অনেক বেশী। তাই, ও গাড়িটার গায়ে আজ হাত বুলিয়েছে বারকয়েক। ভাল লেগেছে হাত বুলতে। কল্পনা করেছে মনে মনে, একদিন যেন এই গাড়িটাই ফটকটাকে ভেঙে চৌচির ক'রে দেয়। পুরনো পচা মাটির ভগ্নাংশকে ওরা নাম দিয়েছে পঞ্চানন ঠাকুর! সুতপার বিগ্রহকে এরা কেউ চিনতে পারে নি। আঁচল দিয়ে মুখ মুছল সুতপা। মধ্যরাত্রির শান্ত আবহাওয়াতেও উষ্ণ অনুভূতি ছড়িয়ে পড়েছে। সুতপা ঘর্মাক্ত।

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল সে। ফটকের ভাঙা পলস্তারা পা দিয়ে নেড়ে দেখতে চায় ও। তপন লাহিড়ীর মধ্যে সত্যিই কিছু দেখবার ছিল না। সবিতা দেবী বিয়ের পরেও তাঁকে ভালবাসেন নি। সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী মহিলাটির দেহ পেয়েছেন, মন পান নি তিনি। হোটেলে ব'সে তিনি আজ কত কি-ই না বললেন। হাজার দুই টাকা মাইনে না পেলে এমন গল্প কেউ বলতে পারে না। সংসারে কত রকমের যে সৌখিনতা আছে ভেবে আশ্চর্য হ'য়ে গেল সরকার-কুঠির সুতপা রায়।

একতলায় নেমে আসতেই সে দেখতে পেল, ষষ্ঠী দত্তর ঘরে আলো জ্বলছে। এত রাত অবধি কি করছে ষষ্ঠীদা? সুতপা খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কি লিখছ তুমি?"

"গল্প," লেখা-কাগজগুলো গুছিয়ে সে গুঁজে রাখল বালিশের তলায়,—"তারপর, এত রাত্রে কি মনে ক'রে? এসো, ভেতরে এসো।"

ভেতরে গিয়ে চৌকির ওপর ব'সে পড়ল সুতপা। পুবদিকের দেয়ালের গায়ে বেশ বড় রকমের একটা কুলুঙ্গি। ষষ্ঠীদার যাবতীয় দরকারী জিনিস সব কুলুঙ্গিতে সাজানো। লম্বা পাটাতনের ওপর ফ্রেমে বাঁধানো তিন-চারখানা ফোটো রয়েছে। ফোটোগুলো সব মেয়েদের। দু' একটি মুখের সঙ্গে সুতপার যেন পরিচয় আছে ব'লে মনে হ'ল। বোধ হয় রাস্তাঘাটে দেয়ালের গায়ে দু' একটি মুখ সে দেখে থাকবে।

"ফোটোগুলো কাদের, ষষ্ঠীদা?"

"সবার নাম তো আমার মনে নেই। খবরের কাগজে এদের নাম বেরোয়। অভিনয় করে এরা। এদের মুখেই আমায় রং মাখাতে হয়।"

"মাঝখানেব মেয়েটির মুখটা তো ভা-রি সুন্দর!" সুতপা ফোটোর কাছে উঠে গিয়ে দাঁড়াল।

ঘাড় ফিরিয়ে কুলুঙ্গির দিকে দৃষ্টি ফেলল ষষ্ঠী দত্ত। তারপর সে বলল, "সুন্দর? ওর মুখের চামড়ায় তো হাত দাও নি তপাদি— গণ্ডারের চামড়ার মত খসখসে। তারপিন তেল দিয়ে মুখের চামড়া ওর ঘণ্টা দুই ভিজিয়ে রাখতে হয়। সবচেয়ে কুৎসিত বোধ হয় ঐ মেয়েটিই। সংসারটা বড় বিচিত্র জায়গা—মুখের চেয়ে মুখোশের দাম এখানে অনেক বেশী।"

সুতপা ষষ্ঠী দত্তর মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলল। চেয়ে রইল দু' এক মিনিট। তারপর সে জিজ্ঞাসা করল, "রাত জেগে লুকিয়ে লুকিয়ে তুমি গল্প লেখ কেন, ষষ্ঠীদা? কার জন্যে লেখ?"

"নিজের জন্যে। এ-গল্পের হিরো আমি নিজেই।"

"গল্পটা একটু শোনাও না?"

"আজ নয় তপাদি—অন্য এক দিন। তোমায় নিজে আমি ডেকে নিয়ে আসব।"

"তা হ'লে—" ঘরের চারদিকটা দেখতে দেখতে সুতপা জিজ্ঞাসা করল, "বলরাম কোথায়? তাকে তো দেখছি না।"

"দোতলার ছাদে গেছে ঘুমুতে।"

"চলি ষষ্ঠীদা—"

সুতপা বেরিয়ে এল ষষ্ঠী দত্তের ঘর থেকে। পেছন থেকে ষষ্ঠী দত্ত বলল, "শাড়ির আঁচলটা তোমার মাটিতে লুটোচ্ছে, তপাদি।"

"ও, তাই নাকি!" লুটানো-আঁচল গুছিয়ে ঘাড়ের ওপর তুলে রাখবার চেষ্টা করল না সে। অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে লাগল। দোতলার সিঁড়ি শেষ হ'লে, আরও একটা লম্বা সিঁড়ি ওকে ভাঙতে হবে। ছাদ পর্যন্ত উঠবে সুতপা। মাসীমার হোটেলে যে একটা ছাদ আছে সেই খবরটা ওর জানা ছিল না। আজ যেন এই প্রথম জানল। ষষ্ঠীদার খবরটা হয়তো মিথ্যে নয়। বলরাম নিশ্চয়ই ঘুমুতে গেছে দোতলার ছাদে।

বলরাম? সুতপা কি তবে বলরামের খোঁজ করবার জন্যেই নেমে গিয়েছিল একতলায়? বোধ হয় না। অচেতন মন থেকে ও তপন লাহিড়ীকে তাড়িয়ে দিতে পারে নি। সমস্ত দিনের সান্নিধ্যটা ভিন্ন ভিন্ন নামে আজ ওর মনের মধ্যে এসে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। অবাক হ'ল সুতপা। ক্লান্ত পদক্ষেপ টলমল করছে। ঘর পর্যন্ত পৌঁছতে বাকি রাতটুকু হয়তো শেষ হ'য়ে যাবে।

তা যাক, তবুও পৌঁছনো চাই। বারান্দায় উঠে এল সুতপা। কি একটা অজানা আশঙ্কা যেন ওর গোটা অস্তিত্বটাকে অবশ ক'রে দিতে চায়। থেমে গেল সুতপা। শক্তিসঞ্চয়ের প্রয়োজন হয়েছে। শঙ্কা থেকে মুক্তি চায় ও। কিন্তু কি ক'রে মুক্তি পাবে সে? শঙ্কা থেকে মুক্তি পাওয়ার মানেই তো মৃত্যু।

ধীরে ধীরে সুতপা এগিয়ে গেল নিজের ঘরের দিকে। দরজাটা

সে খুলেই রেখে গিয়েছিল। এখন সে দেখতে পেল, দরজাটা ভেজানো রয়েছে। তবে কি বলরাম এসে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গেল? ভেজিয়ে দিয়ে বলরাম কি ঘরে ব'সে অপেক্ষা করছে? হাতের মুঠোয় কি একটা পেল মনে ক'রে স্নতপা তাড়াতাড়ি ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল।

তপন লাহিড়ী ব'সে ছিলেন স্নতপার বিছানার ওপর! স্নতপা ভেতরে ঢুকে প্রশ্ন করল, "তুমি? এত রাত্রে?"

"এটা তো হোটেল—এখানে রাত্রি হয় বটে, কিন্তু 'এত রাত্রি' হয় না। তপা, থাকতে পারলাম না, ছুটে এলাম। পালিয়ে এলাম দেওদার স্ট্রীট থেকে। বিয়ুইক গাড়ির ট্যাঙ্কে কুড়ি গ্যালন পেট্রল মজুত। চল—"

রতনের ঘরের দরজাটা খুলে দিল স্নতপা। আলোটাও জ্বালিয়ে দিল সে। ধীরে ধীরে ডাকতে লাগল, "রতন, রতন—ছোটসাহেব এসেছেন।"

"দিদি, এত রাত্রে?" চোখ খুলল রতন।

"এটা তো গৃহস্থের সংসার নয় রতন, এখানে 'এত রাত্রি' হবে কেন ভাই?"

স্নতপা ব'সে পড়ল রতনের বিছানার উপর।

তপন লাহিড়ী উঠে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "রতন তোমার ভাই?"

"হ্যাঁ।" জবাব দিল স্নতপা।

"কি হয়েছে ওর?"

"টি-বি।"

"টি-বি? শোবার ঘরের এত কাছে টি-বি? ভয় করে না তোমার?"

"জীবন মানেই তো ভয়, শঙ্কা। ছোটসাহেব, তুমিও এসে ব'স এইখানে। জীবনের দোয়াতটা ভাল ক'রে দেখ। দেখ, টি-বি

রোগের পোকাগুলো কালির মধ্যে ডুবে রয়েছে। কলম এনে দিচ্ছি, ছোটসাহেব। আমার বদলির ব্যবস্থাটা তুমি পাকা ক'রে যাও। চ'লে যাচ্ছ ? একটা সই বসিয়ে দেবে না ?"

রতনের কপালের উপর একাধিক জলের বিন্দু ভেঙে পড়তে লাগল। কাল সকালে আপিসে গিয়ে হাসবার আগে সুতপা আজকের রাতটুকু কেঁদে কেঁদে শেষ ক'রে ফেলতে চায়। কুড়ি গ্যালন পেট্রল, ছোটসাহেবের হিসেবে নাকি অনেকটা তেল !

॥ তিন ॥

পরের দিন সকালবেলা বলরামকে ঘুম থেকে তোলবার জন্যে মাসীমা দোতলায় উঠে এলেন। ছাদে ওঠবার সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি, হাঁফিয়ে পড়েছেন। বলরামের ওপর রাগ হ'ল তাঁর। সরকার-কুঠিতে এত জায়গা থাকতে ছেলেটা ছাদে গেছে কেন ঘুমোতে ? বাগানেও তো জায়গার অভাব ছিল না। ছাদের দরজায় আজ তালা লাগিয়ে দেবেন ব'লে মনে মনে স্থির করলেন মাসীমা। তার পর তিনি ধীরে ধীরে ছাদের সিঁড়ি ভাঙতে লাগলেন।

টাইগার ব'সে ছিল বলরামের পাশে। মাসীমাকে দেখে সে লেজ নাড়তে লাগল। পায়ের কাছে এসে ব'সে পড়ল সে। মাসীমা দেখলেন, গত কয়েক দিনের মধ্যে টাইগারের চেহারা গেছে বদলে, গাড়ে-গর্দানে মাংস গজিয়েছে। পাঁজরার হাড়গুলোও আর দেখা যাচ্ছে না। বলরাম কি তবে হেঁসেল থেকে ভাত চুরি ক'রে ক'রে টাইগারকে খাওয়াচ্ছে ? কাল রাত্রে বিজয় মাস্টার হোটেল-খরচার হিসেব করছিল। প্রতি সপ্তাহের হিসেব বিজয়ই লিখে দেয় মাসীমাকে। কাল সে হিসেব ক'রে মাসীমাকে বলেছিল যে, গত সপ্তাহে সেরদশেক চাল বেশী খরচ হয়েছে। টাইগারকে সামনে দেখতে পেয়ে মাসীমার সন্দেহ যেন সত্যে পরিণত হ'ল। বলরাম

নিশ্চয়ই শম্ভু ঠাকুরের চোখে ধুলো দিয়ে ভাঁড়ারঘর থেকে চাল সরাচ্ছে। স্বাধীন ভারতবর্ষে চালের দাম এত বেশী বেড়ে গেছে যে, নতুন ক'রে পবাধীনতার শিকল পবতেও আপত্তি ছিল না মাসীমার। সকালবেলা দোতলার ছাদে উঠে মনেব শান্তি নষ্ট হ'ল তাঁর। বলবামের ওপব রাগ বাড়তে লাগল। একজনের খাবার তিনি কোন রকমে যোগাড় করছিলেন। এখন দেখছেন, টাইগারকেও সে লুকিয়ে লুকিয়ে ভাত খাওয়াচ্ছে!

ধাক্কা দিয়ে টাইগারকে একদিকে সরিয়ে দিলেন মাসীমা, তার পর ব'সে পড়লেন বলরামের পাশে। বলরাম চিৎ হ'য়ে ঘুমোচ্ছিল। বুকেব ছাতি চওড়া হয়েছে। হাতেব পেশীতে নতুন মাংসের গোলাকৃতি মসৃণতা। এত মসৃণতা এল কেমন ক'রে? বলরাম কি তবে স্নানের আগে সবষেব তেল গায়ে মাখে? গত সপ্তাহে সেবছুয়েক তেল বেশী খবচ হয়েছে ব'লে বিজয় মাস্টার হিসেব লিখল কাল। বুড়ো বয়সের বাগ সহজে কমতে চায় না। মাসীমা বলরামের দুটো কানই দু'হাত দিয়ে টেনে ধবলেন। টাইগার ছুটে এসে মাসীমাব মুখের দিকে চেয়ে 'ঘেউ ঘেউ' ক'রে গর্জন করতে লাগল।

কানে টান পড়েছে ব'লে বলরামের ঘুম ভাঙল না। ঘুম ভাঙল টাইগারের গর্জন শুনে, উঠে বসল সে। চোখ বগড়াতে বগড়াতে বলরাম জিজ্ঞাসা করল, "টাইগার চেঁচাচ্ছে কেন, মাসীমা?"

"চেঁচাবে না? জানোয়ারের পর্যন্ত কর্তব্যবোধ আছে, তোর নেই। কত বেলা হ'ল দেখ তো। ষষ্ঠীর সঙ্গে বাজারে যাবি নে? বাজার বইবার জন্যে মুটে ভাড়া করতে হবে নাকি রে?"

"মুটে কি আব আমার চেয়ে বেশী মোট বইতে পাববে মাসীমা? আমি যাচ্ছি।" এই ব'লে বলরাম উঠল। বার-দুই আড়মোড়া ভাঙল সে। তার পর ফস ক'রে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা মাসীমা, তুমি কি আমার কান মলেছিলে?"

"কখন?"

"আমি যখন ঘুমোচ্ছিলাম ?"

"না রে, আদর করছিলাম।"

"ঠিক তো ?" ঘাড়টা বাঁকা ক'রে দাঁড়িয়ে রইল বলরাম।

একটু হেসে মাসীমা বললেন, "ঘুমের মধ্যেও দেখছি বাঙালের গোঁ যায় না।" .

এর পর বলরাম আর অপেক্ষা করল না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল নীচে। টাইগারও ছুটল ওর পিছু পিছু।

ফেরবার মুখে দোতলায় নেমে মাসীমা দেখলেন, সুতপার ঘরে তখনও আলো জ্বলছে, দরজাটা খোলা। লাহিড়ী সাহেব কাল রাত্রে চ'লে যাওয়ার পরে সুতপা দরজা বন্ধ করে নি, করবার দরকার হয় নি। রতনের ঘর থেকে উঠে এসে সে বসেছিল টেবিলের সামনে। ঘুম আসে নি আর। মাথার ঠিক সামনে দেওয়ালের গায়ে এক শ' পাওয়ারেব একটা আলো জ্বলছিল। হাত বাড়ালেই সুইচটার নাগাল পেত সে, কিন্তু আলোটা নিবিয়ে দেওয়ার কথা ওর মনেই পড়ে নি। একটুখানি ভুলের জন্যে 'বিলে'র অঙ্ক বড় হ'ল। সকাল থেকেই মাসীমা আজ দেখতে পাচ্ছেন, হোটেলের কোথাও যেন কেউ হিসেব মেনে চলতে চাইছে না।

"এমন বেহিসেবী হ'লে হোটেলটা চলবে কি ক'রে তপা ?" বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন মাসীমা। সুতপার মুখের দিকে চেয়ে তিনি সহসা থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। উবু হ'য়ে টেবিলের ওপর দৃষ্টি ফেললেন তিনি। এক শ' পাওয়ারের বৈদ্যুতিক আলোয় মাসীমা দেখতে পেলেন যে, টেবিলের কাঠ ভিজে ভিজে নরম হ'য়ে গেছে। এত নরম হয়েছে যে, সকালের দিকের চোখের জল আর সে শুষে নিতে পারে নি। টেবিলের কিনারা দিয়ে জলের একটা সরু স্রোত গড়িয়ে পড়ছে মেঝের ওপর। মাসীমা সুতপার ঘাড়ের ওপর হাত রাখলেন।

কথা কিছু হ'ল না। দুটো মনের আদান-প্রদানের পথ বাইরে থেকে দেখাও গেল না। সুতপা হাত বাড়িয়ে সুইচটা শুধু তুলে দিল ওপর দিকে। তারপর চেয়ারের ওপর থেকে তোয়ালেটা টেনে নিয়ে সে ঢুকে পড়ল স্নানঘরে। মাসীমা কোনকিছুই জানতে চাইলেন না। বেরিয়ে আসবার আগে তিনি তাঁর শীর্ণ হাতের পাঞ্জাটা ফেলে রাখলেন টেবিলের ওপর। জল প'ড়ে প'ড়ে যে জায়গাটুকু ভিজে চুপসে গিয়েছিল তার সঙ্গে মাসীমার যোগাযোগ ঘটল। জলের স্রোত আর নেই, শুকিয়ে উঠেছে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন মাসীমা, বাবান্দায় বেরিয়ে এলেন তিনি। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে ভাবলেন, সুতপা বোধ হয় লালুকে আজও ভুলতে পারে নি। ওর চোখের জলের স্রোতে লালু নিশ্চয়ই এখনও ভেসে বেড়াচ্ছে। শীর্ণ আঙুলগুলো আর তাঁর কোন কাজেই লাগবে না। লালুকে ডাঙায় টেনে তোলবার মত শক্তি তাঁর নেই।

ইনজেকশন কিনে ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে সুতপা যখন হোটেলে ফিরে এল তখন সাড়ে দশটা বেজে গেছে। আপিসে পৌঁছবার নিয়ম দশটায়। ছোটসাহেব ক্ষমা করলেও বড়বাবু হয়তো ক্ষমা করবেন না। আজ ক'দিন থেকেই সুতপার লেট হচ্ছে। ডাক্তারকে বিদায় ক'রে গড়িয়ার মোড়ে এসে যখন সে পাঁচ নম্বরে উঠে বসল তখন পৌনে বারোটা। এমন অসময়ে আপিসে গিয়ে লাভ হবে না কিছু। এক দিনের জন্যে ছুটি নেওয়াই ভাল। ছুটি নিলে তো বড়বাবু খুশী হন। আপিসের কাজ না চললে নতুন স্টেনো নিয়োগ করবার জন্যে তিনি বড়সাহেবের কাছে প্রস্তাব পেশ করতে পারেন। সুতপা বাস থেকে নেমে পড়ল গড়িয়াহাটের মোড়ে। রাসবিহারী এভিন্যু পার হ'য়ে এসে আট নম্বর বাসস্টপের সামনে অপেক্ষা করতে লাগল। আট নম্বর ধ'রে দেওদার স্ট্রীটে যাওয়াই সে স্থির করেছে।

ছোটসাহেবের বাড়ীর নম্বরটা ওর জানা ছিল। মিসেস লাহিড়ীর

সঙ্গে দু'একবার ওর দেখাও হয়েছে। হেণ্ডারসন সাহেবের বিদায়-সভায় তিনি এসেছিলেন। লাহিড়ী সাহেব পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন সবিতা দেবীর সঙ্গে। সুতপার মনে আছে ওকে দেখে তিনি মনে মনে খুশী হয়েছিলেন খুব। স্বামীকে তাঁর সুতপার মত স্টেনোগ্রাফার কোনদিনই বিচলিত করতে পারবে না ভেবে নিশ্চিন্ত বোধ করেছিলেন তিনি।

দেওদার স্ট্রীটে পৌঁছে ওর মনে হ'ল, সেদিনকার অপমানের খোঁচা আজও সে ভুলতে পারে নি। সবিতা দেবীর জানা উচিত যে, সুযোগ ও সুবিধে পেলে দেবতুল্য স্বামীদেরও মানুষ হওয়ার লোভ হয়, তপন লাহিড়ী দেবতা নন, মানুষ।

সবিতা দেবী শুয়ে ছিলেন, ঘুমোন নি। খবর পেয়ে তিনি নেমে এলেন একতলায়। অযাচিত অভ্যর্থনায় সুতপাকে অভিভূত ক'রে ফেললেন তিনি। ওর হাত ধ'রে সবিতা দেবী অনুরোধ করলেন, "চল ভাই ওপরে। শোবার ঘরে ব'সে গল্প করি। আজ ক'দিন থেকে ভাবছিলাম আমার একজন বন্ধু দরকার। জান, আমার একজনও কেউ বন্ধু নেই ? তুমি আমার বন্ধু হবে ভাই ?"

অপমানের কথা আর মনে রইল না সুতপার। সবিতা দেবীর সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে এল দোতলার ল্যাণ্ডিং পর্যন্ত। এখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ল্যাণ্ডিং-এর ঠিক পাশেই মস্ত বড় একটা অয়েল-পেন্টিং। সবিতা দেবী বললেন, "এটা আমার খোকার ছবি। খোকা—খোকা—"

সবিতা দেবী ছবিটা হাত দিয়ে চেপে ধরলেন। আরও বার দুই 'খোকা খোকা' ব'লে ডাকলেন তিনি। তার পর সুতপার দিকে চেয়ে ঘোষণা করলেন, "খোকা ম'রে গেছে ! জান খোকা কেন চ'লে গেল ? আমার পাপের জন্যে। ছ' মাসের শিশুকে আমি মেরে ফেললাম !"

সুতপা বলল, "চলুন, ভেতরে যাই। এসেছি যখন সব কথাই শুনব।"

"ছিঃ ছিঃ, পাপের কথা বলি কি ক'রে ?"

"আমি আপনার বন্ধু, আমাকে না বললে আর কাকে বলবেন ?"

এই ব'লে সুতপাই এবার সবিতা দেবীকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। যেন কোম্পানীর ভাড়া-নেওয়া বাড়ীটার ওপর সুতপারও অধিকার আছে। যেন বাড়ীটার প্রতি ইঞ্চি জায়গা ওর চেনা।

সামনেই বসবার ঘর। ঘরের মধ্যে ঢুকে সুতপার সত্যিই মনে হ'ল যে, এমন সাজানো-গোছানো বাড়ীটায় ওর একদিন থাকবার সৌভাগ্য হবে। কেমন ক'রে এবং কোন্ পথ দিয়ে যে সৌভাগ্য আসবে তা সে জানে না। বাড়ীতে পা দেবার পরেই ওর মনে হয়েছে, এটা পরের বাড়ী নয়।

সবিতা দেবী বললেন, "কোম্পানীর বাড়ী। আমাদের ভাই ভাড়া দিতে হয় না। আসবাবপত্র যা দেখছ সবই কোম্পানীর পয়সায় কেনা। উনি যদি এখান থেকে বদলি হ'য়ে বোম্বে চ'লে যান, তা হ'লে বোম্বের ছোটসাহেব আবার এখানে এসে উঠবেন। যাওয়ার আগে আমি সব গুছিয়ে-গাছিয়ে রেখে যাব। বোম্বে আপিসের ছোটসাহেবকে তুমি চেন ?"

"না।"

"ব্যাচিলার ভদ্রলোক, বাঙালী। বয়স তো কম হ'ল না, ওরই মত বয়স। বিয়ে করলেন না, মানে—"

বাধা দিয়ে সুতপা জিজ্ঞাসা করল, "লাহিড়ী সাহেব কি বোম্বে বদলি হচ্ছেন নাকি ?"

"না না, বদলির কোন কথাই হয় নি। আমি ভাবছি যদি কখনও বদলি হন—মানে, আমি নিজেই ভাই কলকাতায় থাকতে চাইছি না। কলকাতা অসহ্য হ'য়ে উঠেছে, আমার পাপের জন্যে খোকা এখানে ম'রে গেল।"

নতুন জটিলতার সন্ধান পেল সুতপা। কেমন ক'রে যেন সেই পুরনো ভয়টা, বেঁচে থাকবার ভয়টা, ওর পিছু পিছু দেওদার স্ট্রীট

পর্যন্ত এসে উপস্থিত হয়েছে। জীবনের নতুন ডালেও মানুষকে অসহায়তার কুটো দিয়ে ঘর বাঁধতে হয়। চুন, সুরকি, সিমেণ্ট, বালির মধ্যেও মৃত্যুর নিশ্চয়তা সগৌরবে বিদ্যমান। সুতপা শক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে লাগল।

সবিতা দেবী. বললেন, "চল, আমাদের শোবার ঘরে গিয়ে বসবে।"

"হ্যাঁ, তাই চলুন।"

ছোটসাহেবের শয়ন-কক্ষে এসে ঢুকে পড়ল সুতপা। ঘরের মাঝখানটায় একটা ডবল খাট পাতা রয়েছে। খাটের ঠিক পাশেই লম্বা ধাঁজের ঝালর-দেওয়া টেবিল ল্যাম্প। তার নীচে গোলাকৃতি একটা টেবিল। টেবিলের ওপরে তিন-চারখানা বাংলা নভেল। ঘরখানা যদি সুতপার হ'ত? ডিনার খাওয়া শেষ ক'রে খাটের কিনারায় হেলে ব'সে উপন্যাসের পাতা ওলটাত সুতপা।

খাটখানার দিকে সুতপাকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকতে দেখে মিসেস লাহিড়ী বললেন, "বাজারে যা ডবলখাট ব'লে বিক্রি হয় এটা তার চেয়েও বড়। আমরা বদলি হ'য়ে গেলে সীতাংশু এটা ব্যবহার করবে। সীতাংশু একলা মানুষ, এত বড় খাট দেখে সে আবার ভয় না পায়।"

"সীতাংশু? তিনি কে?" জিজ্ঞাসা করল সুতপা।

খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে ব'সে মিসেস লাহিড়ী জবাব দিলেন, "বোম্বে আপিসের ছোটসাহেব।"

"তাঁকে আপনি চিনলেন কি ক'রে?"

"ওমা, কেন চিনব না? আমার স্বামী আর সীতাংশু একই সঙ্গে অফিসার হ'য়ে এই আপিসে কাজ নিয়েছিল। সে প্রায় দশ-বারো বছর আগেকার কথা। আমার তখন সবেমাত্র বিয়ে হয়েছে। প্রায় প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাবেলা সীতাংশু আসত, গল্প করত—সীতাংশুর মত বলিষ্ঠ পুরুষ লাখের মধ্যে একজনও পাওয়া যায় না।"

"কিন্তু আপনার তো তখন বিয়ে হ'য়ে গিয়েছিল ?"

"হ্যাঁ ভাই, সবেমাত্র বিয়ে হয়েছে। তবুও কেন যেন মনে হ'ত, বলিষ্ঠতার স্বাদ আমি পাই নি। সুতপা, তুমি আজ আপিসে যাও নি ?"

"না।"

"কেন ?"

"বিশ্রাম করবার জন্যে ছুটি নিয়েছি। ছোট ভাইটার অসুখ যাচ্ছে।"

"আমার কাছে এলে কেন ?"

"অনেক দিন থেকেই ভাবছিলাম, আপনার সঙ্গে এসে আলাপ করব। ছোটসাহেবের কাছে প্রায়ই শুনতাম, আপনার নাকি অসুখ হয়েছে—"

"অসুখ ?" মিসেস লাহিড়ী যেন আকাশ থেকে পড়লেন, "আমার অসুখের কথা তিনি তোমায় বলতে যাবেন কেন ? তুমি তাঁর স্টেনো, তোমার সঙ্গে তাঁর এত বেশী ঘনিষ্ঠতা কবে থেকে হ'ল ?"

"আপনার অসুখ হওয়ার পর থেকে।"

"যাক, আমি বাঁচলাম। আমিও ভাই চেয়েছিলাম, লাহিড়ী সাহেব একটু পাপ করুক। লুকিয়ে লুকিয়ে অন্য কাউকে ভালবাসুক সে। সীতাংশুকে ভালবাসতাম ব'লে আর সে আমায় কথা শোনাতে পারবে না। দু'জনেই আমরা সমান পাপী। তুমি একটু বস ভাই, টেলিফোন ক'রে আসি।"

"হঠাৎ কাকে টেলিফোন করতে চললেন ?"

"ছোটসাহেবকে।" এই ব'লে উঠে পড়লেন সবিতা দেবী।

ভয়ে সুতপা এবার আড়ষ্ট হ'য়ে গেল। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চ'লে যাচ্ছে ওর। নতুন সঙ্কটের সম্মুখীন হ'তে আর বোধ হয় দু'মিনিটও লাগবে না। পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনবার পথ খুঁজতে লাগল সুতপা রায়। সে বলল, "ছোটসাহেব এখন আপিসে

নেই। শ্যামনগরের নতুন্ কারখানাটা পরিদর্শন করতে গেছেন তিনি। আপনি কি শোনেন নি, সেখানে আমাদের একটা নতুন কারখানা খোলা হ'ল? দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বেলুনটাকে আকাশে উড়িয়ে রাখবার জন্যে আমবা গুটিপাঁচেক নতুন কাবখানা খুলছি।"

"সেখানে কি তৈবী হবে?"

"অক্সিজেন—মানে, এখন আব ছোটসাহেবকে টেলিফোন ক'বে লাভ নেই। আপনি তো বুঝতেই পাবছেন, সংসাবে যদি সতীব সংখ্যা ক'মে গিয়ে থাকে, তা হ'লে সৎ-এব সংখ্যা বাড়তে পাবে না। আসলে সৎ এবং সতী এই কথা দুটো আপেক্ষিক। মিসেস লাহিড়ী, আপনি যে সীতাংশুকে ভালবাসেন সেকথা কি লাহিড়ী সাহেব জানেন না?"

"না। সন্দেহ কবেন। কিন্তু আমি তো সীতাংশুকে আব ভালবাসি না—"

"কবে থেকে?"

"যেদিন খোকা আমাব মাবা গেল। পাপ কবেছি ব'লেই তো সে মরল। এই খাটে শুয়েই সে চোখ বুজল।"

"এই খাটখানা ববং বেচে ফেলবাব বন্দোবস্ত করুন। কোম্পানীব টাকাব অভাব নেই, ওরাই আবাব নতুন খাট কিনে দেবে। আমি আজ উঠি।" সুতপা উঠে পড়ল।

"আবাব কবে আসবে? আমি একজন সত্যিকাবেব বন্ধু চেয়েছিলাম।"

"আমি আবাব আসব। বণিক-আপিসে ছুটিছাটাব সুযোগ বড় কম।" একটু থেমে সুতপাই আবাব বলল, "ব্যাপাব যা দাঁড়িয়েছে, হয়তো কিছুদিনের মধ্যে চাকরিটা চ'লে যাবে আমাব। তখন আমি লম্বা ছুটি পাব। আপনাব গল্প শোনবার জন্যে ছুটে আসব—"

"বাসেব ভাড়া লাগবে না?"

"লাগবে। ফুরিয়ে গেলে আপনাব কাছ থেকে চেয়ে নেব।

আপনার হাতে তো দু'জন ছোটসাহেব রয়েছেন—তাঁদের দু'জনের মাসিক আয় চার হাজার টাকা। গড়িয়া থেকে দেওদার স্ট্রীটে পৌঁছতে আমার আজ চৌদ্দ পয়সা লেগেছে। মিসেস লাহিড়ী, ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ লোক ভাত কিংবা রুটি খাওয়ার জন্যে দৈনিক চৌদ্দটা পয়সাও যোগাড় ক'রে উঠতে পারে না। গড়িয়ায় ফিরে যেতেও আমার চৌদ্দ পয়সা লাগবে। তা লাগুক, আপনার গল্প শোনবার জন্যে সাত আনা ক'রে আমি খরচ করব। আর চাকরিটা যদি যায়—"

"চাকরি যাবে কেন? কি অপবাধে চাকরি যাবে?"

"চাকরি থাকাটাই তো অপরাধ—" সুতপা বেরিয়ে এল ছোট-সাহেবের শয়ন-কক্ষ থেকে, "আমি এখানে এসেছিলাম লাহিড়ী সাহেব শুনলে কি মনে করবেন জানি না।"

"তুমি তো ভাই বন্ধুর কাজই ক'বে গেলে। আচ্ছা তোমার চাকরি যদি না থাকে, তা হ'লে তোমার সঙ্গে তাঁর দেখা হবে কোথায়?"

"সীতাংশুর সঙ্গে আপনাব দেখা হ'ত কোথায়?"

"আমাদের পণ্ডিতিয়া বোডের পুরনো বাড়িতে। তোমার মত আমার তো স্বাধীনতা ছিল না, তুমি স্টেনো—"

"তা ঠিক, আমি স্টেনো, আমার স্বাধীনতা আছে। আমি যেখানে-সেখানে যেতে পারি, কিন্তু সকলের সে স্বাধীনতা নেই। নমস্কার মিসেস লাহিড়ী। আমি আপনাদের দেওদার স্ট্রীটের নতুন বাড়ীতে আবার আসব।" সুতপা তরতর ক'রে নেমে এল একতলায়। সামনেই বাইরে বেরোবার দরজা। পেছন দিকে দৃষ্টি দেবার দরকার বোধ করল না সে। সবিতা দেবী দাঁড়িয়ে রইলেন সিঁড়ির ওপরে। নিচে নামবার সময় পেলেন না তিনি। সুতপা মুহূর্তের মধ্যেই বেরিয়ে গেল বাইরে।

গলির মুখে মাস্টার বিয়ুইকটা থেমে গেল। গাড়ি চালাচ্ছিল

আপিসের ড্রাইভার রঘুনন্দন সিং। লাহিড়ী সাহেব বসেছিলেন পেছনের সীটে। সুতপা শুনল, তিনিই ড্রাইভারকে গাড়িটা থামাতে বললেন। সুতপা পাশ কাটিয়ে বড় রাস্তায় এসে নম্বর-দেওয়া বাস ধরবার জন্যে ছুটছিল বটে, কিন্তু ওকেও থামতে হ'ল। ছোটসাহেব গাড়ি থেকে মুখ বার ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, "এদিকে কি মনে ক'রে, মিসেস রায়?"

রঘুনন্দন সিং ঘাড় ফিরিয়ে সুতপাকে দেখল।

সুতপা বলল, "বেড়াতে এসেছিলাম। আপনি আজ এত তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরলেন কেন?"

"কাল রাত্রিতে একেবারে ঘুম আসে নি। মানে বাকি রাতটুকু এক রকম জেগেই কাটালাম।" সুর নীচু ক'রে তিনিই আবার বললেন, "আপিসে ব'সে ঘুমোনো কি ভাল? বাড়ী ফিরলাম ঘুমোবার জন্যে। সবিতার সঙ্গে আলাপ হ'ল?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"আপিসে যাও নি কেন?"

"ছুটি নিয়েছি—"

"ক'দিনের?"

"সাত দিনের।"

"কই, আমি তো কোন ছুটির দরখাস্ত পাই নি?"

"দরখাস্ত করব কাল সকালে—চলি সার।"

"দাঁড়াও। চল না, ডায়মণ্ডহারবার থেকে ঘুরে আসি?"

"এই সময়ে? মানে ফিরতে কত রাত হবে!"

"সেখানে তো ডাকবাংলো আছে—"

"ডবল খাটের ব্যবস্থা সেখানে নেই।" শাড়ির আঁচলটা বুকের ওপর ভাল ক'রে টেনে দিয়ে সুতপা স'রে এল ওখান থেকে।

লাহিড়ী সাহেব বললেন, "তোমার বদলির ব্যবস্থাটা এই সপ্তাহের মধ্যেই পাকা করব।"

গড়িয়ায় ফিরে আসতে সন্ধেই হ'য়ে গেল। হোটেলের বাসিন্দারা কেউ তখনও ফেরে নি। দোতলায় ওঠবার সময় সুতপা লক্ষ্য করল, মাসীমা মাদুর বিছিয়ে একতলার বারান্দায় ব'সে আছেন। এমন জায়গায় ব'সে আছেন যেখান থেকে সবারই আসা-যাওয়ার পথটা দেখা যায়। সুতপার পায়ের শব্দ পেয়েই তিনি বললেন, "বড্ড গরম পড়েছে। ভাবছি আজ রাত্রে এখানেই শুয়ে থাকব। এই বয়সে কাউকে তো আর ভয় করবার কিছু নেই। হ্যাঁরে তপা, শুনলাম ছোটসাহেব নাকি বোম্বে গিয়েছিলেন?"

"তুমি শুনলে কার কাছে? মহীতোষবাবু বললেন বুঝি?"

"চণ্ডীর কাছে শুনলাম। কাল সকালে সে ছোটসাহেবের কাছে যাচ্ছে। আমি তো যেতে ওকে বারণ করলাম।"

"কেন?"

"বিচার-ফল শুভ নয়। বউয়ের মন পাওয়ার জন্যে তাঁকে নাকি আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। চণ্ডীর গণনায় কখনও ভুল থাকে না।"

সুতপা মাসীমার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনছিল না। সে ভাবছিল, গত রাত্রের ব্যাপারটা কি তিনি জানতে পেরেছেন? ছোট-সাহেবকে হয়তো বা কেউ দেখে থাকবে। রাত একটা বেজে গিয়েছিল বটে, কিন্তু ষষ্ঠীদা তো জেগে ছিল। ছাদের ওপর থেকে বলরামও দেখে থাকতে পাবে। হয়তো বা রতনের কাছ থেকেই তিনি শুনেছেন। সিঁড়ির পাশে শুয়ে মাসীমা বোধ হয় আজ রাত্রে পাহারা দেবার মতলব করেছেন। কথাটা ভাবতে গিয়ে সুতপার আত্মসম্মানে আঘাত লাগল খুব, সে উঠে এল দোতলায়। ছোটসাহেব যদি আজ রাত্রেও এখানে আসতে সাহস করেন!

বিছানায় শুয়ে পড়ল সুতপা। ভয় করছিল ওর। জীবনটাকে খানিকটা গুছিয়ে এনেছিল সে। ভেবেছিল, সব চেয়ে বড় সঙ্কটটা উত্তীর্ণ হ'য়ে এসেছে। বাঁচবার স্বাধীনতা আয়ত্তে আসবার পরে

পৃথিবীর কোনদিকেই দৃষ্টি ফেলবার দরকার হয় নি। মাসীমাকে মাসের টাকা চুকিয়ে দিলেই তুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ওর ঘুচল। কিন্তু গত ক'দিনের মধ্যেই সব আবার ওলটপালট হ'য়ে গেছে। স্বাধীনতা-লাভের স্বল্প ভূমিতেও ফাঁকির অঙ্কুর ফুটে বেরুচ্ছে। অস্তিত্বের পরমায়ু কত ক্ষীণ !

ভেবে আর লাভ নেই। ভাবনার ওপরেই বা ওর স্বাধীনতা কোথায়? ছোটসাহেব নাও আসতে পারেন। সুতপা কি সবিতা দেবীর কাছে স্বীকার ক'রে আসে নি যে, ওর সঙ্গে ছোটসাহেবের ঘনিষ্ঠতা জন্মেছে? বলতে বাধ্য হয়েছিল সুতপা। ছোটসাহেবের নৈশ-অভিযানের ইতিহাস সবিতা দেবীর জানা উচিত।

বার তুই বলরামকে পাঠিয়ে খবর নিলেন মাসীমা। না, আজ রাত্রিতে সুতপা আর নীচে নামতে পারবে না। শরীরটা ভাল নেই ব'লে খাওয়ার ইচ্ছেও নেই, খেলও না সে, ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল মধ্যরাত্রিতে। সরকার-কুঠির সর্বত্র নিরেট নির্জনতা। উঠে বসল সুতপা। আলোটা জ্বালিয়ে রেখেই সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, ঘরের দরজাও খোলা। এমন ভুল তো ওর কখনই হয় না। তবে কি সে ইচ্ছে ক'রেই দরজায় খিল লাগায় নি? অচেতন মনের দরজায় খিল লাগানো সহজ নয়। সুতপা বোধ হয় চেয়েছিল, ছোটসাহেব আসুক। আসবে মনে ক'রে সে আলো নেবায় নি, আপিসের শাড়ি প'রে সতর্কভাবে শুয়ে পড়েছিল বিছানায়।

বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এল সুতপা। এখান থেকে বাগানের বড় ফটকটা দেখা যায়। মধ্যরাত্রির অন্ধকারে এখন অবশ্য ফটকটা দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু মাস্টার বিয়ুইকটা এলে নিশ্চয়ই দেখা যাবে। আসবেই মনে ক'রে সুতপা পায়চারি করতে লাগল লম্বা বারান্দাটার এ কোণ থেকে সে কোণ পর্যন্ত।

উল্টো দিকের কোণায় মাসীমা শুয়েছিলেন। মাতুরের ওপর পা

পড়তেই চমকে উঠল স্তুতপা। জিজ্ঞাসা করল সে, "মাসীমা, তুমি দোতলার বারান্দায় উঠে এলে কখন?"

"গরমে টিকতে পারলুম না রে—বলরামের সঙ্গে ছাদে যাচ্ছিলাম শুতে। তোর ঘরের দরজা খোলা দেখে ভাবলাম, এখানেই শুয়ে পড়ি। এই বয়সে শোবার জন্যে তো সমারোহ কিছু করতে হয় না। হ্যাঁ রে তপা, আজকাল আলো জ্বালিয়ে শুতে যাস কেন?"

"নেবাতে ভুলে গিয়েছিলুম।"

"অনর্থক পয়সা নষ্ট হচ্ছে যে—"

"বেশী পয়সা যা লাগবে আমি দিয়ে দেব। মাসীমা, তুমি এখনও জেগে রয়েছ কেন?"

"এই বয়সে শুলেই কি ঘুম আসে রে?" মাসীমা হাই তুললেন, "যা, আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়গে যা।"

"যাচ্ছি।" স্তুতপা তবু গেল না, রেলিঙের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। চেয়ে রইল অন্ধকার ফটকের দিকে। একটু বাদেই চমকে উঠল স্তুতপা। টাইগারের গলার আওয়াজ এল ফটকের দিক থেকে। স্তুতপা জিজ্ঞাসা করল, "মাসীমা, টাইগারকে আজ বেঁধে রাখ নি? এটা তো গৃহস্থবাড়ী নয়, হোটেল। যখন-তখন লোক আসতে পারে।"

"বলরাম বোধ হয় ভুল করেছে। টাইগারের তো দোতলার ছাদে থাকবার কথা। কেন, টাইগারকে বাগানে দেখলি নাকি?"

"ফটকের দিক থেকে আওয়াজ শুনতে পেলুম। মনে হ'ল টাইগারের গলা।"

"বড্ড তেজ বেড়েছে কুকুরটার।" এই ব'লে দ্বিতীয় বার হাই তুললেন মাসীমা।

"বাড়বে না? বলবাম ওকে দিনরাত মাছভাত খাওয়াচ্ছে। কে জানে, হয়তো দুধের কড়াই থেকেও দুধ চুরি করছে বলরাম। মাসীমা, কাল্ থেকে রতনের দুধটা না হয় আমার ঘরেই রেখে দিও।

বলা যায় না, বলরাম হয়তো কড়াইয়ে জল ঢেলে রাখে। ওরা রিফিউজী, ওরা সব করতে পারে। রতন আর টাইগারের মধ্যে যে তফাৎ আছে তা বোধ হয় বলরাম বুঝতে পারে না।"

"একথা কেন বলছিস রে তপা ?"

"রতন শুয়ে থাকে, ·· আর টাইগার ওর পিছু পিছু ছুটতে পারে ব'লে বলরাম রতনের চেয়ে কুকুরটাকে ভালবাসে বেশী।"

ভেবে চিন্তে মাসীমা বললেন, "বলরাম ওর নিজের ভাত থেকে ভাগ দেয় টাইগারকে। এখন শুতে যা তপা, রাত জেগে ভাল স্বাস্থ্যটাকে নষ্ট করিস নে, পরে আর কোন কাজেই লাগবে না।"

সুতপা চ'লে এল ওখান থেকে। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনার সময় এটা নয়। এক সের চালের ভাত খেয়ে হজম করতে পারলেই ভাল স্বাস্থ্য প্রমাণ হয় না। স্বাস্থ্য হচ্ছে ভেতরের সত্য—তার কোন বাহ্যরূপ নেই। সুতপার বিশ্বাস, বলরামের চেয়ে রতন বেশী সুস্থ। রতন চিন্তা করতে পারে, ন্যায়-অন্যায় বিচার করতে পারে। বলরামের চিন্তাশক্তি নেই, ওর তাই শরীর আছে, স্বাস্থ্য নেই। ঘরের দরজা বন্ধ করল সুতপা।

বন্ধ করতে গিয়ে ওর যেন মনে হ'ল, সিঁড়ি দিয়ে বলরাম উঠে এল দোতলায়। তবে কি টাইগারকে নিয়ে বলরাম ফটকের কাছে ব'সে ছিল ছোটসাহেবের আগমন-প্রতীক্ষায় ?

পরের দিন বড়বাবু বেলা এগারোটা নাগাদ মহীতোষকে ডেকে পাঠালেন। ক'দিন থেকেই মহীতোষ বুঝতে পারছিল, বড়বাবু কি একটা নতুন উদ্দেশ্য নিয়ে ছোটসাহেবের কামরায় ঘন ঘন যাওয়া-আসা করছেন। ব্যাপারটা এবার পরিষ্কার হ'ল। বড়বাবু বললেন, "এই যে আসুন মহীতোষবাবু। তার পর কেমন আছেন ? আজকাল তো আর বুড়ো মানুষটাকে চোখেই দেখতে পান না। শুনলাম, আপনি নাকি কর্মচারী ইউনিয়নের সেক্রেটারী হয়েছেন ?"

"ডেকেছেন কেন?" প্রশ্ন ক'রে মহীতোষ চেয়ারটা টেনে নিয়ে ব'সে পড়ল। সে জানে, সাহেবসুবো ছাড়া অন্য কাউকে তিনি বসতে বলেন না। বালিগঞ্জের সেই সুন্দরী মেয়েটি এলে তিনি অবশ্য নিজের চেয়ারটা ছেড়ে দেবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে ওঠেন। কাল সেই সুন্দরী মেয়েটি এসেছিল বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে।

বড়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "ইউনিয়নের মেম্বার কত হ'ল?"

"প্রায় সবাই।"

"প্রায় কেন? মিসেস রায় বুঝি যোগ দেন নি? তাঁর সঙ্গে কি আজকাল আপনার দেখা হয় না? আমাদের ড্রাইভার রঘুনন্দন সিং একটু আগেই আমায় বলছিল যে, মিসেস রায় নাকি ছোটসাহেবের বাড়ী পর্যন্ত দৌড়চ্ছেন আজকাল। ব্যাপার কিছু জানেন আপনি?"

"আমায় ডেকেছেন কেন বড়বাবু?"

"এত তাড়া কেন মহীতোষবাবু? জানেন, মিসেস রায় সাত দিনের ছুটি নিয়েছেন? দরখাস্তটা এখনও এসে পৌঁছয় নি, তবে আসবে। ছুটি অবশ্য উনি পনের দিনেরও নিতে পারেন, অনেক ছুটি তাঁর পাওনা আছে। কিন্তু আপিসেরও কাজ চলা চাই তো—হু হু—" ডিবে থেকে তিনটে পান নিয়ে তিনি মুখে পুরে দিয়ে বললেন, "সুন্দরমকে আপাতত শ্যামনগরের কারখানায় পাঠানো হ'ল—সাত দিনের জন্যে। মিসেস রায় কাজে যোগ দিলে তাঁকে যেতে হবে শ্যামনগরে। উপস্থিত ছোটসাহেবের কাজ চলবে কি ক'রে?"

"এ সব কথা শুনে আমি কি করব?" উঠে পড়ল মহীতোষ।

বড়বাবু ব'লে ফেললেন, "ছোটসাহেব এইমাত্র আবেদনপত্রে সই বসিয়ে দিলেন। এখন অবশ্য অস্থায়ীভাবে তাকে নেওয়া হ'ল—হ্যাঁ, বরাতে থাকলে স্থায়ী হ'তে আর কতদিন লাগবে বলুন। মেয়েটিকে কাল ছোটসাহেব দেখলেন—হেড আপিসের যোগ্য চেহারা বটে! শুধু আঙুলের ক্ষিপ্রতা থাকলেই স্টেনো আর টাইপিস্ট হওয়া যায় না—যাচ্ছেন মহীতোষবাবু? মিস মিত্র মানে কেতকী মিত্র

আজ আসবে নিয়োগপত্র নিতে। ওর ডাকনাম হচ্ছে গিয়ে কাতু। কি কাটলেটই না সেদিন খাওয়ালে মশাই।”

শেষের কথাগুলো মহীতোষ শোনে নি, শোনবার ইচ্ছে ছিল না ওর। মহীতোষ বুঝতে পেরেছিল, সুতপাকে ঘিরে নূতন একটা জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। ছোটসাহেবের সঙ্গে অফিসিয়াল সম্পর্ক ছাড়াও তার অন্য সম্পর্ক রয়েছে। যদি সত্যিই তাই হ’য়ে থাকে, তা হ’লে ইউনিয়নের তরফ থেকে সুতপাকে কোন সাহায্যই করা চলবে না। কিন্তু সাহায্যের কথাই বা মহীতোষ ভাবছে কেন? সুতপাকে সে কি আজও চিনতে পারে নি? সুতপা মহীতোষের কাছে কোনদিনই সাহায্য চাইবে না, জ্ঞান থাকতে তো নয়ই। নিজের চেয়ারে এসে ব’সে পড়বার পর মহীতোষের ইচ্ছে হ’ল, খুবই ইচ্ছে হ’ল যে, সুতপা যেন ওর কাছে সাহায্য চাইতে ছুটে আসে। সাহায্য করবার জন্যেই মহীতোষ ইউনিয়নের সেক্রেটারী হয়েছে। দুর্বলের পাশে গিয়ে দাঁড়াবার জন্যে মহীতোষ সহসা চঞ্চল হ’য়ে উঠল, উঠে পড়ল চেয়ার থেকে। সামনের দরজা দিয়ে সুতপা ঢুকে পড়েছে হল-ঘরটায়।

বড়বাবুর সামনে দিয়েই মহীতোষের টেবিলে এসে পৌঁছোবার রাস্তা। সুতপাকে দেখতে পেয়ে বড়বাবু বললেন, “এই যে আসুন। দরখাস্তটা নিজেই বুঝি দিতে এলেন?”

জবাব দিল না সুতপা। সে সোজা চ’লে এল মহীতোষের কাছে। এসে বলল, “সাত দিনের ছুটি নিচ্ছি। শরীরটা ভাল নেই, দরখাস্তটা বড়বাবুর টেবিলে পৌঁছে দিতে পার?”

“তুমি নিজেই দাও, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।”

“সঙ্গে যাচ্ছ? কতদূর পর্যন্ত যেতে পার?” সুতপা ব’সে পড়ল চেয়ারে। চেয়ারটা মহীতোষেরই বসবার চেয়ার। একটু হেসে মহীতোষ বলল, “তুমি সত্যিই অসুস্থ। টেলিফোনে আমায় খবর পাঠালেই পারতে। চল, আপিসের বাইরে কোথাও গিয়ে বসি।”

"চল।" উঠে পড়ল সুতপা। কিন্তু তার আগেই লাহিড়ী সাহেব তাঁর কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন, এলেন একেবারে বড়বাবুর টেবিল পর্যন্ত। সুতপাকে দেখলেন তিনি, কথা বললেন না। বড়বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মিস মিত্রকে খবর দেওয়া হয়েছে ?"

"তিনি এখুনি এসে পড়বেন।" দেয়াল-ঘড়ির দিকে চকিতের মধ্যে একবার দৃষ্টি ফেলে বড়বাবুই বললেন, "এখন সোয়া বারোটা, আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তিনি আসবেন।"

"এলেই আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।"

"আজ্ঞে—ইয়েস সার।"

ছোটসাহেব ঘুরে দাঁড়ালেন। হল-ঘরটার চতুর্দিকে দৃষ্টি ফেললেন তিনি—কেরানীরা সবাই কাজ নিয়ে ব্যস্ত। হাসি পেল লাহিড়ী সাহেবের। তিনি ভাবলেন, এরা কত দুর্বল, কত অসহায়! একটা সামান্য কলমের খোঁচায় তিনি এদের জীবনে ঘনঘটার সৃষ্টি করতে পারেন। সুতপাও এদেরই একজন। লাহিড়ী সাহেবের দৃষ্টি সহসা এসে থেমে গেল মহীতোষের গা ঘেঁষে। সুতপা আর মহীতোষ একসঙ্গে হেঁটে এসে দাঁড়িয়েছিল বড়বাবুর টেবিলের সামনে। লাহিড়ী সাহেবের দৃষ্টি ওদের বিচলিত করতে পারল না। তিনি যেন প্রথম এই অনুভব করলেন সুতপা দুর্বল নয়। বিরাট এই কোম্পানীটার সম্মিলিত শক্তি যেন মহীতোষ নামে নগণ্য একজন কেরানী বহন করছে একা। সুতপা আলাদা নয়, মহীতোষেরই অংশ।

ছুটির দরখাস্তটা বড়বাবুর টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে সুতপা মহীতোষকে বলল, "তুমি তো আমার সঙ্গেই যাবে বললে ?"

"হ্যাঁ, চল।"

বড়বাবু মুখ তুলে চাইলেন মহীতোষের দিকে। মহীতোষ বলল, "আমার অবশ্য ছুটি কিছু পাওনা নেই। একদিনের মাইনে আমার কেটে নেবেন বড়বাবু।"

"কিন্তু—" চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন বড়বাবু, "কিন্তু সুয়েজ্র খালের জন্যে সেদিন কাজের কত ক্ষতি হ'ল—মহীতোষবাবু আপনারা যদি সহযোগিতা না করেন, তা হ'লে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিণতি কি হবে ?"

মুখ ফিরিয়ে মহীতোষ একটু হাসল, জবাব দিল না। সুতপাকে সঙ্গে নিয়ে সে চ'লে গেল লিফ্‌টের দিকে।

ছোটসাহেব দেখলেন, দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকছে মিস কেতকী মিত্র—দেখল সুতপাও।

তপন লাহিড়ী নূতন একটা সিগারেট ধরালেন।

মহীতোষের বিবৃতি

এক বিচিত্র জগতের আব্রু আমার চোখের সামনে ক্রমশই উন্মোচিত হচ্ছে। প্রতি মুহূর্তেই জ্ঞান বাড়ছে আমার। বণিক-আপিসে চাকরি ক'রেও এতকাল আমি ভেবেছি যে, আমি বেকার। মনোযোগ দিয়ে করবার মত কাজ আমার কিছু ছিল না। আপিসের কাজ আমার কোন দিনই ভাল লাগে নি। পয়লা তারিখে মাইনে পাওয়ার নির্দিষ্টতা আছে ব'লেই নিয়মিতভাবে নিজের চেয়ারে এসে ব'সে পড়ি। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফানুসটা চোখের সামনে ওড়ে বটে, কিন্তু তবুও কাজের প্রতি উৎসাহ আমার বাড়ে না। মনে হয় এখানে আমি উপস্থিত নেই। প্রতিটি ফাইলের মধ্যে লোভ আর মুনাফার অঙ্ক পুঞ্জীভূত হ'য়ে আছে। প্রতিটি ফাইল আমার শত্রু। শত্রু সমাজেরও। এরাই আমার টেবিলের ওপর প্রতিদিন এসে ভিড় ক'রে দাঁড়ায়। বিদ্বেষের কালি বুকে নিয়ে এরা আবার চ'লে যায় বিভিন্ন বিভাগে আপিস ছুটি হওয়ার আগে। বণিক-আপিসের ফাইল আমার ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয় প্রতিদিন। বিরাট এই হল-ঘরটার মধ্যে ভালবাসার বাণিজ্য নিয়ে কেউ কোনদিনও মাথা ঘামায় নি।

আমাদের আপিসে কেরানীর সংখ্যা বড় কম নয়। দশটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে যে যার চেয়ারে এসে ব'সে পড়ে। ব'সে পড়বার আগে দেয়াল-ঘড়িটার দিকে প্রত্যেকেই একবার দৃষ্টি ফেলে। যেন সময়মত আপিসে পৌঁছতে পারলেই সারা দিনের দায়িত্ব সব ঘুচে যায়। সত্যিই যায়। কারো সঙ্গে কারো যোগাযোগ নেই। দুটো টেবিলের মাঝখানে যেন বিরাট ব্যবধান! মনের আদান-প্রদানের পথও সেই ব্যবধানের মধ্যে বিলুপ্ত। প্রত্যেকটা চেয়ার যেন এক একটা ছোট ছোট দ্বীপ। জনবহুল আপিস-ঘরটার নির্জন-দারিদ্র্য আমায় পীড়া দেয়। এতগুলো মানুষের সামাজিক অস্তিত্ব আমার চোখে ধরা পড়ে না।

সুতপা আমায় কাল জিজ্ঞেস করেছিল, হঠাৎ কেন আমি একটা ইউনিয়নের সৃষ্টি করতে গেলাম। ইংরেজ বণিক-আপিসের মাইনের অঙ্ক ভারত-সরকারের যে-কোন আপিসের চেয়ে বেশী। ইউনিয়ন গঠনের মূলে যে সামাজিক সমস্যা রয়েছে, সুতপা তা জানত না। জানবার সুযোগ সে পায় নি। শুধু মাইনে বাড়াবার অস্ত্র হিসেবে ইউনিয়নের জন্ম হয় নি। ছোট ছোট দ্বীপগুলোর মাঝখানে যে ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে সেই ব্যবধানের কৃত্রিমতা ভেঙে দেওয়া দরকার। সামাজিক সচেতনতা ফিরিয়ে আনা ইউনিয়নেরই কাজ। আজ ক'দিন থেকে দেখছি, ছেলেরা সব ইউনিয়নের আপিসে এসে আড্ডা জমাচ্ছে। পাশাপাশি চেয়ারে ব'সে এরা কাজ করছিল বছর দু-তিন। কেউ কাউকে চিনত না। একের চিন্তাধারার সঙ্গে অপরের পরিচয়ও ছিল না। আজকে তো আমি নিজের কানেই শুনে এলাম, স্টেনোগ্রাফার সুন্দরম্ ডেস্‌প্যাচ বিভাগের অরিন্দমের সঙ্গে মন খুলে গোপন কথা আলোচনা করছে। সুন্দরম্ নাকি এরই মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে একটি বাঙালী মেয়েকে বিয়েও ক'রে ফেলেছে!

আজ আপিস ছুটি হওয়ার আগে ছোটসাহেব আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ খুব কম। আমার চাকরির পদমর্যাদা এত কম যে, ছোটসাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের কোন প্রয়োজনই হয় না।

তাঁর কামরায় প্রবেশ করতেই দেখি আপিসের নতুন স্টেনো মিস কেতকী মিত্র খাতা পেন্সিল হাতে নিয়ে ছোটসাহেবের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। তার দাঁড়াবার নিয়ম ছোটসাহেবের সামনে। মুখ দেখতে না পেলে নোট নিতে অসুবিধে হয়।

ঘরে ঢুকতেই ছোটসাহেব বললেন, "মিস মিত্র, তুমি একটু বাইরে যাও। আবার তোমায় ডেকে পাঠাব—" হাতঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে তিনিই আবার বললেন, "পাঁচটার পরে। আজ এক্সট্রা টাইম কাজ করতে হবে—বাড়ী ফিরতে তোমার রাত হবে।"

"তা হোক সার।" মিস মিত্র জবাব দিল নিচু স্বরে।

"হ্যাঁ—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চালু হয়েছে। প্রত্যেকেরই সহযোগিতা চাই—স্যাক্রিফাইস করতেই হবে। প্রধানমন্ত্রীর সোশ্যালিস্ট স্টেট—" এই পর্যন্ত ব'লে ছোটসাহেব আমার দিকে চেয়ে হঠাৎ হেসে ফেললেন। আমার গাম্ভীর্য তাতে নষ্ট হ'ল না। কেন হবে? আমাদের 'স্যাক্রিফাইস' তো হাসির ব্যাপার নয়!

ছোটসাহেব কি বুঝলেন জানি না, তিনি চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন। মিস মিত্রের দিকে চেয়ে বললেন, "অনেক কাজ জ'মে রয়েছে। এই জন্যে অবশ্য দায়ী মিসেস রায়। মানে স্টেনোগ্রাফার সুতপা রায়। মিস মিত্র, শুধু চাকরি করলে চলবে না, কাজ করতে হবে। ওয়ার্ক, ওয়ার্ক—" কিন্তু আমার দিকে চেয়ে ছোটসাহেব এবার মন্তব্য করলেন, "দল পাকাবার পর থেকে কেরানীরা আর কাজই করতে চাইছে না।"

"আমরা দল পাকাই নি, সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছি। আমায় ডেকেছিলেন কেন সার?" প্রশ্ন ক'রে হাতঘড়িতে সময় দেখলাম আমি।

ছোটসাহেব কিছু বলবার আগে মিস মিত্র বলল, "নোট নেওয়ার জন্য পরে আমায় ডেকে পাঠাবেন।"

মিস মিত্র কামরা থেকে বেরিয়ে গেল।

ছোটসাহেব এবার বললেন, "আপিসে দেখছি অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে। আগে তো কই এমন কখনও দেখি নি?"

"অরাজকতা কোথায় দেখলেন আপনি?"

"হোয়াট! অরাজকতা কোথায় দেখলাম? আপনার টেবিলে। ফাইলগুলো সব ক্লীয়ার করেছেন?"

"কাল থেকে দেখছি বড়বাবু আমার টেবিলে ডবল ক'রে ফাইল পাঠাচ্ছেন। একজন কেরানীর পক্ষে এত কাজ করা সম্ভব নয় সার।"

"কি ক'রে সম্ভব হবে? আজকাল তো আপনি বাইরের কাজ

নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন। তা ছাড়া—যাক, তর্ক আমি করতে চাই নে। আজকে ফাইলগুলো সব ক্লীয়ার ক'রে যাবেন।"

"আমায় তা হ'লে ওভারটাইম দিতে হবে।"

"দেব।"

বড়বাবু এসে কামরায় ঢুকলেন। মুখে তাঁর মুচকি হাসির আপাত সরলতার আভাস। আমার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "পাঁচটা বাজতে আর এক মিনিট বাকী। মিসেস রায় আপনার খোঁজ করছেন মহীতোষবাবু।"

"অসুখ ব'লে তিনি ছুটি নিয়েছেন। অথচ তিনি রোজই বিকেলের দিকে আপিসে আসছেন। ব্যাপার কি বড়বাবু?" জিজ্ঞাসা করলেন ছোটসাহেব।

বড়বাবু বললেন, "অনেক ছুটি তাঁর পাওনা আছে। অসুখ নেই ব'লে ছুটি চাইলেও তিনি পাবেন।" একটু থেমে বড়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "মিস মিত্র আপনার কাজ চালাতে পারছে তো সার?"

"মাত্র দুশো টাকা মাইনেতে এত ভাল স্টেনোগ্রাফার পাওয়া যায়, আগে আমি তা বিশ্বাস করতাম না। একে পারমেনেণ্ট ক'রে নিন।" ছোটসাহেবের সুরে আদেশের প্রাবল্য। কিন্তু আদেশ পালন করবার জন্যে বড়বাবু ব্যস্ততা দেখালেন না। তিনি বললেন, "মিসেস রায়ের বদলির ব্যবস্থাটা আজও পাকা হয় নি সার।"

"কেন হয় নি?"

"আপনি তো এখনও সই করেন নি—"

"এই সপ্তাহের মধ্যেই করব। আচ্ছা, আপনি এবার যেতে পারেন মহীতোষবাবু। ফাইলগুলো—"

"আজ আর ক্লীয়ার হবে না।"

"কেন?"

"মিসেস রায়ের সঙ্গে এখখুনি আমায় একবার বেরুতে হবে।"

এই ব'লে আমি কামরা থেকে বেরিয়ে এলাম। দেয়াল-ঘড়িটার দিকে দৃষ্টি পড়ল আমার। পাঁচটা বেজে তিন মিনিট। সুতপা সময়ের হিসেব ক'রেই আপিসে ঢুকেছে আজ।

বাইরে বেরিয়ে সুতপা বলল, "তোমাব তো চা খাওয়া হয় নি, চল কোথাও গিয়ে চা খেয়ে নিই। হোটেলে ফেরবার তাড়া নেই তো তোমার ?"

"না, তাড়া কিছু নেই। তবে ছ'টার সময় ইউনিয়নের আপিসে একবার যেতে হবে। ছোট্ট একটা সভা আছে। ভাবছি, তোমাকে আজ আমাদের আপিসটা দেখাব।"

আপত্তি করল না সুতপা। আমরা শেষ পর্যন্ত কফিহাউসে এলাম। চা খাওয়ার প্রস্তাব মাঝ পথেই পরিত্যাগ করতে হ'ল। কফিহাউসটা সামনেই প'ড়ে গেল। সুতপা বলল, "কফিহাউসের দুটো অংশ। পেছন দিকেব অংশটায় বসলে খানিকটা ভদ্র-পরিবেশ পাবে, কিন্তু দাম দিতে হবে বেশী। কি করবে ?"

বললাম, "যেখানে সস্তায় তৃষ্ণা মিটবে সেখানেই চল।"

"বড্ড বেশী ভিড় এখানে।"

"তা হোক, এসো, এখানেই ঢুকে পড়ি। আমি জানি ভিড় তুমি পছন্দ কর না।"

"না, একেবারে সহ্য করতে পারি না।"

"তাব কারণ, সরকার-কুঠির নির্জনতায় তুমি প্রতিপালিত। ভালবাসতে পারলে ভিড়েব মধ্যেই তুমি বাস করতে চাইবে।"

"মহীতোষ, অন্তরের গুহায় প্রতিটি মানুষই একা। ভালবাসার সম্পর্ক আমরা সৃষ্টি কববাব চেষ্টা করি বটে, কিন্তু সে তো আকাশে প্রাসাদ তৈরির চেয়ে বড় সৃষ্টি নয়। অবাস্তব ঐশ্বর্যের প্রতি আমার লোভ নেই। তবুও চল, ভিড়েব মধ্যে ব'সে আজ তোমার সঙ্গে কফি খাব।"

সুতপাকে নিয়ে কফিহাউসে ঢুকলাম আমি।

আলাদা টেবিলে বসবার মত জায়গা ছিল না। আশেপাশের আপিস সব ছুটি হ'য়ে গেছে। তাই ভিড় বেড়েছে খুব। হল-ঘরটার একপাশে দাঁড়িয়ে টেবিল খুঁজছিলাম আমি। সুতপা জিজ্ঞাসা করল, "দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

"জায়গা খুঁজছি।"

"জায়গা তো রয়েছে।" এই ব'লে সুতপা এগিয়ে গেল ঘরের মাঝখানটায়। দুটি মাদ্রাজী ছেলে এক টেবিলে ব'সে কফি খাচ্ছিল। দুটো চেয়ার খালি প'ড়ে ছিল সেখানে। অনুমতি নিয়ে সুতপা একটা চেয়ারে ব'সে প'ড়ে বলল, "এস মহীতোষ, এখানে জায়গা আছে।"

কফি খাওয়ার মাঝখানে মাদ্রাজী ছেলে দুটি উঠে পড়ল। তারপর সুতপা জিজ্ঞাসা করল, "ঠিক ছ'টার সময় তোমায় যেতেই হবে, না?"

"হ্যাঁ।"

"খুব জরুরি সভা বুঝি?"

"প্রত্যেকটা সভাই আমাদের জরুরি। হাল্কা বিষয় নিয়ে আমরা সভায় আলোচনা করি না। আমরা সবাই ইউনিয়নের অংশ— আপিসটা তার বাহ্যরূপ। তুমি তো আজও আমাদের ইউনিয়নে যোগ দিলে না।"

সুতপা একটু হাসল। আলুভাজার টুক্‌রো একটা দাঁতের মাঝখানে ধ'রে রেখে সে বলল, "ইউনিয়নের প্রতি যে ছোটসাহেবের সুনজর নেই, তা আমি জানি। তোমারও জানা উচিত।" কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে বললাম, "শুধু ছোটসাহেবের নজরের কথা ভাবলে চলবে কেন, আপিসে তো বড়সাহেবও একজন আছেন।"

"কে? হেওয়ার্ড সাহেব?"

"হ্যাঁ। তিনিই তো আমাদের সাহায্য করলেন—জান, আমাদের আপিসটা কোথায়?"

"না।"

"ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটে। কোম্পানীর একটা গুদামঘর ছিল সেখানে। বড়সাহেব সেই ঘবটাই আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন। ভাড়া আমাদের সামান্যই লাগবে। চল, এবার ওঠা যাক। দুটো বাজতে আব পনের মিনিট বাকি।"

"কিন্তু—" উঠে পড়ল সুতপা, "কিন্তু ছোটসাহেবের অনুমতি না নিয়ে আমি তোমাদের আপিসে যেতে পারি না।"

জিজ্ঞাসা করলাম আমি, "কেন?"

বিলেব টাকা মিটিয়ে দিল সুতপা। আপত্তি করলাম আমি। কিন্তু একটা পাঁচ টাকার নোট ওয়েটারের হাতে দিয়ে সুতপা আমায় বলল, "তোমার চেয়ে আমার মাইনে বেশী। তা ছাড়া এ মাসে দেখছি সব টাকা খরচও হয় নি।"

"বেশ। কিন্তু হঠাৎ যদি তোমার চাকরি যায়? মানে, শ্যামনগরে বদলি হ'লে কি কববে? সেখানে গিয়ে তো চাকরি করা সম্ভব হবে না।"

"সেই জন্যেই তো তোমাদেব ইউনিয়নে আমি যোগ দিতে চাই মহীতোষ।"

পাঁচ টাকা থেকে তিন টাকা চার আনা ফিরে এসেছে। প্লেটের ওপর চার আনা ফেলে রেখে তিনটে টাকা তুলে নিল সুতপা। তার পর টাকা তিনটে আমাব হাতে গুঁজে দিয়ে সে বলল, "ইউনিয়নের চাঁদা। প্রথম মাস ব'লে একটু বেশীই দিলাম, মহীতোষ।"

কফিহাউস থেকে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট পর্যন্ত হেঁটে আসতে আমাদের দশ মিনিটও লাগল না। মনে হ'ল, সুতপাকে আমি আজও চিনতে পারি নি। ওর মনের তর্ক শেষ হয় নি। দুটো বিপরীতমুখী হাওয়ার গতি যেন মনের রাজ্যে ওর সংঘর্ষের ক্ষেত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে। তবে কি ছোটসাহেবের উল্টো দিকে আমাকে দাঁড় করাবার জন্যেই সুতপা আজ ইউনিয়নের খাতায় নাম লেখাতে চলল?

গুদামঘরটাকে দেখে আর চেনা যায় না। প্রতিদিনই এর রূপ বদলাচ্ছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—ঝকঝক করছে এর মেঝেটা। ডেস্‌প্যাচ ডিপার্টমেণ্টের অরিন্দম আজ বৌবাজার থেকে টেবিল চেয়ারও নিয়ে এসেছে দেখলাম। শুধু গুদামঘরটাতেই পরিবর্ত্তন আসে নি, অরিন্দমের পরিবর্ত্তনটাই আমায় চমক লাগিয়েছে সবচেয়ে বেশী। তেইশ কি চব্বিশ বছর বয়স হবে ওর। কাউণ্টারের পেছনে ব'সে চিঠি রাখা আর পাঠানোই ছিল ওর কাজ। এত অল্প বয়সেই মুখে ওর বার্ধক্যের ছাপ পড়েছিল। কেউ কোন দিন অরিন্দমের সঙ্গে ব'সে দু'চার মিনিটও গল্প করত না। সবচেয়ে ছোট চাকরি ছিল ওরই। গত ক'দিনের মধ্যে ইউনিয়নের সবচেয়ে উৎসাহী কর্ম্মী হ'য়ে উঠেছে অরিন্দমই। দেখলাম, দেড়শো টাকা মাইনের ভবানীবাবুও অরিন্দমকে ডেকে ডেকে কথা কইছেন। ব্যবধানের কৃত্রিমতা উধাও হয়েছে এরই মধ্যে। সুতপাকে বললাম, "মিনিট-দশেক অপেক্ষা কর। সভার কাজটা শেষ ক'রে নিই।"

হল-ঘরটার চারদিকে দৃষ্টি ফেলল সুতপা। তার পর সে বলল, "দলটা বেশ ভাল ভাবেই পাকিয়েছ। ঘরদোর আর আসবাবপত্র দেখে মনে হচ্ছে, মেম্বাবরা অনেক টাকাই চাঁদা দিয়েছে। মহীতোষ, আমি আরও দশটা টাকা বেশী দিতে চাই।"

"তিন টাকাতেই মেম্বার হওয়া চলে। গুদামঘরটায়—"

বাধা দিয়ে সুতপা বলল, "না, না মহীতোষ, এটা গুদামঘর নয়। এই তো গোকুল—একাধিক কৃষ্ণের বাল্যলীলাভূমি। ছোটসাহেব ঠিকই দেখেছেন। তাঁর পতনের অস্ত্র তৈরী হচ্ছে এখানে। দশ টাকা নয়, আসছে মাসের পুরো মাইনেটা তোমাদের দিয়ে দেব।"

"রতনের ইনজেকশন কিনবে কি দিয়ে?"

"ছোটসাহেবের কাছে ধার চাইব।"

"আমাদের ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য তুমি বুঝতে পার নি সুতপা।"

সভা আরম্ভ হ'ল। সবাইকে সম্বোধন ক'রে আমি বললাম,

"কমরেডস—" লক্ষ্য করলাম, সুতপা সহসা যেন চমকে উঠল। আমি দেখলাম, আমার পাশের চেয়ার থেকে উঠে পড়ল সে। বক্তৃতার মাঝখানে কখন যে সুতপা অরিন্দমের গা ঘেঁষে ব'সে পড়েছে তা অবিশ্যি আমি দেখতে পাই নি। যখন দেখলাম তখন বুঝতে পারলাম যে, সুতপা আজ তার নিজের অস্তিত্বকে সবার থেকে আলাদা ব'লে ভাবতে চায় না। মনে হ'ল, ওর আর্থিক স্বাধীনতার উদ্ধত প্রচার-পতাকা নত হয়েছে। সামাজিক-সঙ্ঘবদ্ধতার অংশ হ'তে চাইছে আমাদের আপিসের সুতপা রায়।

আলোচনার বিষয় ছিল সামান্যই। বক্তৃতার সুরুতে আমি বলেছিলাম, "কমরেডস, আমাদের ইউনিয়নের জন্যে বড়সাহেব, মিস্টার হেওয়ার্ড যে কত রকম ভাবে সাহায্য করেছেন তা আপনারা জানেন। আজ তিনি আমাদের দু' হাজার টাকাও দিয়েছেন। আমি নিজে গিয়েছিলাম তাঁর কাছে। আমাদের আপিসের জন্যে গোটাকয়েক টেবিল, চেয়ার ও আলমারীর দরকার ছিল। টাকা আমরা পেয়েছি। বৌবাজারের বিল আমরা এবার মিটিয়ে দিতে পারব। আমার ইচ্ছা, বড়সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়ে এই সভায় একটা প্রস্তাব পাস করি। আশা করি আপনাদের কোন আপত্তি নেই। আপত্তি থাকা উচিত নয় এইজন্যে যে, আমাদের ছোটসাহেবের কাছ থেকে একটি পয়সার সাহায্য পাওয়া যায় নি। উপরন্তু তিনি আমাদের ইউনিয়ন ভেঙে দেওয়ার জন্যে চেষ্টা করছেন।"

অরিন্দম দাঁড়িয়ে পড়ল সহসা। ডান হাতটা তুলে দিল ওপর দিকে। মুখ এবং হাতের ভঙ্গিতে ওর অপরিমিত হিংসার প্রকাশ। সে বলতে লাগল, "ছোটসাহেবের পতন আমরা কামনা করি। ছোট-সাহেব নিপাত যাক—কমরেড, আপনার প্রস্তাব আমি সমর্থন করলাম। ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ!"

সুতপা উঠে এল অরিন্দমের কাছ থেকে। উঠে এসে আবার সে ব'সে পড়ল আমার পাশের চেয়ারে। দেখতে পেলাম, বড্ড বেশী

অস্বস্তি বোধ করছে সুতপা। অরিন্দমের মত সে নিশ্চয়ই ছোট-সাহেবের পতন চায় না।

সভা শেষ হওয়ার পরে সুতপা বলল, "তোমার কাছে তিনটে টাকা রেখেছিলাম আমি। টাকা তিনটে এবার ফিরিয়ে দাও আমায়।"

"কেন?" বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করলাম আমি, "কেন, তুমি কি আমাদের ইউনিয়নের মেম্বার হ'তে চাও না?"

"না! টাকা তিনটে ফিরিয়ে দিলে আমি খুশী হব। আজই আবার রতনের জন্যে ইনজেকশন কিনতে হবে।" এই ব'লে হাত বাড়াল সুতপা। টাকা তিনটে ফিরিয়ে দিলাম আমি। ঠিক সেই সময়ে ঘরে ঢুকল মিস কেতকী মিত্র।

অরিন্দম তাকে অভ্যর্থনা ক'রে ডেকে নিয়ে এল। বিপ্লবের আগুন এরই মধ্যে নিবে গেছে। কেতকী মিত্র সুন্দরী। বুঝলাম কেতকী মিত্রের সঙ্গে অরিন্দম আগে-ভাগেই পরিচয় ক'রে নিয়েছে। সুতপা বলল, "কেতকী মিত্রের মত মেয়েদের তো ডেপুটি কিংবা মুন্সেফদের সঙ্গে বিয়ে হ'য়ে যায়। এরা আপিসে চাকরি করতে আসে কেন?"

"কার জন্যে ভয় পাচ্ছ? অরিন্দম, না ছোটসাহেব?"

"ভয় আমার কারও জন্যেই নেই, মহীতোষ। আমি শুধু ক্ষতির কথা ভাবছিলাম। কোন একটি কুৎসিত চেহারার ডেপুটি কিংবা মুন্সেফের ভাগ্যে সুন্দরী বউ জুটল না।"

অরিন্দম সবার সঙ্গেই কেতকী মিত্রের পরিচয় করিয়ে দিল। আমি অবাক হলাম অরিন্দমের কথা শুনে। মিস মিত্রকে মেম্বার ক'রে নেওয়ার জন্যে সে আমায় অনুরোধ করল। আমাদের ছোট-সাহেবের প্রতিপক্ষ মনে ক'রে সুতপা তার টাকা ফিরিয়ে নিল। আর কেতকী মিত্র ছোটসাহেবের কাছে কাজ করতে এসে মেম্বার হ'য়ে গেল সুতপার সামনেই!

আমি ভেবেছিলাম, কেতকী মিত্রকে সুতপা ঈর্ষা করছে। কিন্তু ওর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পরে সুতপা দেখলাম মিস মিত্রের সঙ্গে কথা কইছে প্রাণ খুলে। দু'জনের মধ্যে ভাব জ'মে উঠতে বোধ হয় দশ মিনিটেরও বেশী সময় লাগল না। সন্দেহ হ'ল আমার, সুতপাকে আমি একেবারেই চিনতে পারি নি। সরকার-কুঠির বাইরে সুতপাকে সম্ভবত চেনাও যাবে না। আজ বিকেলবেলা আমার মনে হয়েছিল, তপন লাহিড়ীকে কেন্দ্র ক'রে হয়তো বা একটা নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। নিজের চেয়ারে ব'সে পরিস্থিতিটার পরিণতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলাম আমি। কৌতুক উপভোগের প্রত্যাশা যে আমার ছিল না তাই বা অস্বীকার করি কি ক'রে? কিন্তু সে ধারণা আমার বদলাচ্ছে। বদলে দিচ্ছে সুতপাই। তপন লাহিড়ীর সত্যিই দ্বিতীয় কোন রূপ নেই। তিনি শুধু বণিক-আপিসের ছোটসাহেব। ধনিক-কোম্পানীর শুধু একজন প্রতিনিধি মাত্র।

সুতপাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললাম, "সাতটা বেজে গেছে, উঠবে না?"

"হ্যাঁ। গড়িয়ায় পৌঁছতে অনেক রাত হ'য়ে যাবে। চললাম ভাই কেতকী। আবার দেখা হবে। মহীতোষ, তুমি কি আমার সঙ্গে গড়িয়া পর্যন্ত যাবে?"

লক্ষ্য করলাম, সুতপা প্রশ্ন করল কেতকী মিত্রের দিকে চেয়ে। বোধ হয় আমার কাছ থেকে জবাব ও চায় না। তবে সে প্রশ্ন করল কেন? আমার সঙ্গে যে সুতপার ঘনিষ্ঠতা গড়িয়ার হোটেল পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে তেমন খবরটা কি ছোটসাহেবের জানা উচিত নয়? কেতকীর মারফত খবরটা বোধ হয় জানিয়ে দিল সুতপা রায় নিজেই।

ওকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম আমি। বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের দিকে হাঁটছিলাম আমরা। হঠাৎ মাঝপথে দাঁড়িয়ে গেল সে। মুখ নিচু ক'রে বার তিনেক সে 'কমরেড' কথাটা উচ্চারণ করল। মন্ত্রোচ্চারণের

শ্রদ্ধা ভেসে উঠল ওর কণ্ঠস্বরে। জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি কি আমায় ডাকছ ?"

"তোমায় ? তোমায় কেন ডাকতে যাব ? আমি ডাকছি আমার কমরেডকে। মহীতোষ, এতদিন কেন এই কথাটার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নি ?"

"এতদিন তুমি তো আমায় কমরেড ব'লে চিনতে পার নি। আমি তোমায় সাহায্য করতে চাই সুতপা।"

সুতপা তবু মুখ তুলল না। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। হয়তো বা ওর জীবন-দর্শনের সংজ্ঞায় নতুন পরিস্থিতির কোন পরিচয় নেই। সুতপার বিশ্বাস—প্রেম, ভালবাসা এবং বন্ধুত্ব এ সবই কুসংস্কার। সামাজিক সঙ্ঘবদ্ধতার মূলেও সে কুসংস্কারই দেখতে পেয়েছে।

ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমি আবার বললাম, "কমরেড, তুমি তো একটা নূতন বিগ্রহ খুঁজে বেড়াচ্ছিলে—"

"বিগ্রহ ?" চমকে উঠল সুতপা।

"হ্যাঁ। বিপ্লবের নতুন বিগ্রহ।"

"বিগ্রহটা আমায় দেখাতে পার ?"

"পারি। মন্ত্রটা যখন তোমার কানে গিয়ে পৌঁছেছে, তখন আর ভয় নেই। বিগ্রহটা ক্রমে ক্রমে তৈরী হবে। পাঠান, মোগল আর ব্রিটিশ রাজত্বের মত পঞ্চানন ঠাকুরের রাজত্বও যে শেষ হ'য়ে গেছে সে কথা তোমার ভাল ক'রেই জানা আছে।" একটু থেমে ফস্ ক'রে আমি ওকে প্রশ্ন ক'রে বসলাম, "সুতপা, তোমার স্বামী এখন কোথায় আছেন ?"

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটের কোলাহল থেমে গেছে। আপিসগুলো সব বন্ধ। লাভ-লোকসানের হিসেব আর এখন আপিসঘরে নেই। পানের দোকানগুলোতে রাতের ব্যবসা সুরু হয়েছে। সুতপা চোখ তুলতেই দেখতে পেল, রাস্তার উল্টোদিকে একটা হোটেল ও 'বার'।

দেওয়ালের গায়ে সাইনবোর্ড লাগানো। মদ্যপানের বিজ্ঞাপন তাতে লেখা রয়েছে। সেই দিকে চেয়ে সুতপা বলল, "দুচার কথায় সবটা বলা যাবে না। সময় লাগবে।"

বললাম, "আজকের পুরো রাত্রিটাই তো আমাদের হাতে আছে। চল, আমার হোটেলে ব'সে গল্প শুনব তোমার।"

"এ গল্প বুর্জোয়া-পরিবেশে ভাল জমবে না।"

"তবে ?"

"নিষ্ঠাবোধ আমার নষ্ট হয়েছে অনেকদিন আগেই। চল, ঐ হোটেলে ব'সে আমার অশান্তির গল্প শুনবে। মহীতোষ, তুমি তো বিবাহিত নও ?"

"না।"

"স্ত্রী-পুরুষের নিকটতম সান্নিধ্য বলতে যা বোঝায় তার স্বাদ কি তুমি পাও নি, মহীতোষ ?"

"না।"

"খাঁটি বুর্জোয়া তুমি। তোমরা বিপ্লব আনতে চাও বুদ্ধি দিয়ে," একটু হেসে সুতপাই বলল, "বিবাহিত লোকেদের ওপরই নির্ভর করা যায় না। তুমি খুব আশ্চর্য হচ্ছ, না মহীতোষ ? কিন্তু আমার তো দ্বিতীয় কোন পথ নেই, কমরেড। বার বার যদিও আমার দেহটা অপমানিত হয়েছে, তবুও—রক্তমাংসের বাস্তবতার মধ্যেই আমায় বাস করতে হবে। মহীতোষ, জীবনটা আমার আয়ত্তে দু'বার আসবে না। অতএব পরীক্ষা ক'রে পথ বেছে নেবার দায়িত্ব আমি নিই কি ক'রে ? আর বোধ হয় তুমি হোটেলে ঢুকতে চাও না ?"

"চাই।"

"সেই ভাল।" এই ব'লে সুতপা রাস্তাটা পার হ'তে যাচ্ছিল। আবার সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। হোটেলের একপাশে ছোটসাহেবের গাড়ীটা এসে থামল। আমরা দেখলাম তপন লাহিড়ী কেতকী মিত্রকে নিয়ে প্রবেশ করলেন হোটেলে।

সুতপা ঘোষণা করল, “অনুতাপ ক'রো না কমরেড, তোমাদের ইউনিয়নের স্বপ্নরাজ্যে মেম্বারের অভাব কোনদিনও হবে না।”

“অভাবের ভয়ে মিস মিত্রকে আমি মেম্বার করি নি।”

“তবে ?”

“মিস মিত্র ছোটসাহেবের স্পাই, সেই জন্যে।”

বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের মোড় থেকে ট্যাক্সি নিলাম আমরা।

কাল মহীতোষকে কোন কথাই বলা হয় নি। ট্যাক্সি ক'রে সে আমায় বালিগঞ্জ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে পাঁচ নম্বর ধ'রে আমি চ'লে এসেছিলাম গড়িয়ায়। কথা আছে, মহীতোষ আজ বেলা তিনটের মধ্যে সরকার-কুঠিতে এসে পৌঁছবে। মহীতোষ আমায় ওদের দলে টানতে চায়। ওর বিশ্বাস, আমাব আসল সমস্যা সামাজিক। ট্যাক্সিতে ব'সে কাল সে ঘোষণা করেছিল, ধনতান্ত্রিক সমাজের 'ভিক্‌টিম' আমি। সমাজব্যবস্থাব পবিবর্তন না ঘটলে লক্ষ লক্ষ স্তপার জীবন থেকে 'শঙ্কা' কখনও দূর হবে না।

তর্ক আমি করি নি, ক'রে লাভও হ'ত না কিছু। মহীতোষ আশাবাদী, মহীতোষ ফ্যানাটিক। সে বিশ্বাস করে, আজকের রাত্রিটা পার হ'তে পাবলে আগামী কল্যেব সূর্যোদয় চিরস্থায়ী হবে। পুরনো ইতিহাস প্রতিক্রিয়াশীলতাব অন্ধকাব দিয়ে আবৃত। বিপ্লবের সূর্যোদয় যদি ঘটে তা হ'লে অন্ধকার সব বিদূরিত হবে চিবদিনের জন্যে। মানবসমাজেব কল্যাণ কামনা কবে মহীতোষ। কোন একটি বিশেষ মানবেব সমস্যা ওকে বিচলিত কবে না। ওর ভাবনা শুধু গোটা সমাজেব সমস্যা নিয়ে।

কাল ট্যাক্সি থেকে নামবার পরে গড়িয়াহাটের মোড়ে দাঁড়িয়ে মহীতোষ বেশ খানিকক্ষণ বক্তৃতা দিয়েছিল। সব কথাই আমি ওর শুনেছিলাম। সবকার-কুঠিতে পৌঁছে দু' একটা কথা ওর মনে কববার চেষ্টা করেছিলাম বটে, কিন্তু কোন কথাই আমি মনে করতে পারি নি। ঘুমিয়ে পড়বাব আগে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম যে, ওর কথাগুলো সব হাল্‌কা। কথাব মধ্যে ওজনের ঐশ্বর্য থাকলে দু'ঘণ্টার ব্যবধানে দুটো কথাও মনে থাকত আমার।

আজ তো শুধু দু'ঘণ্টার ব্যবধান নয়, প্রায় আঠারো ঘণ্টাই পার হ'য়ে গেছে। মহীতোষ আসবে ব'লে একতলায় নেমে আসছিলাম

আমি। হঠাৎ ওর শেষ মন্তব্যটি মনে পড়ল আমার। মহীতোষ বলেছিল, "সুতপা, তোমার মনের একটা অংশ বড্ড বেশী বিষাক্ত হ'য়ে উঠেছে। অস্ত্রোপচারের দ্বারা তাকে বিষমুক্ত করা দরকার। সার্জারীর মত সত্য-ভাষণও কাটে। কাটে তা ঠিক, কিন্তু তাতে সুস্থতা ফিরে পাওয়া যায়।"

মহীতোষ বোধ হয় বয়সে আমার চেয়ে বছর-দুই ছোট। হাসবার অধিকার আমার ছিল। কিন্তু কি একটা কারণে কাল আমি হাসতে পারি নি। আজ তো কালকের পুরনো কথাটাই বার বার স্মরণ করছি। আমার সমস্যা কি তবে সত্যিই সামাজিক?

তিনটে এখনও বাজে নি। সময় না হ'লে মহীতোষ আসবে না। হোটেলের প্রত্যেকটা ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে। মাসীমা শুয়ে আছেন তাঁর নিজের ঘরে, আজ ক'দিন থেকে তাঁর শরীরটা ভাল নেই। মাথার যন্ত্রণা লেগেই আছে, হার্টের অবস্থাও খারাপ। দু-দুবার আক্রমণ হয়েছিল, কোন রকমে সামলে নিয়েছেন তিনি। শুধু শরীরের ওপরে নির্ভর ক'রে থাকলে মাসীমা এত দিন বেঁচে থাকতে পারতেন না—মনের জোর তাঁর অত্যন্ত বেশী ব'লেই আয়ু তাঁর ফুরিয়ে যায় নি। .

বাগানে নেমে এলাম আমি। বসন্তের পূর্বাভাষ চোখে পড়ল আমার। জামগাছের পাতা ঝরছে, চাল্‌তাগাছের ডালেও নতুন জীবনের নব-কিশলয়। ঝরাপাতার বুকে শুধু উড়ে যাওয়ার মৃদু হাহাকার। হাঁটিতে হাঁটিতে আমি চ'লে এলাম সরকার-কুঠির পেছন দিকটায়। এসে স্তম্ভিত হ'য়ে ব'সে পড়লাম বুড়ো আমগাছের তলায়। এখান থেকে বড় ফটকটা স্পষ্ট দেখা যায়।

গড়িয়ার খালে জল নেই। বলরাম খালটা পার হ'য়ে ফটকের পাশ দিয়ে এগিয়ে আসছিল এই দিকে। হাওড়াহাটের গামছাটা পাগড়ীর মত মাথায় বেঁধেছে। তার ওপরে দু'সারি ক'রে ছ'খানা ইট। ইট বইছে বলরাম! ব্যাপার কিছু বুঝতে পারলাম না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "জেটমলের ইটের পাঁজা থেকে এগুলো চুরি ক'রে নিয়ে এলি নাকি ?"

"না, ষষ্ঠীদা কিনেছে।"

"কিনেছে ? ষষ্ঠীদা কোথায় ?"

"বক্সিতের মোড়ে, দোকানে ব'সে আছে। আজ একশ' ইট কেনা হ'ল। এক নম্বর কিনা, দাম নিয়েছে পঁয়ত্রিশ টাকা। বিশ্বাস না হয়, টাইগারকে জিজ্ঞেস কর।"

"টাইগারকে ?"

"হ্যাঁ, চল। গোয়ালের পেছন দিকে টাইগার দেখবে পাহারা দিচ্ছে।" এই ব'লে বলরাম সেই দিকে হাঁটতে লাগল, আমিও চললাম ওর পেছনে পেছনে। ভাঙাচোরা সরকার-কুঠি মেরামত করছে নাকি ষষ্ঠীদা ? বাড়ীটা শুধু পুরনো নয়, পতনোন্মুখ। দু'চারশ' ইটের সামর্থ্য দিয়ে একে তো ধ'রে রাখা যাবে না! তা ছাড়া ষষ্ঠীদার পাগলামির মসলা দিয়ে এ বাড়ী মেরামত হওয়াও অসম্ভব। জেটমল অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছে সরকার-কুঠি দখল নেওয়ার জন্যে। দখল পেলে এখানে সে ফ্ল্যাট-বাড়ী তুলবে ব'লেই তো খবর শুনেছি মাসীমার কাছে।

বলরামের পেছনে পেছনে এসে উপস্থিত হলাম খাল পর্যন্ত। সত্যি সত্যি টাইগার সেখানে ছিল। কিন্তু কি পাহারা দিচ্ছে সে ? মাথা থেকে ইটগুলো সব নামিয়ে ফেলল বলরাম। ফেলে সে বলল, "ষষ্ঠীদার হাতে যা টাকা ছিল সব ফুরিয়ে গেছে। ইট, সুরকি, সিমেণ্ট কেনা হয়েছে। তপাদি, তোমার ছোটসাহেবের কাছে ধার পাওয়া যাবে ?"

"কেন ?"

"এবার তো রাজমিস্ত্রী লাগাতে হবে—এস, দেখবে এস।" বলরাম আমায় গোয়ালের পেছন দিকে নিয়ে এল। আমি দেখলাম, খানিকটা জায়গা জুড়ে মাটিতে ভিত গাড়া হয়েছে। বুকে টোকা মেরে বলরাম

ঘোষণা করল, "মাটি কাটল কে জান? আমি। পেছন দিকের দেয়ালটা ভেঙে পড়েছিল। অনেক দিনের পুরনো ইট। তা হোক, যে ক'খানা ভাল ইট পেলাম সব মাথায় তুলে নিয়ে এসে ফেললাম এইখানে। ইটের ওপর ইট গাঁথল ষষ্ঠীদা। পুরনো ইটও আর পাওয়া গেল না। ষষ্ঠীদা বলল, এবার রক্ষিতের মোড়ে গিয়ে নতুন ইট কিনতে হবে, হ'লও কেনা। তপাদি, কাগজের ওপরে ষষ্ঠীদা নক্শা এঁকেছে।"

"কিসের নক্শা রে?"

"মন্দিরের।"

"মন্দির? তোরা লুকিয়ে লুকিয়ে এখানে মন্দির তৈরি করেছিস?"

"লুকিয়ে লুকিয়ে নয় তপাদি। টাইগার তো সর্বক্ষণই দেখছে। মাসীমাকে আমরা একদিন অবাক ক'রে দেব। পঞ্চানন ঠাকুরের মন্দিরের চুড়ো দেখেছ তো? হুঃ! আমাদেরটাও দেখ, তার চেয়ে উঁচু হবে এই মন্দিরের চুড়ো। ষষ্ঠীদা বলল যে, একটা বিগ্রহ না বসালে সরকার-কুঠির ঘাড় থেকে ভূত নামবে না।"

"তোরা এখানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করবি?"

"হ্যাঁ। কালীঘাটের অর্ডারী বিগ্রহ নয়। তপাদি—" আমার কানের কাছে মুখটা তুলে আনবার চেষ্টা করল বলরাম, কিন্তু পৌঁছতে পারল না। তাই নিচুস্বরে সে বলল, "ষষ্ঠীদা সন্ন্যাসী। তার স্বপ্নে-পাওয়া বিগ্রহ। কাউকে যেন কিছু ব'লো না এখন। এই ছাখ, টাইগারটা আবার কান খাড়া ক'রে শুনছে! দাঁড়াও—"

এই ব'লে বলরাম তেড়ে গেল কুকুরটার দিকে। টাইগার ভয় পেল না বিন্দুমাত্র, গড়িয়ে পড়ল বলরামের পায়ের কাছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে এবার বলরাম বলল, "তপাদি, ছোটসাহেবের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার আনতে পার? ষষ্ঠীদা বলেছে প্রত্যেক মাসে মাইনে থেকে অর্ধেক টাকা সে ধার শোধ করবে।—ওঠ্, ওঠ্, মাটিতে শুয়ে থাকলে তো চলবে না, তোকে যে পাহারা দিতে হবে।

দেখিস্, একটা ইটও যেন চুরি না যায়। চুরি গেলে তোকে আর আস্ত রাখব না—ঠেঙিয়ে লাশ বানিয়ে দেব—হুঃ! আমার নাম বলরাম—মাসীমাকে এখন কিছু ব'লো না তপাদি, যাই—"

গড়িয়ার খালে জল নেই। মাথায় গামছা বাঁধতে বাঁধতে বলরাম খালটা পার হ'য়ে গেল আমি দেখলাম, কত সহজেই না সে টপকে চ'লে গেল ওপারে। চৌদ্দ-পনের বছর আগে লালুদা এই খালটাই পার হ'তে গিয়ে পারে নি, হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে গিয়েছিল। ঘাড়ের ওপরেই প্রথম গুলিটা লাগে। গুলি খেয়েও লালুদা উঠে দাঁড়িয়েছিল, এগিয়ে গিয়েছিল খালের কিনারা পর্যন্ত। একটা গুলির বারুদ লালুদার দেশপ্রেমকে পুড়িয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। কিন্তু পার হ'তে সে পারল না, ওপার থেকে লক্ষ্মণ গয়লা তার লোকজন নিয়ে ছুটে এল। হাতে তাদের ছিল বড় বড় টর্চলাইট। লক্ষ্মণ জানত, লালুদাকে ধরিয়ে দিতে পারলে দশ হাজার টাকা পুরস্কার পাবে। লোভের উত্তেজনায় ওরা চেঁচাতে লাগল, "পাকড়ো, পাকড়ো—"

খাটালের একশ'টা গরু আর পঞ্চাশটা মোষও সেই সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু তাতে পুরস্কার পাওয়ার লোভ ছিল না।

টর্চের আলোয় বিপিন চাটুজ্জের দ্বিতীয় গুলিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল না। তবুও সে ঘুরে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছিল দু'এক মিনিট। তখন আমার চোখ শুকনো ছিল। তার বুকের বিস্তৃতি ও অতলস্পর্শতা আমি দেখতে পেয়েছিলাম। চাঁদসদাগরের ভারী নৌকাও অনায়াসেই পার হ'য়ে যেতে পারত। পঞ্চবটীর পুরনো গঙ্গা যেন লালুদার বুকের স্পর্শে শুধু বড় হ'য়ে উঠল না, লালও হ'ল। ভারতবর্ষের বুকে কেবল ভৌগোলিক বিস্তৃতি নেই, প্রেমের বিস্তৃতিও আছে।

লালুদাকে আমি ভালবাসতাম। আমার তখন ষোল বছর বয়স। দেহে হয়তো ষোল বছরের প্রমাণ ছাড়া আর কিছু ছিল না, কিন্তু মনের অবয়বে পরিণতির বলিষ্ঠতা দাগ কেটেছে গভীর ভাবে।

সেই দিন রাত্রি বোধ হয় আটটা হবে। লালুদার কাছ থেকে চিঠি পেলাম : রতন আর তোমার বাবা ঘুমিয়ে পড়লে একবার এস। বড় ফটক দিয়ে এসো না। লক্ষ্মণ গয়লার খাটালের পেছন দিকের পথ ধরবে। খালে এখন জল বেশী নেই। ভোররাত্রি পর্যন্ত এখানে থাকব।

আমি এসেছিলাম লালুদার সঙ্গে দেখা করতে। অন্ধকারে পথ ভাল দেখতে পাই নি। খালের যে জায়গাটায় সবচেয়ে বেশী জল ছিল সেইখানে নেমে পড়লাম আমি। জলের উচ্চতা হাঁটুর ওপরে উঠে এল। ক্রমে ক্রমে দেখলাম জলের গভীরতা বাড়ছে। বুকের লজ্জাও আর গোপন রইল না—ভিজে উঠল। বিপ্লবী লালু সরকারের গোটা অস্তিত্বটাই ছিল আগুনের মত গরম। ভেজা দেহের জল শুকোতে সময় লাগল না।

দোতলার ওই ঘরটাতে লালুদা আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। পাজামা পরেছিল সে, পাজামাব দড়িটা দেখলাম গরু বাঁধবার দড়ির মত মোটা। সরু কোমরটা তার দড়ির চাপে আরও সরু হয়েছে। নাভির চতুর্দিকে এক ইঞ্চি বাড়তি মেদ নেই, যৌবনের পৈশিক তন্তু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। লালুদার সবটুকুই খাঁটি, এমনকি মাংস-পেশীও। আমি সেই দিকেই চেয়ে ছিলাম। মনে মনে অনেককিছুই কল্পনা করতাম বটে, কিন্তু সেদিন আমি বাস্তব স্পর্শ করতে চেয়েছিলাম। আমি চেয়েছিলাম, লালুদাও বাস্তবের নিকটবর্তী হোক। কোমরের মোটা দড়িটা হাত দিয়ে চেপে ধরলাম আমি। লালুদা বলল, "এখানে পিস্তল বেঁধে রাখতে হয়।"

"আজ পিস্তলের কথা থাক। শুধু একটি বারের জন্যে আমায় তুমি বেঁধে রাখ লালুদা।"

আমার বুকের দিকে চেয়ে সে বলল, "মায়ের একটা শাড়ি নিয়ে আসছি, কাপড়টা তুমি বদলে নাও।"

"দরকার নেই। এতদিন পরে তোমায় আমি পেয়েছি, ছাড়ব না।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হোক আমি কি চাই না? চাই। তাই ব'লে তোমায় আমি চাইব না কেন? ঘুমন্ত বাদুড়ের মত হাত দুটো দু'দিকে ঝুলিয়ে রাখলে কেন? আমায় তুমি গ্রহণ কর লালুদা—নাও। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা না এলে চলবে না—কিন্তু আমার স্বাধীনতা খোয়া না গেলে আমি কি নিয়ে বঁচব? কুমারী-জীবনের নিষ্কলঙ্কতা—"

"সুতপা!"

"লালুদা, তুমি একদিন ধরা পড়বে। হয়তো আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের গভীর নির্জনতায় তোমার যৌবনের পেশী যাবে ক্ষয় হ'য়ে। ভারত-বর্ষের উপকূলে দাঁড়িয়ে আমি কি করব? আমি কি নিয়ে থাকব?"

"সুতপা, পিস্তলটা ফেলে এসেছি গোয়ালের সামনে।"

"আমার চেয়ে পিস্তলটা আজ বড় নয়।"

"পিস্তল ছাড়া হঠাৎ যেন অসহায় বোধ করছি। ছাড়—"

"আমায় তুমি ধর, লালুদা। আমার দেহের মধ্যে বিপ্লবের দাগ কাটো—আমার—"

লালুদার গায়ে শক্তির কিছু অভাব ছিল না। প্রেমিকা সুতপা রায়ের বাহু তাকে ধ'রে রাখতে পারল না। আমার বদলে সে পিস্তল ধরবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠল। আমার চোখ তখনও শুক্‌নো!

একতলার সিঁড়িতে তখন ভারী জুতোর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। লালুদা হঠাৎ হেসে ফেলল। কি এক অদ্ভুত রকমের হাসি!

আমি দেখলাম, মুখের হাসি তার চোখের চরিত্র বদলাতে পারে নি, চোখের ভঙ্গিতে আগুনের হল্‌কা! সে বলল, "তপা তুমি বুঝি সঙ্গে ক'রে পুলিশ ডেকে এনেছ? বোধ হয় আজ আমি ধরা পড়লাম।"

আমায় ভুল বুঝল লালুদা! ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে। বাঘের মত লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল ছাদের দিকে। তার পর যখন তাকে দেখলাম, তখন সে আর বেঁচে নেই।

ঘাড়ের আঘাত তাকে খতম করতে পারে নি। চওড়া বুকটার বাঁ দিকে একটা গুলি লেগেছিল। আর তৃতীয় গুলিটা লেগেছিল নাভির নিচে—বোধ হয় নাভির ইঞ্চিতিনেক নিচে। বিপিন চাটুজ্জে খোঁচা মেরে লালুদার দেহটাকে চিৎ ক'রে দিয়েছিলেন। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। দেখলাম, গলার তলা থেকে নাভির নিচে পর্যন্ত সবটা জায়গাই লাল—তাজা রক্তের উত্তাপ যেন আমার গায়েও লাগল। পাজামার দড়িটা তখনও অটুট আছে বটে, কিন্তু পাজামার কাপড়টা ছিঁড়ে গেছে অনেক জায়গায়ই। নাক দিয়ে নিশ্বাস টানতে লাগলাম ঘন ঘন। বিদ্রোহী লালু সরকারের রক্ত থেকে গন্ধ আসছিল—দেশপ্রেমের গন্ধ!

বিপিন চাটুজ্জেকে নমস্কার ক'রে বললাম, "আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার জন্যেই লালুদার সবটুকু আজ আমি দেখতে পেলাম।"

"তুমি? তুমি কে?" তেড়ে উঠলেন বিপিন চাটুজ্জে।

বললাম, "লালু সরকারের প্রণয়িনী আমি। বাপের চোখে ধুলো দিয়ে অভিসারে এসেছিলাম। উঃ, আপনি কি উপকারই না আজ করলেন! এমন একটা মৃত্যুর মধ্যে জীবনের স্বাদ পেলাম আমি, অস্তিত্বের অর্থ বুঝতে পারলাম আজই। অস্তিত্বটা এত ক্ষীণ যে, দৈহিক দণ্ড দিয়ে তাকে সনাক্ত করা যায় না। কি অভিজ্ঞতা বে বাবা!"

একটু পরেই খালের ধারটা খালি হ'য়ে গেল। ধারে-কাছে কাউকে আর দেখতে পেলাম না, এমনকি মাসীমাকেও না। মনে হ'ল আমি শুধু একা নই, পরিত্যক্তা। মানুষের এই তো স্বাভাবিক পরিচয়। দীর্ঘ পথ তাতে সন্দেহ নেই, তবু তার একাকিত্বের বুকে সত্যের স্বাক্ষর রয়েছে।

ভোররাত্রির হাওয়া গায়ে লাগল আমার। হঠাৎ কেমন শীত-শীত করতে লাগল। খানিক বাদে মনে হ'ল, বরফের মত জ'মে যাচ্ছি আমি। নতুন রোগের সূচনা নিয়ে বাড়ী যখন ফিরলাম,

তখন আমি আর ষোল বছরের কুমারী নই—শতাব্দীর ভার বহন করছি আমি।

তিনটে বেজে গেছে। মহীতোষ বোধ হয় কোন দরকারী কাজে আটকে পড়েছে। অনেকদিন তো আমি ওকে আসতে ব'লে কথা রাখি নি। আজ কি মহীতোষ আমার ওপর প্রতিশোধ নেবে? কেন যেন সারাটা দিন ধ'রে কেবলই মনে হয়েছে, মহীতোষ আমার বন্ধু, মহীতোষ আমার সত্যিকারের কমরেড। ওর সামাজিক বিপ্লবের পুরো খসড়াটি আমি দেখি নি বটে, কিন্তু আমি জানি, সেই খসড়া থেকে আমি বাদ পড়ি নি। সুতপা ওর নতুন সমাজের অংশ।

বড় ফটকটার দিকে চেয়ে ব'সে ছিলাম। ইটের বোঝা মাথায় নিয়ে বলরামের এর মধ্যে আরও একবার ফিরে আসা উচিত ছিল। মন্দির-প্রতিষ্ঠার গোপন সংবাদ আমি জেনে ফেলেছি ব'লে কি ষষ্ঠীদা বলরামের ওপর রাগ করল?

সময় আর কাটতে চাইছে না। এইখানে ব'সে থাকতে গেলে বার বার ক'রে লালুদার কথাই মনে পড়ে। চৌদ্দ বছরের ব্যবধান ঘুচে যেতে এক মিনিটও লাগে না। বিপ্লবীদলে যোগ দেওয়ার আগে লালুদা প্রায়ই আসত আমাদের বাড়ী। মা তখন বেঁচে নেই, রতনের বয়স বোধ হয় বছর তিন হবে। আমি আর বাবা রতনকে দেখাশোনা করতাম। বাবা একশ' কুড়ি টাকা মাইনেতে বড় পোস্ট-আপিসে কেরানীগিরি করতেন। রক্ষিতের মোড়ে ঠাকুরদা ছোট্ট একখানা বাড়ী তৈরি ক'রে রেখে গিয়েছিলেন ব'লে একশ' কুড়ি টাকায় কোনরকমে আমাদের সংসার চলত। এই সময় বাবা অসুখে পড়লেন। চিকিৎসা তেমন ভাল ক'রে হওয়ার সুযোগ ছিল না কিছু। শেষ পর্যন্ত হাত দুটো তাঁর বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। চাকরি থেকে বিদায় নিতে হ'ল, আমাদের দারিদ্র্য চরমে উঠল। লালুদা বোধ হয় এত বেশী দারিদ্র্য কখনও চোখে দেখে নি। মনে পড়ে,

একদিন সে আমায় বলেছিল, "জান, এর জন্যে দায়ী কে? দায়ী ইংরেজ।"

সত্যিই ইংরেজ দায়ী কিনা সে সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞানই ছিল না। তখন পর্যন্ত একটিও ইংরেজ আমার চোখে পড়ে নি। গড়িয়ার পুল পার হ'য়ে কোন গণ্যমান্য ব্যক্তি এ অঞ্চলে বড় আসতও না। পুলিশের দারোগা ছিল গড়িয়ার সবচেয়ে সম্মানিত নাগরিক।

ক্রমে ক্রমে লালুদার মধ্যে পরিবর্তন আসতে লাগল। চোখের ভাষায় বিদ্বেষের আগুন। বুঝতে আমার বাকী রইল না যে, এ বিদ্বেষ ওর ইংরেজদের প্রতি। সে দেশপ্রেমের অধিকাব নিয়ে জন্মায় নি। কি ক'রে দেশকে ভালবাসতে হয় তেমন শিক্ষা সরকার-কুঠি তো দূরের কথা, সংসারের কোথাও সে পায় নি। সারা গড়িয়ার আবহাওয়ায় দেশপ্রেমের উত্তাপ কারো গায়ে লেগেছে ব'লে সেদিন আমার জানা ছিল না। এ অঞ্চলের ইতিহাসে লালুদাই ছিল এক-মাত্র ব্যতিক্রম। আমাদের অভাবের পথ দিয়েই সে তার বিপ্লবের আদর্শ খুঁজে পেয়েছিল।

বিয়াল্লিশের গণ্ডগোল স্থরু হওয়ার কিছুদিন আগে থেকে রক্ষিতের মোড়ে আর তাঁকে দেখতে পাই নি। সরকার-কুঠিও সে তখন ত্যাগ করেছে। গান্ধীজী জেলে যাওয়ার ছুদিন আগে লালুদা এসে উপস্থিত হ'ল আমাদের বাড়ীতে। রাত বোধ হয় তখন এগারটা কি বারটা। দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে সে আমায় বলল, "পুলিশ আমার খোঁজ করছে। আর যদি তোমার সঙ্গে আমার দেখা না হয়, ছুঃখ ক'রো না তপা। দেশের জন্যে জীবন দেওয়া ছাড়া আপাতত আমার হাতে আর বড় কাজ নেই।"

"কিন্তু আমার কি হবে?"

"স্বাধীন ভারতবর্ষ তোমার দায়িত্ব নেবে নিশ্চয়ই।"

"সে কবে, কতদিন পরে?"

জবাব দিল না লালুদা। আমি এবার ধীরে ধীরে বলতে লাগলাম,

"গড়িয়ার একটি লোকও এ পর্যন্ত আসে নি দুটো মিষ্টি কথা বলতে। যারা আসে তারা বাবাকে ঠাট্টা ক'রে যায়। মেয়েকে আজও কেন বিয়ে দিচ্ছেন না, তাই নিয়ে তারা রসিকতাও করে। এ রসিকতার মানে তুমি জান লালুদা ?"

"না।"

"গড়িয়ার সমাজে আমি আর একলা নই। তোমার পাশে আমাকেও দাঁড় করিয়েছে ওরা। লালুদা, পিস্তল তুমি ফেলে দাও, তোমার সঙ্গে আমি থাকব। আমাকে পাওয়ার চেয়ে শহীদ হওয়ার প্রলোভন কি বড় ? ইংরেজ নয়, আমাদের পাশের বাড়ীর রামবাবু থেকে সুরু ক'রে লক্ষ্মণ গয়লা পর্যন্ত প্রত্যেকেই চেষ্টা করছে আমাদের এই ছোট্ট অসহায় পরিবারটির মুখ থেকে অন্ন কেড়ে নেওয়ার জন্যে। অন্নের 'মেনু'তে কি কি খাদ্য আছে শুনবে ? আজ ক'দিন থেকে রতন কি খাচ্ছে জান ? লালুদা এস, আমরা দু'জনে মিলে বক্সিতের মোড়ের এই সংসারটিকে বাঁচাই। পঞ্চানন ঠাকুর যা পারছেন না, আমরা তা পারব।"

"সুতপা—"

"লালুদা—"

"পঞ্চানন ঠাকুরের পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি আমরা যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত হাতের অস্ত্র মাটিতে ফেলব না।"

এক রকম নিরাশ হ'য়েই বললাম, "এ-অস্ত্রের কোন মর্যাদা নেই।"

"কেন ?"

"যে অস্ত্র মাথায় রাখা যায় না, পায়ে ছোঁয়াতে হয় তার দাম আমি এক পয়সাও দেব না।"

দরজার খিল খুলল লালু সরকার। নিঃশব্দে সে চ'লেই যাচ্ছিল। বারান্দায় কার একটা ছায়া দেখে সে সহসা ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, "ওখানে কে ?"

"বোধ হয় বাবা।"

"এত রাত অবধি তিনি কি করছেন?"

"তুমি তাঁর যুবতী মেয়ের শয়ন-কামরায় ঢুকে পড়েছ মধ্যরাত্রে—পিতার কর্তব্য তাঁকে করতে দাও লালুদা।"

"তা হ'লে যাই?"

"যাওয়ার আগে কি জেনে গেলে?"

"জেনে গেলাম যে, ঠাকুর-দেবতার ওপরেও বিশ্বাস হারিয়েছ তুমি।"

"শুধু এইটুকুই জানলে? পোড়াকপাল আমার!"

"কেন আরও কিছু আছে নাকি জানবার?"

"এ বাড়ী থেকে আমাদের উঠে যেতে হবে। জেটমলের কাছে যে বাড়ীটা বাঁধা ছিল, তা তো তুমি জানতে। এক-একবার মনে হয়, জেটমলরা কত কাছে, আর ইংরেজরা কত দূরে! সুযোগ পেলে আবার এস লালুদা, আমি অপেক্ষা ক'রে থাকব।"

চারটে বেজে গেল। কোথায় যেন ঘণ্টাবাজার আওয়াজ হচ্ছে। সাড়ে চারটেয় কলেজ ছুটি হয়। কিংবা রক্ষিতের মোড়ের সেই ইস্কুলেই বোধ হয় ঘণ্টা বাজছে, ঘণ্টার আওয়াজটা খুব চেনা লাগছে। এক সময়ে আমি পড়তাম ওই ইস্কুলে।

ফটক দিয়ে ছোটসাহেবের গাড়ি ঢুকছে। অবাক হলাম খুবই, তাঁর সঙ্গে দেখা করবার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না আমার। আমার আছে কি চান তিনি? ভাবলাম, লক্ষ্মণ গয়লার খাটালের পেছন দিকের রাস্তা দিয়ে স'রে পড়ি, কিন্তু পারলাম না। গাড়ি থেকে নেমে পড়ল বলরাম। নেমেই সে ছুটতে ছুটতে চ'লে এল আমার কাছে। বলরাম বলল, "তপাদি, শীগগির এস। ছোটসাহেবের বউ এসেছেন গো—পথ দেখিয়ে নিয়ে এলাম।"

"হাঁপাচ্ছিস কেন?"

"তপাদি, দশটা টাকা পেয়েছি। উনি দিলেন!"

"বকশিশ বুঝি ?"

"না, মজুরি। উনি বাড়ীটা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। রক্ষিতের মোড়ে দেখলুম গাড়িটা দাঁড়িয়ে প'ড়ল। তোমার নাম ক'রে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বাড়ীটা কোথায় রে ?"

"তুই কি বললি ?"

"বললাম, বলব কেন ? আমাদের মন্দির উঠছে, তু' টাকা চাঁদা দিলে তবে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব। তপাদি, গাড়ি থেকে নামবার সময় তিনি বললেন, খুচরো নেই। দশটা টাকাই নিয়ে যাও। মন্দিরেব কাজে আরও বেশী দেওয়া দরকাব। চল, শীগগির চ'লে এস, ষষ্ঠীদার ফণ্ডে এখখুনি গিয়ে টাকা দশটা জমা দিতে হবে। উনি গাড়িতে ব'সে আছেন।"

বলরামের সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি পর্যন্ত এলাম। সবিতা দেবী গাড়িতে ব'সেই জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি ব্যস্ত আছ ?"

"না।"

"তোমাব খোঁজ করতে আপিসেও গিয়েছিলাম। শুনলাম তুমি নাকি এক মাসেব ছুটি নিয়েছ।"

"ছোটসাহেব কেমন আছেন ?"

"কেন তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হয় না ?"

"না।"

"তা হ'লে ভাই তোমার সঙ্গে তু'দণ্ড ব'সে গল্প ক'রে যাই।" মিসেস লাহিড়ী নেমে পড়লেন গাড়ি থেকে। চারদিকে চেয়ে তিনিই আবার বললেন, "বাঃ, ভারী সুন্দব তো বাগানটা !"

"এক সময়ে সত্যিই সুন্দর ছিল। যত্নের অভাবে বড় বড় আম গাছগুলো সব নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। হোটেল কিনা, যত্ন করবার লোক নেই।"

"হোটেল ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এটাকে মাসীমাব হোটেল বলে। চলুন, ভেতরে গিয়ে বসি।"

বাড়ীর দিকে হাঁটতে হাঁটতে মিসেস লাহিড়ী বললেন, "হোটেল হ'লেও জায়গাটি কিন্তু খুবই নিরিবিলি। ছোটসাহেব এখানে কখনও আসেন নি?"

"এসেছেন, মাত্র বার দুই।"

"মাত্র?" প্রশ্ন ক'রে থেমে গেলেন সবিতা দেবী।

"কে রে তপা? গাড়ি ক'রে কে এল? ছোটসাহেব নাকি?" বলতে বলতে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন মাসীমা।

মাসীমার সঙ্গে সবিতা দেবীর পরিচয় করিয়ে দিলাম। আমরা এসে বসলাম বসবার ঘরে। ভাঙাচোরা আসবাবপত্রের দিকে চেয়ে মিসেস লাহিড়ী নিশ্চয়ই বুঝতে পারলেন, এটা সত্যি সত্যিই হোটেল।

মাসীমাকে আমি বললাম, "সকালে তোমার গায়ে জ্বর ছিল। হঠাৎ উঠে এলে কেন?"

"আমি যাচ্ছি। তোরা ব'সে গল্প কর্, চা পাঠিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ রে বলরাম কোথায়? সারাটা দিন ওকে দেখি নি, এঁটো বাসনগুলো সব প'ড়ে রয়েছে।"

জবাব দিলাম না আমি, মাসীমা উঠলেন। হাঁটতে তাঁর বিশেষ কষ্ট হচ্ছিল। ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন একটু। তার পর নিজের মনেই যেন বলতে লাগলেন, "ছোটসাহেবের কাছে চাকরি পাওয়ার ভরসা পেয়েছে বলরাম! ছোঁড়াটা দিনরাত স্বপ্ন দেখছে। হোটেলের কাজে আর ওর মন নেই।" সবিতা দেবীর দিকে চেয়ে বক্তব্য তিনি শেষ করলেন, "তা বাছা ছোটসাহেবকে আমার হয়ে একটু অনুরোধ ক'রো তো, যেমন তেমন কাজে একটা ওকে লাগিয়ে দিতে। মাঝে সাঝে স্বপ্ন দেখা ভাল। কিন্তু দিনরাত স্বপ্ন দেখলে তো ছেলেটা পাগল হ'য়ে যাবে: যাই, শুয়ে পড়ি গে। হ্যাঁ মা, ছোটসাহেব ভাল আছেন তো? সেই কবে একবারটি এসেছিলেন, তার পর আর তাঁকে দেখতে পেলাম না।" এই ব'লে মাসীমা দৃষ্টি ফেললেন আমার ওপরে। অর্থপূর্ণ দৃষ্টি, তাতে আর সন্দেহ ছিল না।

মনে হ'ল, আমার মুখ থেকে কোন নূতন সংবাদ শুনতে চান তিনি। বললাম, "ছোটসাহেব আবও একদিন এখানে এসে-ছিলেন। রাত একটু বেশী হ'য়ে গিয়েছিল ব'লে তোমায় খবর দিই নি।"

সবিতা দেবী একটু ন'ড়ে চ'ড়ে বসলেন। মাসীমা আর অপেক্ষা করলেন না, চ'লে গেলেন। যাওয়ার আগে তিনি ব'লে গেলেন, "এই বয়সে রাত বেশী হ'লেই কি ঘুম আসে রে?"

মাথা নীচু ক'রে ব'সে ছিলেন সবিতা দেবী। আলাপ-আলোচনা স্থরু করা দরকার। স্থরু না হ'লে তো শেষও হবে না। যে-কোন সময়ে মহীতোষ এসে উপস্থিত হ'তে পারে। মহীতোষের জন্যে বেলা তিনটে থেকে অপেক্ষা ক'বে ব'সে আছি আমি। সবিতা দেবীব প্রেমের কাহিনী কিংবা পাপের কাহিনী শোনবাব জন্যে সত্যিই আমি প্রস্তুত নই আজ। কিন্তু মহীতোষ এল কই? মানুষের অসহায়তা কি করুণ! নিজেব ইচ্ছামত সে কোনকিছুই করতে পারে না। যা ঘটছে তা আমি ঘটাচ্ছি না। প্রতিটি ঘটনা থেকে আমি বিযুক্ত। ভয় হয় একদিন হয়তো নিজেরই সত্তা থেকে আমার নিজেব বিযুক্তি ঠেকিয়ে বাখা যাবে না।

সবিতা দেবী মুখ তুললেন। আমি বললাম, "আপনাকে খুব অসুস্থ দেখাচ্ছে।"

"আমি তো সুস্থ নই।" এই ব'লে আবার তিনি চুপ ক'রে ব'সে বইলেন।

জিজ্ঞাসা কবলাম, "হঠাৎ কি মনে ক'বে এখানে এলেন, মানে—"

"বন্ধু খুঁজতে এসেছিলাম। তুমি কি আমার বন্ধু হ'তে চাও না সুতপা?"

"শত্রুতা করবার জন্যে তো সেদিন অযাচিত ভাবে আপনার বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হই নি।"

"আমায় তবে ব'লে দাও কি ক'রে আমি সুস্থ হ'তে পারি। খোকা

যখন আমার পেটে এল তখনও আমি সীতাংশুকে ভালবাসতাম। পাপের পরিধি তুমি দেখতে পাচ্ছ সুতপা ?”

মাথা নেড়ে বললাম, “না, পাচ্ছি না। সীতাংশুকে ভালবাসা মানে যে পাপ তা তো আপনি এখনও বুঝিয়ে বলেন নি। মিসেস লাহিড়ী—”

কথাটা আমার শেষ করতে দিলেন না তিনি। ঝপ ক'রে উঠে পড়লেন। পায়চারি করতে করতে হঠাৎ এক সময়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দাঁড়ালেন দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে। বিস্ময়ের স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, “এখানে এই গর্তগুলো খুঁড়ল কে ?”

“ইতিহাস।”

আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন সবিতা দেবী। ইতিহাসের ব্যাখ্যা তিনি শুনতে চাইলেন না। আমি জানি, কোন কিছু শুনতে তিনি এখানে আসেন নি, শোনাতে এসেছেন। মুহূর্ত কয়েক পরে তিনি বললেন, “স্বামী এবং সীতাংশুর সামনে সব কথা কবুল করতে চাই।”

“কন্‌ফেশন ?”

“তুমি হ'লে কি করতে ?”

প্রশ্ন শুনে হেসে ফেললাম আমি। হাসতে হাসতেই বললাম, “ছোটসাহেবের কাছে শুনেছি, ছেলেবেলাটা আপনার কেটেছে কন্‌ভেণ্টে। মাস্টার বিয়ুইক গাড়িতে চেপে ছোটাছুটি করবার সুবিধে না থাকলে আপনি কন্‌ফেশনের খবর শোনাতে এত দূরে ছুটে আসতে পারতেন না। মিসেস লাহিড়ী, আর কি আপনার সন্তান হবে না ? আমার পেছনেও একটু ইতিহাস আছে। আমিও একবার অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিলাম। কিন্তু আমার ছিল আপনার ঠিক উল্টো অবস্থা।”

“কি রকম ?” আগ্রহ দেখালেন সবিতা দেবী।

বললাম, “খোকা যদি না জন্মাত আপনি হয়তো অসুস্থবোধ করতেন না। আর আমি অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিলাম, খোকা একটি

জন্মাল না ব'লে। সে এক অদ্ভুত কাহিনী! না, না মিসেস লাহিড়ী, আজ আমি সে কাহিনী শোনাতে পারব না, মাপ করুন আমায়। যাচ্ছেন ?”

“হ্যাঁ।”

“একটা প্রশ্ন করতে চাই—”

“কর।”

“সত্যিই কি আপনি বন্ধু খুঁজতে এসেছিলেন ?”

“হ্যাঁ—তবে এখানে নয়, পঞ্চানন ঠাকুরের মন্দিরে। শুনেছি, তিনি নাকি জাগ্রত দেবতা।”

“তা হ'লে আমার কাছে আসবার অর্থ কি ?”

“দেখতে এসেছিলাম, ছোটসাহেবের ওপর তোমার অধিকার কতখানি।” এই ব'লে সবিতা দেবী বাইরে বেরিয়ে গেলেন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাঁক দিলেন, “ড্রাইভার—”

তাঁর পেছনে পেছনে আমিও গেলাম বাইরে। বিনীতস্বরে বললাম, “পঞ্চানন ঠাকুর যা পারেন না, আমি তা পারি। আমি আপনার বন্ধু হ'তে পারি, হলামও।”

“শ্যামনগরের চাকরি নিয়ে এখান থেকে চ'লে যেতে পার ?”

“অনায়াসে। যাব কথা দিলাম।”

গাড়িতে উঠলেন সবিতা দেবী। সরকার-কুঠির বাগানে সন্ধ্যার ছায়া পড়েছে। বারান্দা থেকে তর বড় ফটকটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। আমি দেখলাম, মাস্টার বিযুইক শ্লথ গতিতে ফটকটা পার হ'য়ে গেল।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে কি যে ভাবছিলাম মনে নেই। কতক্ষণ যে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম তাও স্মরণ করতে পারছিলাম না। মহীতোষ যে আজ আর এল না এমন একটা উপসংহার টেনে দিয়ে দোতলায় উঠতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল আবার সেই বড়

ফটকটার দিকে। হেড-লাইট ফেলে গাড়ি ঢুকল একটা। মাস্টার বিয়ুইক নয়, তার চেয়ে ছোট একটা গাড়ি। গাড়ি থেকে নামলেন ক্যাপটেন। সেই পুরনো দিনের গাম্ভীর্য আর নেই—সারা মুখে তাঁব হাসি ছড়িয়ে পড়ল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "চিনতে পারছ?"

"ভুলব কি ক'রে?"

তিনি হাত জোড় ক'রে নমস্কার করতে যাচ্ছিলেন, আমি নিজে থেকেই হাত বাড়িয়ে দিলাম। করমর্দন করলাম আমবা।

ক্যাপটেন আমার হাত ছাড়লেন না। টানতে টানতে তিনিই আমায় বসবার ঘরে নিয়ে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "আন্টি? আন্টি কোথায়? আংকেল কেমন আছেন?"

মাসীমাকে আর খবব দেওয়ার দরকাব হ'ল না। তিনি নিজেই এসে উপস্থিত হলেন। খাপ থেকে চশমা বার ক'রে জিজ্ঞাসা কবলেন, "কে রে এই মুখপোড়া? এত দিন কোথায় ছিলি বাঁদর?" চোখে চশমা লাগিয়ে মাসীমা ক্যাপটেনেব পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভাল ক'রে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

ক্যাপটেন জড়িয়ে ধরলেন মাসীমাকে। তার পব ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, "এতদিন লণ্ডনেই ছিলাম। বাবার খাতিরে মস্ত বড় একটা বণিক-আপিসে চাকরি নিয়ে ঢুকে পড়লাম। গোড়াতে চাকরিটা এমনকিছু বড় ছিল না। তার পর পেছনে মুরুব্বি থাকলে যা হয় তাই হ'ল। কোম্পানী আমায় তাদেব ব্যবসা দেখবাব জন্যে কলকাতায় দিল পাঠিয়ে। ভারতবর্ষে এদের বিবাট কারবার। সবাব উপরে এসে বসলাম আমি। আন্টি, এত বেশী টাকা মাইনে পাচ্ছি যে, টাকাব প্রতি আমার আর আকর্ষণই নেই।"

"বিয়ে করিস নি রে ক্যাপটেন?"

"না।"

"তা হ'লে তোর আপিসে তপাকে একটা চাকরি দে। মেয়েটা

শর্টহ্যাণ্ড আর টাইপরাইটিং শিখেছে।' একটু চু'প করে থেকে মাসীমাই আবার বললেন, "বিয়ে হয়েছিল।"

"হয়েছিল মানে কি আন্টি ?"

"স্বামী ওকে ত্যাগ ক'রে গেছে। দোষ অবিশ্যি তপারই।"

"দোষ যত বড়ই হোক, সেই জন্যে ত্যাগ করবে কেন ?"

"করবে না ? বিয়ের কিছুদিন আগে থেকেই তপার মাথা ঠিক ছিল না, কারও সঙ্গে কথা কইত না। যখন কইত তখন আজেবাজে বকত। দেহটা শুকিয়ে আমসীর মত হ'য়ে গেল। স্বভাবটা হ'ল বরফের মত ঠাণ্ডা। কোন রকম উত্তেজনাই ওকে স্পর্শ করতে পারল না। ডাক্তার-বদ্যিরা বলল বিয়ে দিয়ে দাও। মরবার আগে বাপ ওর বিয়ে দিয়ে গেলেন। ভাল পাত্র যোগাড় করলেন তিনি। কোথা থেকে বিয়ের বাবদ টাকাও পেয়ে গেলেন! শুনলাম, বিয়েতে হাজার পাঁচেক তো নিশ্চয়ই খরচ হয়েছে। হ্যাঁ রে, যাওয়ার আগে তুই কি তাঁকে টাকাপয়সা কিছু দিয়ে গিয়েছিলি ?"

"না তো !" অবাক হলেন ক্যাপটেন।

মাসীমা পুনরায় বলতে লাগলেন, "সংসারটা বড় বিচিত্র জায়গা। কোথা থেকে কি হয় কিছুই বোঝা যায় না। লালু যে সেই রাত্রে এখানে আসবে এমন সঠিক খবরটাও তো পুলিস জেনেছিল ! বাড়ীতে ঢুকেই লালু বলেছিল, মা একমাত্র ভগবান ছাড়া আমার আসবার খবর আর কেউ জানে না। এমন বোকা ছেলে কি ক'রে যে তোদের বিরুদ্ধে লড়তে গেল ভেবে আজও আমি আশ্চর্য হ'য়ে যাই। যাক্‌গে সে সব কথা। বিয়ের উত্তেজনাও তপার গায়ে লাগল না। রাত্রিবেলা ওকে জোর ক'রে স্বামীর ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ত। কিন্তু দিলে কি হবে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে অস্থির ক'রে তুলত সবাইকে। তার পর একদিন ওকে স্বামী এসে রক্ষিতের মোড়ে পৌঁছে দিয়ে গেল, স'রে পড়ল সে। বাপ তখন মারা গেছে। না খেতে পেয়ে ভাইবোন উপোস করছে। এদিকে জেটমলও বাড়ী দখলের জন্যে

ব্যবস্থা সব পাকা ক'রে ফেলেছে। কি করি তখন? ভাইবোনকে নিয়ে এলাম এখানে। চিকিৎসার জন্যে কোন ডাক্তার-বদ্যিই আর বাকি রাখি নি। উনি তো বাড়ী বাঁধা দিয়ে জেটমলের কাছ থেকে টাকাও নিলেন। কলকাতার ডাক্তার-বদ্যিদের কি সাংঘাতিক তেষ্টা বাবা! সবটুকু শুষে নিতে বছর দুই লাগল। জেটমলের কোন দোষ নেই। বার বার তিনবার সে টাকা দিয়েছে। বছর তিন পরে সবচেয়ে বড় ডাক্তারটি উপদেশ দিলেন যে, একটি সন্তান না হ'লে এ রোগ ওর সারবে না। উপদেশ যখন দিলেন তখন আমাদের আর টাকা নেই, স্বামীটিকেও খুঁজে পেলাম না। কোথায় কোন আপিসে কাজ করত আমরা তাও জানতাম না। পুরনো বাড়ী সে ছেড়ে দিয়েছিল, তপাও কোন খবর জানত না। কি করব তখন? সন্তান হওয়ার জন্যে তো স্বামী চাই। তা ছাড়া—"

"মাসীমা—" আমার ধৈর্য তখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে। বললাম, "ঘরে এসে ঢুকতে না ঢুকতে সাহেবকে যে অস্থির ক'রে তুললে?"

"তুলব না? অত টাকা মাইনে পায়, তাকে অস্থির করব না তো কাকে করব? থাক বাছা, থাক ওসব কথা। স্মরণশক্তি লোপ পাচ্ছে, এখন না বললে পরে আর কিছুই মনে থাকবে না। ক্যাপটেন, মেয়েটা নিজেই চেষ্টা ক'রে একটা চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে। শ'দুই টাকা মাইনে পাচ্ছে। চেহারাটা ভাল হ'লে আরও কিছু বেশী পেত।"

ক্যাপটেন জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন্ আপিসে চাকরি কর?"

বললাম, "বিলেতী কোম্পানীই। সরকারী চাকরি হ'লে এর অর্ধেক মাইনেতে ঝুলে থাকতে হ'ত।"

"কোম্পানীটার নাম কি তপা?" বিশেষ আগ্রহ দেখালেন সাহেব।

বললাম, "শেলী এণ্ড কুপার প্রাইভেট লিমিটেড।".

আমার ঘাড়ের ওপর হাত রাখলেন ক্যাপটেন। হাসতে হাসতে বললেন তিনি, "সেই কোম্পানীর বড় সাহেব আমিই।"

উত্তেজনার চাপে মাসীমা চোখ থেকে চশমা খুলে ফেললেন। শুধু তাই নয়, ক্যাপটেনের হাতে চশমাটা গুঁজে দিয়ে বললেন, "নে, খাপের মধ্যে ভ'রে রাখ। হ্যাঁ রে মুখপোড়া এতদিন আসিস্ নি কেন? এবার আমি পায়ের ওপর পা তুলে মজা ক'রে খাব—" এই পর্যন্ত ব'লে মাসীমা সত্যি সত্যি চৌকির ওপব পা গুটিয়ে এমন ভাবে বসলেন যে, মনে হ'ল শান্তির স্বর্গ তিনি হাত দিয়ে ছুঁয়েই ফেলেছেন!

ক্যাপটেন বলতে লাগলেন, "এই তো সবে এলাম। প্রথমে বোম্বাই-আপিসটা দেখে দিল্লী গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ভারতবর্ষের আরও অনেকগুলো জায়গা দেখবাব জন্যে বেরিয়ে পড়তে হ'ল। শেলী এণ্ড কুপারেব সাম্রাজ্য তো কম বড় নয় আন্টি। কলকাতার আশপাশেব কারখানাগুলো পরিদর্শন করতেও কম সময় লাগে নি। হেড-আপিসের সবার সঙ্গে তো এখনও পরিচয়ও হয় নি। তপা, তুমি কি আমার নাম শোন নি?"

"শুনেছি। কিন্তু আপনিই যে মিস্টাব হেওয়ার্ড কি ক'রে জানব? চারতলায় আপনার আপিস। আমাদের কাছে সেটা তো নিষিদ্ধ এলাকা। ওপরে ওঠবার এবং নিচে নামবার জন্য আপনার লিফট পর্যন্ত আলাদা। নাম শুনেছিলাম বটে, কিন্তু দেখবার সুযোগ পাই নি।"

"শোন ক্যাপটেন," মাসীমা পা নামিয়ে বসলেন, "তপার ছোট ভাইটা টি-বিতে ভুগছে, তাব চিকিৎসার ব্যবস্থা কর। বলরাম রিফিউজী, তাকে একটা চাকরি দাও। ভদ্রলোকের ছেলে, বাসন মেজে মেজে হাতে ওর ঘা হ'য়ে গেছে। তপার মাইনে বাড়াও, চণ্ডীর জ্যোতিষী ব্যবসা ভাল চলছে না, সারা দেশটা নাকি শিক্ষিত হ'য়ে উঠেছে! কেউ আর গণনায় বিশ্বাস করছে না। তার কি

ব্যবস্থা করবে বল। বিজয়ের মাস্টারীতেও আর সুখ নেই। এম-এ পাস, তাকে কোন্ চাকরিতে বসাবে পরে আমায় ভেবেচিন্তে বলবে। ষষ্ঠী? না থাক, ষষ্ঠীর চাকরির কোন দরকার নেই, ও যা করছে তাই করুক। ওর কোন ভবিষ্যৎ নেই—ষষ্ঠীর প্রায়শ্চিত্তের দবকার আছে। ক্যাপটেন, সবচেয়ে বড় কাজ তোমায় দিলাম—সবচেয়ে বড় কর্ত্তব্য—সবচেয়ে বড় ধর্ম—তপার স্বামীকে খুঁজে এনে দাও। অন্তত তার ঠিকানা বার কর, বাকী যেটুকু করবার তপাই করবে। ওখানে কে রে? বলরাম?"

"হ্যাঁ।"

"আলোগুলো সব জ্বালিয়ে দে। চণ্ডীকে একবার ডাক না রে—ওর গণনা কখনও ভুল হয় না। সরকার-কুঠির ভাঙা ফটক দিয়ে কত বড় সৌভাগ্য আজ ঢুকে পড়েছে। ওবে তোরা সবাই আয়, ষষ্ঠীকে ডাক। শম্ভু? শম্ভু ঠাকুর কোথায়? ক্যাপটেন, সবকার-কুঠিকে বাঁচাও। আমি আর পেরে উঠছিলাম না। পৃথিবীর সব হাহাকার এখানে এসে বাসা বেঁধেছে। মাসীমাব হোটেল তোমারই সৃষ্টি সাহেব। পুব-পশ্চিমেব ব্যবধান স্যুয়েজ খালকে কলুষিত করেছে বটে, কিন্তু গড়িয়ার খালে কোন কলুষ নেই। লালুর রক্তে এর বুকের মাটি ধন্য!" মাসীমা হাঁপাতে লাগলেন, মিস্টার হেওয়ার্ড উঠে গিয়ে মাসীমাকে শুইয়ে দিলেন চৌকির ওপব। তার পর বললেন, "আজ আমি যাচ্ছি—আবার আসব।"

মাথায় ক'রে একঝুড়ি ফল নিয়ে ঘরে ঢুকল বলরাম। মাসীমার দিকে চেয়ে সে বলল, "সাহেবের ড্রাইভার দিয়েছে। রাখব?"

মাসীমা বললেন, "রিফিউজী যখন হয়েছিস বোঝা তোকে বইতেই হবে। বলরাম, এর জন্যে দায়ী ভারতবর্ষের গুটিকয়েক লোক। আর—" কথাটা শেষ করলেন না মাসীমা, চেয়ে রইলেন সাহেবের দিকে।

ক্যাপটেন হেওয়ার্ড বলরামের মাথা থেকে ঝুড়িটা নামিয়ে নিলেন নিজেই।

লেখকের বিবৃতি

॥ এক ॥

"ঠিক শুনেছিস ?"

"হ্যাঁ।"

"আবার বল্ তো—"

"মাসীমা বললেন, ষষ্ঠীব চাকরিব কোন দবকাব নেই—"

"আর কি ?"

"ও যা করছে তাই করুক।"

"তাব পর ?"

"ষষ্ঠীর প্রায়শ্চিত্তেব দবকাব আছে।"

"বলরাম—"

"ষষ্ঠীদা—"

"না, থাক।"

বলরামের হাত থেকে গামছাটা টেনে নিয়ে ষষ্ঠী দত্ত নিজের মুখের ঘাম মুছল। ফাল্গুন সুরু হয়েছে, বসন্তেব ঝিরঝিরে হাওয়ায় একটু আরাম লাগবারই কথা। কিন্তু ষষ্ঠী দত্ত ঘামতে লাগল অপরিমিত ভাবে। খানিক বাদে গামছাটা নিঙড়োতে নিঙড়োতে ষষ্ঠী দত্ত বলল, "মন্দিরটা এবাব শেষ হ'লেই কাজ ফুরোবে।"

"গামছাটা আমায় ফিবিয়ে দাও ষষ্ঠীদা, পুরনো হয়েছে তো। বাঘা যতীন কলোনীব ভোলাদার কথা মনে আছে তোমার ? ওই যে গো, যাব ঘবের খুঁটিগুলো সব মাথায় ক'বে ব'য়ে এনেছিলাম ? ভোলাদা গিয়েছিল হাওড়া-হাটে। ফেববাব মুখে আমাব জন্যে গামছাটা কিনে নিয়ে এল। ভোলাদা দিলখোলা লোক, দান-খয়রাৎ না কবতে পারলে পঁচিশ টাকা মনেব চাল পর্যন্ত তার হজম হয় না। যাদবপুর পোস্ট আপিসে পিয়নের কাজ করে। গামছাটা আমায় দান ক'রে দিয়ে বলল, চ' আমার পোস্ট আপিসে কাজ

শিখবি—” এই ব'লে বলরাম দাঁত দিয়ে ডান হাতের নখ কাটতে লাগল।

চিন্তান্বিত ষষ্ঠী দত্ত যেন ধমকে উঠল, “থেমে গেলি যে ?”

“কি করব, নাপিতকে পয়সা দেব না কি ? দেখছ না, হাত-পায়ের নখ সব কত লম্বা হয়েছে ? গান্ধী কলোনীর দিগম্বর নাপিতকে চেন ? রিফিউজী। রক্ষিতের মোড়ে কাল দেখা হ'ল। বললাম, দিগুদা, এই দেখ হাতের কি হাল হয়েছে। নরুনটা একটু ছুঁইয়ে দেবে ? আমার হাতের দিকে চেয়ে সে বললে কি জান ? বললে, ‘নরুন নেই। তা ছাড়া লোহার নরুন দিয়ে তোর নখ কাটা চলবে না, বিলেতী ইস্পাত চাই।’ এই ব'লে দিগুদা সিল্কের পাঞ্জাবীর পকেটে হাত ঢুকলো। ভাবলাম, ইস্পাত বার করছে বুঝি। তা নয়, সিগারেটের বাক্স বার করল একটা—কাঁচি। আকাশের দিকে ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে দিগুদা বললে, ‘সরকারী আপিসে চাকরির খোঁজে যাচ্ছি, তুই যাবি ?’ জিজ্ঞাসা করলাম, ‘জাত ব্যবসা ছেড়ে দিলে নাকি ?’ ভেংচে উঠে দিগুদা জবাব দিল, ‘জাতের কথা তুলিস নি, সরকারী পয়সা সবাই খাচ্ছে। বামুন রিফিউজীও খাচ্ছে, আমরাও খাচ্ছি। বলরাম, শ্রেণী-সংগ্রাম বড় সোজা কথা নয়। যাবি তো চল।’ আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, ‘তা আমার নখের কি হবে ?’ রাস্তার ওপাশে গিয়ে দিগুদা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, ‘মন্ত্রীদের বাড়ী যা, আপিসে যা, তাঁদের আড্ডায় যা, গিয়ে তাঁদের খামচে দিগে যা।’ ষষ্ঠীদা তুমি তো আমার একটা কথাও শুনছ না—”

“শুনছি না ? তুই তো যাদবপুর পোস্ট আপিসে কাজ শিখতে যাচ্ছিলি রে ছোঁড়া।”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভোলাদা নিয়ে গেল। বললে, ‘আজ অনেক পার্সেল বিলি করতে হবে। বুড়ো হ'য়ে গেছি বলরাম, গামছাটা মাথায় বেঁধে নে। তার পর এই পার্সেলগুলো মাথায় তোল।’ তুললাম। বেলা একটা পর্যন্ত তার পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়ালাম। নাঃ, ওজন তেমন

বেশী ছিল না। কিন্তু রোজই দেখি ভোলাদা আমার মাথায় মোট চাপাতে লাগল। একদিন বাঘা যতীন কলোনী থেকে কেটে পড়লাম। গামছাটা এবার আমায় ফিরিয়ে দাও ষষ্ঠীদা। সাড়ে ছ'আনার গামছা দিয়ে কি অত ঘাম মোছা যায়?"

অন্যমনস্ক ভাবে ষষ্ঠী দত্ত বলল, "মাসীমা তা হ'লে সবই জানেন! মেক-আপের ফাঁকি তিনি দেখতে পেয়েছেন। বলরাম—"

"ষষ্ঠীদা—"

"কোনদিন আমি যদি ম'রে যাই—"

বাধা দিয়ে বলরাম জিজ্ঞাসা করল, "ম'রে যাই মানে কি?"

"শ্মশানে গিয়ে পুড়ে যাওয়া। রিফিউজীর বাচ্চা, শ্মশান দেখিস নি?"

"না।"

"দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলে। গায়ের মাংস, চামড়া, হাড় সব ছাই হ'য়ে যায়। নাভিটা শুধু বদমাইসি ক'রে গোঁ ধ'রে থাকে।"

"ঈশ!" দাঁতের ফাঁক থেকে সবচেয়ে লম্বা আঙুলটা নামিয়ে ফেলল সে, "তার পর কি হয়?"

"তার পর আর কিছু হয় না। যত গোলমাল সব তার আগে। যারা পাপী তাদের দেহ সহজে পুড়তে চায় না। আগুন হচ্ছে গিয়ে সর্বভুক। কিন্তু পাপীর দেহ খেতে আগুনেরও জান কাবার। শ্মশানবন্ধুরা তখন বাঁশ দিয়ে ঘন ঘন গুঁতো মারতে থাকে—"

"ঈশ!"

"ঈশ কি রে বলরাম?"

"হ্যাঁ, ঈশ—আমি শ্মশানে যেতে চাই নে ষষ্ঠীদা।"

"যাবি নে কি, তোর ঘাড় যাবে। তোর বাপ গেছে, মা গেছে, তোকেও যেতে হবে।"

"বড্ড ভয় করছে—"

বিড়ি ধরিয়ে ষষ্ঠী দত্ত বলল, "ভয় নেই। পাপ করিস নে কখনও। আর তোদের ভয়টাই বা কিসের? তোরা রিফিউজী, গোটা সংসারটাই তোদের কাছে শ্মশান। সাড়ে ছ'আনাব গামছা প'রে ধেই ধেই ক'রে নেচে বেড়াচ্ছিস।"

কি একটা কথা মনে পড়ল বলরামের। গামছাটা নিয়ে সে নেমে গেল খালের দিকে। খালের মাটিতে বলরাম আঙুল দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে গর্ত করল একটা। চারদিকে অল্পস্বল্প জল যা ছিল সব এসে গড়িয়ে পড়ল গর্তের মধ্যে। তার পর সে গামছাটা জল দিয়ে ধুয়ে চিপড়ে উঠে এল ওপরে। এসে বলল, "কাল আমি গামছা প'রে শুতে গিয়েছিলাম। ষষ্ঠীদা, জান আজকাল ভোর-রাত্রির দিকে স্বপ্ন দেখি আমি? সমস্ত শরীরটা যেন কেমন ক'রে ওঠে! আগে কিন্তু এমন স্বপ্ন দেখতাম না ষষ্ঠীদা। বাত্রিবেলা তপাদির ঘরে যেতেও ভয় কবে।"

"কেন?" ষষ্ঠী দত্তর বিড়ি প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে।

"সেদিন রাত্রিবেলা তপাদি আমায় ডেকে পাঠালেন। দেখলাম বিছানায় তিনি শুয়ে আছেন—" বলরাম থেমে গেল।

বিড়ির টুকরোটা খালেব দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ষষ্ঠী দত্ত প্রশ্ন করল, অনেকটা শেষ প্রশ্নেব মত, "আর কি দেখলি?"

"তপাদি কি সুন্দর!"

আলোচনা শেষ হ'ল। দু'জন রাজমিস্ত্রি এসে সামনে দাঁড়াল। একজন বলল, "বাবু আমরা এবার নাস্তা খেতে যাচ্ছি। এক ঘণ্টা বাদেই আবার ফিরব। আর এক বস্তা সিমেণ্ট আনিয়ে রাখলে ভাল হয়।"

ষষ্ঠী দত্ত আর বলরাম এক সঙ্গেই গোয়ালের দিকে দৃষ্টি ফেলল।

সরকার-কুঠির পুরনো মাটিতে মন্দির প্রতিষ্ঠা করছে মেক-আপ

ম্যান ষষ্ঠী দত্ত। সেই দিকে চেয়ে বলরাম জিজ্ঞাসা করল, "কি মূর্তি কিনবে? কালীমূর্তি কিন্তু কিনো না ষষ্ঠীদা।"

পরের দিনও স্তপা হোটেল থেকে বাইরে বেরুল না। ছুটির মেয়াদ শেষ হ'তে এখনও বিলম্ব আছে। সুতপা ভেবেছিল, কাল যখন মহীতোষ আসে নি, আজ নিশ্চয়ই আসবে। কিন্তু কই, বেলা তো প্রায় শেষ হ'য়ে এল, মহীতোষ এল কই? যাকে এতকাল অতি সহজেই হাতের মুঠোতে পাওয়া গিয়েছিল, তাকে অনুরোধ ক'রেও এখন আনানো যাচ্ছে না। তবে কি কমরেড হওয়ার দায়িত্ব সে নিতে চাইছে না? সুতপা নিজের ইচ্ছেতেই মহীতোষকে সেদিন "কমরেড" ব'লে অভিবাদন করেছিল। ভেবেছিল, পৃথিবীতে অন্তত একটা মানুষের সঙ্গে ওর পরিচয় হয়েছে, যে ওকে সাহায্য করতে চায়। বিশ্বাস জন্মেছিল, ওর মুখের অন্ন কেড়ে নেবার জন্যে মহীতোষ কোনদিনও চেষ্টা করবে না। করেও নি।

গত কয়েকটা দিনের ছোটখাটো অনেক ঘটনাই ওর মনের মধ্যে এসে ভিড় করতে লাগল। চাকরি থেকে বরখাস্ত করবার জন্যে বড়বাবু কি ভীষণভাবে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিলেন। কাজের ত্রুটি তার কোনদিনই হয় নি। যতখানি মনোযোগ দিয়ে সুতপা এ যাবৎকাল আপিসের কাজ করছে ততখানি মনোযোগ ভাড়াটে লোকের থাকে না। তবু সে বড়বাবুকে খুশী করতে পারে নি। কেন পারে নি? ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে গিয়ে সুতপা শাড়ির আচলটা টেনেটুনে বুকের ওপর তুলে দিতে লাগল। ভেতরটা ওর কেউ দেখতে পায় নি —এমনকি লালু সরকারও না।

শয়নকামরার জানালাটা খুলে দিল সুতপা। জানালার ওপর ঝুঁকে দাঁড়াল সে। বিকেলের সূর্য হেলে পড়েছে পশ্চিম-আকাশে। রৌদ্রের তেজ আর নেই। বুড়ো আমগাছগুলোর পাতার ফাঁক দিয়ে যেটুকু রোদ এখনও ঘাসের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে তার আয়ুও

প্রায় শেষ হ'য়ে এল। মহীতোষ অসুস্থ হ'য়ে পড়ে নি তো? কি জানি, আয়ুর নিশ্চয়তা মানুষের এত বেশী কম যে, ভবিষ্যতের ওপর নির্ভর করা চলে না—মুহূর্তের নির্ভরতাও ধোপে টিকতে চায় না, কোন কিছু আশা করাই ভুল।

ভবিষ্যতের কোন আশাই সুতপার নেই। আশা করার অর্থই হচ্ছে নিরাশার আবর্তে ঘুরপাক খাওয়া। মানবজীবনের সত্য যদি খুঁজতে যাওয়া যায়, তা হ'লে অসত্যের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হবেই। মানুষ যেদিন জন্মেছে সেই দিনই মরেছে। চতুর্দিকের তথাকথিত সত্যেব সঙ্গে বিযুক্তি ঘটেছে তার। ঘটতে বাধ্য। তার নিজের সত্তার সঙ্গে কি সত্তা-হীনতার সংঘর্ষ নেই? আছে, ছিলও এবং থাকবেই।

আরও একটু নিচু হ'য়ে ঝুঁকে দাঁড়াল সুতপা। কাঠের ফ্রেমের ওপর বুকের ভার নামিয়ে রাখল সে। ভেতরেব সত্য গোপন থাক। বাইরে থেকে যারা যা দেখল তার সিকি ভাগও সত্য নয়। সত্যের অবয়বে জখম-চিহ্নের সংখ্যা তারা গুণতে পারে নি।

না, মহীতোষ আজও এল না। প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা হোটেলের পরিবেশে নিশ্বাস টানতে হ'ল। বাইরে বেরুবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠল সুতপা। ছোটসাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। তিনিও ষোল আনা ভারতীয়। ভারত-ভক্তির বক্তৃতা তাঁর মুখেও কম শোনে নি সুতপা। কিন্তু পা দিয়ে মাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা তিনিই বা কম করলেন কি? লক্ষ্মণ গয়লার পায়ের সঙ্গে তাঁর পায়ের কোন তফাৎ আছে কি? উত্তেজনায় সুতপার দেহ ক্রমশই গরম হ'তে লাগল। জেটমলের এতগুলো টাকা ডাক্তারদের পকেটে তুলে দিয়েও সে এক রত্তি গরম হ'তে পারে নি—আজকে সে ভিজিট না দিয়েই গরম হচ্ছে! বিস্মিত বোধ করল সুতপা, বিস্ময়ের মূলে গিয়ে পৌঁছতে চাইল সে।

ঠাণ্ডা দেহের মূলে বোধ হয় লালুদাই ছিল। সরকার-কুঠির সেই

রাত্রিটার কথা মনে পড়ল ওর। লক্ষ্মণ গয়লার খাটালের পেছন দিকের নোংরা পথ দিয়ে সে ছুটে এসেছিল লালুদার সঙ্গে দেখা করতে। দেশভক্তির টানে সে আসে নি। কুমারীজীবনের সবটুকু আকাঙ্ক্ষা সেদিন যেন ওকে টেনে নিয়ে এসেছিল রক্ষিতের মোড় থেকে। অভিসারিকা শ্রীরাধার মনের খবর ওর জানা নেই, কিন্তু সুতপা জানত, লালুদাকে ওর চাই। লুকিয়ে বিয়ে করাব প্রস্তাব সে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছিল। দেহের প্রার্থনা সে মঞ্জুব করাতে চেয়েছিল লালু সবকাবকে দিয়ে। তার পর হঠাৎ সব শেষ হ'য়ে গেল! ভোররাত্রির হাওয়া ওর গায়ে লেগেছিল। শীত-শীত করতে লাগল—খানিকবাদে মনে হ'ল, প্রতিটি রোমকূপে কাঁপন উঠেছে। কি বিচিত্র অভিজ্ঞতা! যজ্ঞের প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ওপর যেন বারিপাত হ'ল। অনুষ্ঠানের বিরাট আয়োজন নষ্ট হ'তে এক মিনিটও লাগল না। সুতপার দেহে কি সেদিন অশ্বমেধযজ্ঞেব বিবাটত্ব ছিল না? আকাঙ্ক্ষার অশ্বটি সেদিন লালু সরকাবও রুখতে পারত না। কিন্তু? কিন্তু কি এক ঠাণ্ডা অসুখের বরফ নিয়ে বাড়ী ফিরল সে। মন আর দেহ দুটোই একসঙ্গে জমাট বেঁধে গেল—ভাসতে লাগল এক খণ্ড হিমশৈলের মত। পাপপুণ্যের প্রশ্ন লোপ পেল সুতপার মন থেকে। সুতপা শুধু সমাজেব 'ভিক্‌টিম' নয়, 'ভিক্‌টিম' সে দেশপ্রেমেরও। মহীতোষ ওর সবটুকু দেখতে পায় নি, হয়তো ক্রমে ক্রমে দেখবে। অস্তিবাদীর সচেতন-অভিজ্ঞতার শূন্যতা স্পর্শ করবে মহীতোষকেও।

বড় ফটক দিয়ে প্রবেশ করলেন ডাক্তার মিত্র। রতনের আজ ইনজেকশন নেওয়ার দিন। বোধ হয় সেই জন্যেই সুতপা এতক্ষণ বাইরে বেরোয় নি। মহীতোষ এল না ব'লে সে নিশ্চয়ই সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘবে ব'সে থাকত না। হয়তো সারাটা দিন সে নিজের মনকে ভাঁওতা দিয়েছে। ছিঃ, সুতপা কেন মহীতোষের এতটা সময় নষ্ট করতে যাবে? মহীতোষ ওর কে? কেউ কারও নয়। মহীতোষ কি চায়? মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে চায়। মানুষ আর ভেড়ার পালের

মধ্যে তফাৎ রাখতে চায় না মহীতোষ। মানুষের দল গড়বে সে। হুঃ, নেই কাজ তো খই ভাজ! ড্রয়ার খুলে সুতপা দেখল, খই যা আছে তাতে ডাক্তারকে পুরো ভিজিট দেওয়া চলবে না, ধার করতে হবে। ধার কেবল ষষ্ঠীদার কাছেই পাওয়া যায়। ষষ্ঠীদাই শুধু ধার দিয়ে ফেরত চায় না। সুতপা নেমে এল একতলায়।

ডাক্তার মিত্রকে সঙ্গে নিয়ে সুতপা যখন ওপরে উঠে এল রতন তখন ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিল। রতনকে পায়চারি করতে দেখে চমকে উঠল সুতপা। রতন কি আরোগ্য হ'য়ে উঠল নাকি? টি-বি রোগ থেকে আরোগ্য হওয়া মানে কি নতুন রোগেব জন্যে অপেক্ষা করা নয়? এই তো ভাল ছিল রতনের, রোগের নির্দিষ্টতা ছিল—জানা ছিল রোগটা টি-বি। যারা ভোগে, অথচ জানে না কি রোগে ভুগছে, তাদের কষ্ট কি সবচেয়ে সাংঘাতিক নয়? এমন রোগীর সংখ্যাই তো পৃথিবীতে বেশী।

ডাক্তার মিত্র একটুও অবাক হলেন না। মুখে তাঁর জয়ের হাসি। টেবিলের ওপরে দৃষ্টি ফেললেন তিনি। বড় একটা এলু-মিনিয়ামের ডেকচিতে নানারকমের ফল রয়েছে। ফলের রং দেখে তিনি বললেন, "বিদেশী ফল। এমন সুন্দর আর টাটকা ফল আমাদের মাটিতে জন্মায় না। আমি তো আগেই বলেছিলাম, ভাল ক'রে খেতে পেলে ছেলেটা সুস্থ হ'য়ে উঠবে।"

সুতপা আঘাত পেল। তাই সে বলল, "দু'শ' টাকা তো মাইনে পাই। তাও বিলেতী কোম্পানী ব'লেই পাই। তা থেকে ডাক্তার, ওষুধ আর দুধের টাকা বাবদ শ'খানেক টাকা খরচ হ'য়ে যায়। বাকি টাকায় হোটেল খরচও কুলোয় না।"

"আপনার মাইনে বাড়াবার ক্ষমতা আমার নেই। আমি ডাক্তার। আমি আমার নিজের শাস্ত্রের কথাই জানি। ছেলেটাকে ভাল ক'রে খেতে দিচ্ছেন, ইনজেকশনও পড়ছে নিয়মিত—"

সূচের মুখ দিয়ে ওষুধ টানতে টানতে ডাক্তার মিত্রই আবার

বললেন, "সাত দিন আগে যে প্লেটটা নিয়েছিলাম, তাতে দেখলাম, রতন অনেকটা ভাল হ'য়ে উঠেছে—প্যাচ ক'মে আসছে। দেখি বাবা রতন, কোমর থেকে কাপড়টা নামিয়ে দাও তো। আরও নামাও, দিদির সামনে লজ্জা কি?"

সুতপা বলল, "কিন্তু, দেখুন—রতন ফল খাচ্ছে তো আজ সকাল থেকে! মাত্র গোটাদুই ফল খেয়েছে—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভাল ফল দুটো ক'রে খেলেই চলবে। হজমশক্তি বাড়ুক তার পর দেখা যাবে।" রতনের উরুর চামড়ায় স্পিরিট ঘষতে লাগলেন ডাক্তার মিত্র।

ইনজেকশন দেওয়া শেষ ক'রে ডাক্তার মিত্র বললেন, "দু' সপ্তাহ পরে আবার একটা প্লেট নেব। এসব অসুখে খরচ একটু বেশীই লাগে। উপায় কি বলুন?"

কোমরে গিঁট বেঁধে রতন বলল, "দিদি, কাল তো ক্যাপটেন সাহেব এসেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে কিছু টাকা ধার চাও না?"

"ধারের টাকায় বাঁচতে ইচ্ছে করে তোর রতন?"

"আমি ভাল হ'য়ে উঠলে চাকরি করব। মাইনের টাকা থেকে ধারের টাকা সব শোধ ক'রে দেব।"

"চাকরি করার মত খারাপ রোগ—ডাক্তার মিত্র, এই যে আপনার ভিজিটের টাকা।" সুতপা কাগজের টাকা ক'টা এগিয়ে ধরল ডাক্তারের দিকে। ডাক্তার মিত্র টাকাগুলো হাতে নিয়ে পকেটে রাখলেন না, একটা লেফাফা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তিনি—লেফাফার মধ্যে ভ'রে রাখলেন ভিজিটের টাকা। তার পর লেফাফাটা গুঁজে রাখলেন ডাক্তারী ব্যাগটার ফ্ল্যাপের মধ্যে। টি-বি রোগের বীজাণুকে ভয় পান না এমন ডাক্তার কলকাতায় নেই। যাওয়ার আগে ডাক্তার মিত্র ব'লে গেলেন, "রতনের অবস্থার যে রকম দ্রুত উন্নতি হচ্ছে তাতে মনে হয়, মাসখানেক পর ওকে কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় পাঠাতে হবে।"

স্বাস্থ্যকর জায়গার স্বপ্ন দেখতে দেখতে রতনের বোধ হয় তন্দ্রা এল। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে স্বতপা বেরিয়ে এল বাইরে, নিজের ঘরে। ঘড়িতে সময় দেখল। ছ'টা বাজতে এখনও বিশ মিনিট বাকি। স্নানঘরে ঢুকে পড়ল সে। চটপট স্নান সেরে বেরিয়ে পড়তে পারলে সাতটার মধ্যে দেওদার স্ট্রীটে গিয়ে পৌছতে পারবে। পৌছনো দরকার। শ্যামনগরে বদলি করবার ক্ষমতা ছোটসাহেবের হাত থেকে ফসকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ক্ষমতা লোপ পেলে হয়তো তিনি খুবই অপমানিত বোধ করবেন। একটা সই বসিয়ে দেওয়ার গর্ব তাঁর থাক। স্বতপা ছাড়া আর কেউ তো ছোট-সাহেবের গর্বটুকু বাঁচিয়ে রাখতে পারে না।

সবিতা দেবী দেওদার স্ট্রীটের বাড়িতে ছিলেন না। শ্যামবাজারে বাপের বাড়ি গেছেন। ছ'দিন সেখানে থাকবার কথা। আগামী-কাল খুব ধুমধাম ক'রে কি একটা পুজো হবে সেখানে। দেওদাব স্ট্রীটে পুজো-পার্বণেব স্ববিধে কিছু নেই। কোম্পানীর বাড়ি ব'লে নয়, লাহিড়ী সাহেবের পুজো-পার্বণের প্রতি বিশ্বাস নেই ব'লেই সবিতা দেবী চ'লে গেছেন শ্যামবাজারে। বাবা তাঁর সাব-জজ—ধার্মিক প্রকৃতির মানুষ। টাকা জমিয়েছেন প্রচুর, পুণ্যের পরিমাণও কম নয়। সাব-জজ অঘোর চক্রবর্তীর 'রায়' প'ড়ে বাদী এবং বিবাদী ছ'পক্ষই নাকি খুশী হয়। অন্তত অঘোর চক্রবর্তীর নিজের ধারণা সেই রকম। মেয়ের প্রথম সন্তান হঠাৎ মারা গেল ব'লে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হ'য়ে পড়েছেন। মেয়ের মনে অশান্তির ঝড় বইছে। আরদালী পাঠিয়ে অঘোরবাবু ভাটপাড়া থেকে ছ'জন ব্রাহ্মণ ডাকিয়ে এনেছেন। অশান্তি দূর করবার মন্ত্র পড়বেন তাঁরা।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, লাহিড়ী সাহেব আজ ঘড়ির দিকে চেয়ে আপিস থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। পাঁচটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে পড়লেন। প্রতিদিনকার মত কেতকী মিত্রকে ডেকে

পাঠালেন না তিনি। কামরা থেকে বেরিয়ে হল-ঘরটা অতিক্রম করলেন মুখ নিচু ক'রে। বড়বাবু চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন। কেতকী মিত্রকে ইশারা করলেন বড়বাবু। কি যে ঠিক এই মুহূর্তে করা দরকার মিস মিত্র তা বুঝতে পারল না। তবু প্রতিদিনকার মত হ্যাণ্ড-ব্যাগটা ঘাড়ের ওপর ঝুলিয়ে দিল সে। দেওয়ার আগে ছোট আয়নায় মুখ দেখল একবার। রঙের টিউবটা ঠোঁটের ওপর ঘষে নিতেও দু'দশ সেকেণ্ড সময় নিল। তার পর লিফটের দিকে ছুটে চলল কেতকী মিত্র। লিফট তখন সবেমাত্র একতলা থেকে উঠতে আরম্ভ করেছে।

কেতকী মিত্র পৌঁছল। জিজ্ঞাসা করল, "এত তাড়াতাড়ি কোথায় চললেন সার?"

"বাড়ি।"

"মিসেস লাহিড়ী তো আজ বাড়ি ফিরবেন না।"

"তুমি কি ক'রে জানলে?"

"ড্রাইভার বলছিল।"

"খোজ নিলে বুঝি?"

ধাক্কা খেলো মিস মিত্র। এমন বাঁকা কথার ধাক্কা সে সহ্য করবে কেন? গত ক'দিনের নিবিড়তার মধ্যে তো এমন ব্যবহার সে পায় নি! পেলে সে যোগ্য জবাব দিতেও ছাড়ত না। কেন দেবে না? মিস মিত্র শুধু যুবতী নয়, সুন্দরীও।

লিফট এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। লাহিড়ী সাহেব দ্বিধা করছিলেন। মুহূর্তের মধ্যে দু'একটা দরকারী কথা মনে পড়ল তাঁর। মিস মিত্রকে একেবারে উপেক্ষা করতে পারলেন না তিনি। বললেন, "এস।"

গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছোটসাহেব যেন আলাপ-আলোচনায় দাঁড়ি টেনে বললেন, "তোমার চাকরি যাতে পাকা হয় তার ব্যবস্থা আমি করেছি। বড়সাহেবের হুকুম পেলেই কাজটা স্থায়ী হবে। আর কিছু বলবে?"

"পাকা যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ বলবার কথা ফুরবে না। ড্রাইভারটাকে যেতে ব'লে দিন না সার।"

ইচ্ছে ক'রেই ড্রাইভারকে ধ'রে রেখেছিলেন লাহিড়ী সাহেব, তিনি ভেবেছিলেন, ড্রাইভার সামনে থাকলে কেতকী হয়তো সত্য কথাগুলো সহজ ভাবে বলতে পারবে না, কিন্তু তেমন ধারণা তাঁর ভুল হয়েছে।

ড্রাইভারকে ছুটি দিতে বাধ্য হলেন তিনি।

ছোটসাহেবের অনুরোধের জন্যে কেতকী অপেক্ষা করল না। গাড়ির দরজা খুলে সে ব'সে পড়ল লাহিড়ী সাহেবের পাশে।

এসপ্লানেড ঘুরে মাস্টার বিয়ুইক বেরিয়ে গেল গঙ্গার দিকে। কেতকী বললে, "এদিকে আমায় নিয়ে এলে কেন?"

"কোন দিকে যেতে চাও?" অন্যমনস্ক ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন তপন লাহিড়ী।

"বাড়ীর দিকে। পাঁচটার সময় ট্রামের ভিড় ঠেলে বালিগঞ্জে পোঁছতে কষ্ট হবে না আমার?"

"ভিড়ের মধ্যেই তো তোমার চলা উচিত। তুমি সুন্দরী, দর্শকেব অভাব তোমার কোন দিনও হবে না। তোমার ঘাড়েব ওপর হাতটা একটু রাখব কেতকী?"

"রাখ।"

"লক্ষ্মীটি, তোমার কাছে যে একটা চিঠি লিখেছিলাম, সেটা কি পুড়িয়ে ফেলেছ?" কেতকীর দিকে হেলে ব'সে প্রশ্ন করলেন ছোট-সাহেব। ডান হাত দিয়ে তাঁর স্টিয়ারিং ধরা ছিল।

কেতকী নির্বিকার ভাবে জবাব দিল, "লোহার সিন্দুকে চাবি দিয়ে রেখেছি। বউদি বাড়ী নেই ব'লে বুঝি তোমার মন খারাপ?"

"খুবই।"

"কিন্তু সেদিন তো মন তোমার খারাপ ছিল না।"

"কোন্ দিন?"

"বাঃ, এরই মধ্যে ভুলে গেলে? আমায় নিয়ে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটে ঢুকলে। গলগল ক'রে মদ খেলে, খাওয়ালেও। তার পর কেবিনের পর্দাটা টেনে দিয়ে আমার পাশে এসে বসলে—তার পর আমার চিবুকের তলায় হাত দিয়ে আমার নিচু মাথাটাকে উঁচু ক'রে ধরলে তুমি—তুমি তপন লাহিড়ী, শেলী এণ্ড কুপার কোম্পানীর ছোটসাহেব। সেদিনের সেই উঁচু মাথাটা আজ কেন নিচু করতে বলছ? আমায় তুমি ফাউ ভেবেছিলে, না?"

"কোন কিছুই ভাবি নি। ভাবব কি ক'রে, মাতাল হ'য়ে গিয়েছিলাম না?"

"তাই বা কি ক'রে বলি? পরের দিন আপিসে এসে বললে, এমন স্বাদ জীবনে কখনও ভুলতে পারব না, কাতু! ভুলতে পারলে আজ তোমায় লম্পট ব'লে সম্বোধন করতাম না। তুমি শুধু ছোট-সাহেব নও, লম্পটও।"

"তুমি কি কেতকী?"

"স্টেনো, আর—"

"থাক, আর তুমি কিছু নও—তোমার ইতিহাস আমি জানি। রাঁচীতে তোমার মা এখনও বেঁচে আছেন—"

"ছোটসাহেব, এইখানে আমায় নামিয়ে দাও।"

স্টোর রোডের মুখে এসে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে দিলেন তপন লাহিড়ী। কেতকী নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। নামল কিন্তু স'রে পড়বার জন্যে সে চেষ্টা করল না। লাহিড়ী সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "আর কিছু বলবে?"

"ভাবছিলাম, একা একা বাড়ীতে তোমার সময় কাটবে কি ক'রে? চল না, ডায়মণ্ডহারবার থেকে ঘুরে আসি? গতকাল তো তুমি নিজেই যেতে চেয়েছিলে।"

"বউ বাড়ী নেই ব'লেই তো আজ আমি সন্ধের আগে ফিরে যাচ্ছি দেওদার স্ট্রীটে। সম্মুখ যুদ্ধে হেরে গেলে নীতির পরাজয় তাতে

হয় না। থাক, এসব কথা তুমি বুঝতে পারবে না। আমি বরং ট্যাক্সিভাড়া দিচ্ছি, মহীতোষদের ইউনিয়নের আপিসটা একবার ঘুরে এস। কাল আপিসে গিয়ে খবর সব শুনব।”

“যাওয়া-আসার ছ'দিকের ভাড়া দিলে যেতে পারি।”

“অনেক দিন ট্যাক্সিতে চাপি নি, কত লাগবে ?”

“ছ'হাজার টাকা মাইনে পাও, হিসেব ক'রে টাকা দেবে নাকি ?”

রাস্তার একধারে গাড়িটা রেখে লাহিড়ী সাহেব ফস ক'রে নেমে এলেন রাস্তায়। এসে বললেন, “কেতকী, দেব, হ্যাঁ তোমায় ছ'হাজার টাকাই দেব, চিঠিটা আমায় ফিরিয়ে দাও।”

জবাব দিল না কেতকী মিত্র। চলন্ত ট্যাক্সি ডেকে সে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভঙ্গীতে উঠে বসল তাতে। মুখ বার ক'রে মিস মিত্র শুধু ব'লে গেল, “চিঠির প্রথম লাইনে তুমি লিখেছ, ডারলিং। ইউনিয়নের আপিসে যাচ্ছি গো, ফিরে এসে খবর সব দোব। স্কাউনড্রেল! চলিয়ে ড্রাইভার—”

লাহিড়ী সাহেব পেছন দিকে চেয়ে দেখলেন, রাস্তার গ্যাসবাতির খুঁটি বেয়ে একটা লোক ওপর দিকে উঠছে।

সন্ধে হয়েছে।

হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, ছ'টার সময় বাড়ীতে জ্যোতিষ আসবেন। জ্যোতিষের নাম চণ্ডী ভটচাজ।

পাঁচ নম্বর ধ'রে স্থতপা গড়িয়াহাটের মোড়ে এসে নামল। একবার সে ভেবেছিল, মহীতোষের খোঁজ করতে ইউনিয়নের আপিসে গিয়ে উপস্থিত হবে। ঘড়িতে সময় দেখল, সাতটা প্রায় বাজে, সেখানে পৌঁছতে আটটা বাজবে। মহীতোষকে হয়তো পাওয়াও যাবে না। তা ছাড়া মহীতোষ যখন কথা দিয়ে কথা রাখে নি, তখন স্থতপাই বা কেন যাবে তার খোঁজ করতে? ইউনিয়ন নিয়ে নিশ্চয়ই সে মেতে আছে। থাক সে মেতে, আজ আর স্থতপা

যেতে পারবে না। হয়তো কাল-পরশুও সে যাবে না। খানিকটা অভিমান-ভরা মন নিয়ে সে উঠে বসল আট নম্বর বাসে। আট নম্বর ধ'রেই দেওদার স্ট্রীটে যেতে হয়।

বাইরের দরজা খোলাই ছিল, ভেতরে ঢুকল সুতপা। সামনেই দোতলায় উঠবার সিঁড়ি। সিঁড়ির পাশে ক'খানা চেয়ার রাখা আছে। প্রথম ঢুকে সেইখানে ব'সে অপেক্ষা করতে হয়। বেয়ারা খবর নিয়ে কিংবা নাম লেখা কার্ড নিয়ে চ'লে যায় ওপরে। সুতপা দেখল, বেয়ারা সিঁড়ির রেলিং ধ'রে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। সতর্ক নজর রেখেছে দরজার দিকে, যেন হঠাৎ কেউ খবর না দিয়ে ওপরে উঠে যেতে না পারে। বিশেষ পাহারার প্রয়োজন ছিল আজ।

সুতপা ভেতরে প্রবেশ করতেই বেয়ারাটি সিঁড়ির পথ রুখে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল, "সাহেব একটু ব্যস্ত আছেন এখন। আপনি কি অপেক্ষা করবেন?"

"হ্যাঁ। কতক্ষণ ব্যস্ত থাকবেন তিনি?"

"জিজ্ঞাসা করব?"

"মেমসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"তিনি শ্যামবাজারে গেছেন। আজ ফিরবেন না।"

চিন্তিত হ'ল সুতপা। সাংসারিক বিপর্যয়ের মাঝখানে বোধ হয় ও এসে উপস্থিত হয়েছে। চ'লে যাবে, না অপেক্ষা করবে? অপেক্ষাই করবে সে। সুতপা কি সবিতা দেবীর কাছে প্রতিশ্রুতি দেয় নি যে, সে তাঁর বন্ধু হবে?

সুতপা সিঁড়ির পাশে ব'সে পড়ল। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চেয়ারগুলির মাঝখানে একটা টেবিল ছিল। টেবিলের ওপরে দৈনিক কাগজ আর কতকগুলি মাসিক পত্রিকা প'ড়ে রয়েছে। বিলেতী টেকনিক্যাল মাসিকপত্রই বেশী, কিন্তু সুতপা লক্ষ্য করল, ওপরের কাগজখানা ফিল্ম-ম্যাগাজিন, এবং সেইটেই যে সবাই এসে মনোযোগ দিয়ে নাড়াচাড়া করে তেমন বিশ্বাস জন্মাতে ওর এক মুহূর্তও লাগল না।

কভারের ওপরে একজন বিলেতী চিত্রতারকার ছবি। চিত্রতারকার মুখ তাতে নেই, শুধু একটা পা গোটা পাতাটা দখল ক'রে রয়েছে। ভাল ক'রে নজর দিয়ে সুতপাও দেখতে লাগল ছবিটি। দেখবার মত পা বটে! হাঁটুর ওপরের অংশটুকু হাত দিয়ে ছুঁতে ইচ্ছে করে। পাতলা চামড়ার তলায় নরম মাংসের অনুভূতি আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। ঝুঁকে বসল সুতপা রায়। ছবিটাব ওপর নখের দাগ! ছোটসাহেবের সঙ্গে তো টেকনিক্যাল লোক ছাড়া অন্য কেউ দেখা করতে আসেন না। কিন্তু টেকনিক্যাল লোকেদের নখের আগায় লোভ থাকবে না, সেই বা কেমন কথা?

বেয়ারাটি সুতপার খবর নিয়ে ওপরে উঠে গেছে। সত্যিই গেছে কিনা ঘাড় বেঁকিয়ে একবার দেখে নিল সুতপা, তার পব শাড়ীর প্রান্ত টেনে তুলল ওপর দিকে। সুতপাব গায়ের রং কালো বটে, কিন্তু মসৃণতায় বিলেতী পায়ের সঙ্গে সে টেক্কা দিতে পারে। ওর মনে আছে, ছেলেবেলায় মা ওকে বলতেন যে, পুরুষমানুষেরা তপার পায়ের সঙ্গে প্রেমে পড়বে। মেয়েদের সৌন্দর্য শুধু মুখেই থাকে না, যে-কোন জায়গায় থাকতে পারে। নিশ্চয়ই পারে, বিলেতী পা-টি কি তার প্রমাণ নয়?

শাড়ীর প্রান্তটা হাতের মুঠোতে ধ'রে বসেছিল সুতপা। প্রতি রোমকূপে উত্তাপ জমছে। কত সহজেই না জমছে! অথচ দশ বছর আগে সরকার-কুঠিটা বাঁধা দিয়েও এক রত্তি উত্তাপ সে সংগ্রহ করতে পারে নি! ত্রিশ বছব পেরিয়ে সুতপা আজ যৌবনের স্বাদ পাচ্ছে।

বেয়ারা ফিরে এল। খবর পৌঁছেছে সাহেবের কাছে। আর পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে বললেন তিনি। সুতপা জিজ্ঞাসা করল, "মেমসাহেব শ্যামবাজারে বেড়াতে গেছেন বুঝি?"

"জী। শুনেছি কাল সেখানে পুজো হবে।"

"কি পুজো?"

"তা আমি বলতে পারব না। মেমসাহেব পুজো করবেন—"

"তোমার সাহেব গেলেন না কেন?"

"কি যে বোলেন আপনি!" হিন্দুস্থানী বেয়ারার মুখে ধিক্কারের ভঙ্গী, "সাহেব হোচ্ছেন গিয়ে—"

"সাহেব হচ্ছেন গিয়ে সাহেব। তিনি কেন দিশী-পুজো করতে যাবেন, এই তো?"

"জী।" বেয়ারার মুখে গর্বের হাসি।

পাঁচ মিনিটও পার হ'য়ে গেল। দৈনিক কাগজখানা এবার টেনে নিল স্মৃতপা। পাতা ওলটাতে ওলটাতে চ'লে এল বিজ্ঞাপনের দিকে। হঠাৎ ওর মনে পড়ল, আজকেই তো সেই বিজ্ঞাপনটা বেরুবার কথা! দেয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারের দিকে চেয়ে তারিখটা একবার মিলিয়ে নিল স্মৃতপা। হ্যাঁ, আজকেই বেরুবে, বেরিয়েছে নিশ্চয়ই। কাগজটা ঠিক আছে তো? হ্যাঁ, এই তো চৌবঙ্গীর দৈনিক। একমাত্র দৈনিক যার 'কলম'গুলো চিনতে ওর দেরি হয় না। হ'লও না দেরি, নোটিশটা বেরিয়েছে—চার লাইনের বিজ্ঞপ্তি। দশ বছর হ'ল স্বামী ওকে ছেড়ে গেছে। কোন খবর তার স্মৃতপা জানে না। বিবাহিত জীবনের কোন কর্তব্য সে পালন করে নি, এবং দায়িত্বও গ্রহণ করে নি। অতএব পনের দিনের মধ্যে কোন খবর না পেলে স্মৃতপা অন্য যে-কোন লোককে বিয়ে করতে পারে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল চণ্ডী ভটচাজ। অবাক হ'ল স্মৃতপা। স্মৃতপা জিজ্ঞাসা করল, "চণ্ডীদা, তুমি এখানে?"

"লাহিড়ী সাহেব আমার মক্কেল। এত রাত্রে তুমিই-বা এখানে কি করছ তপাদি?"

"ছোটসাহেবের সঙ্গে আমার একটু অফিসিয়াল কাজ আছে।"

ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক করবার জন্যে স্মৃতপাই আবার বলল, "চণ্ডীদা, তুমি এইখানে একটু ব'সো। আমার পাঁচ মিনিটের বেশী লাগবে না। তার পর এক সঙ্গেই বাড়ি ফিরব।"

"বেশ, তা হ'লে বসছি।"

বেয়ারাকে সঙ্গে নিয়ে ওপরে উঠে এল সুতপা। ল্যাণ্ডিংয়েব পাশে সেই ছবিখানা টাঙানো রয়েছে। খোকার ছবি। ছবিটাব দিকে মুহূর্তের জন্যে দৃষ্টি ফেলল সে। তার পর চুলের ওপব একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে প্রবেশ করল ছোটসাহেবের ড্রইং-রুমে। বেয়ারা বলল, "একটু বসুন, সাহেব আসছেন।"

একা ব'সে রইল সুতপা। প্রকাণ্ড ড্রইং-রুমটা সেদিন সে ভাল ক'রে দেখতে পারে নি। সবিতা দেবী টেনে ওকে একেবাবে নিয়ে গিয়েছিলেন শোবার-ঘবে। শোবাব-ঘবটির মত, আজও ওর মনে হ'তে লাগল, ড্রইং-রুমটাও যদি সুতপাব হ'ত! জীবনেব ত্রিশটা বছর যেন সে দাঁড়িয়েছিল, বসতে পায় নি। এমন সুন্দর ঘরটিতে সত্যি সত্যি বসা যায়। প্রতি মুহূর্তেব জীবন কেবল বসবার আনন্দেই উজ্জ্বল হ'য়ে উঠতে পারে।

শয়ন-কামরার পর্দা ঠেলে বেরিয়ে এলেন লাহিড়ী সাহেব। অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি? তুমি আসবে আমি তা ভাবতেই পারি নি। তুমি-তো এখনও ছুটিতে আছ?"

"হ্যাঁ। ছুটি আর ভাল লাগছে না। তোমাব দয়া ভিক্ষা করতে এসেছি। তোমাব একটা সই চাইতে এসেছি ছোটসাহেব।"

"সই?" ভুরুর দিকে মণি দুটোকে টেনে তুললেন তপন লাহিড়ী, "সুতপা, আমি দয়ালু নই। তা ছাড়া, অপমান আমি কখনও ভুলে যাই না।"

"তোমায় আমি অপমান করলাম কবে?"

"মহীতোষ তোমার কমরেড, সে খবর আমি রাখি। ভাবছ, মহীতোষকে তুমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী করবে, না?"

"ছিঃ ছোটসাহেব! তোমার মুখে এমন কথা সাজে না। যাক, বেশীক্ষণ আমি বসব না—"

"কেন মহীতোষকে সঙ্গে নিয়ে এসেছ নাকি?" সিগারেট ধরালেন লাহিড়ী সাহেব।

সুতপা দেখল ঈর্ষার তাপ আর আগুনের তাপ ছোটসাহেবের মুখখানাকে বড্ড বেশী রাঙা ক'রে তুলেছে। আলোচনা তাড়াতাড়ি শেষ করবার উদ্দেশ্যেই সুতপা বলল, "শ্যামনগরে আমায় তুমি বদলি ক'রে দাও, ছোটসাহেব। তুমি তো শাস্তি দিতেই চেয়েছিলে আমায়।"

তখ্‌খুনি জবাব দিলেন না তপন লাহিড়ী। ঘন ঘন সিগারেট টানতে লাগলেন। নৈঃশব্দ্য প্রলম্বিত হ'তে লাগল, দেয়াল ঘড়ির পেণ্ডুলামে মুহূর্তগুলো দুলে দুলে ক্ষয় হ'য়ে যাচ্ছে। সুতপা দ্বিতীয়বার অনুরোধ করল, "কালই তুমি সই বসিয়ে দাও। সোমবার শ্যামনগরের আপিসে গিয়ে কাজে যোগ দেব। এই কথাটা বলবার জন্যেই এখানে আমি ছুটে এসেছি।"

"মহীতোষ—"

"মহীতোষের কথা আজ থাক।" সুতপা উঠল, "আমার অনুরোধ তুমি রাখবে সেই ভরসা নিয়েই আমি চললাম।"

"সুতপা, তোমার বদলির প্রস্তাব বাতিল হ'য়ে গেছে। মহীতোষকে বদলি করেছি শ্যামনগরে।"

সুতপার মুখের ওপর যেন চড় বসিয়ে দিলেন লাহিড়ী সাহেব!

"এ তুমি কি করলে, ছোটসাহেব?"

"কেন, গরীব লোক, কুড়ি টাকা মাইনে বেশী পাবে সে।"

"না না, বেশী মাইনের লোভ এতে থাকলেও মহীতোষকে তুমি এখান থেকে সরাতে পার না।"

"ওঃ, এই! গড়িয়ার খালে বিরহের বান ডাকবে বুঝি? ফুঃ!"

"আমায় তুমি যত ইচ্ছে অপমান কর গায়ে লাগবে না, ছোটসাহেব। মহীতোষ ইউনিয়নের সেক্রেটারী। ওরই চেষ্টায় শিশু-ইউনিয়নটি বড় হ'য়ে উঠছে—"

"শিশু-হত্যায় আজ আর আমি পাপ মনে করি নে। তোমরা

সবাই মিলে আমায় ঠকাবে, আর আমি বুঝি—" কথাটা শেষ করলেন না লাহিড়ী সাহেব। নতুন সিগারেট বার করলেন টিন থেকে। আঙুলগুলো তাঁর মুহূর্তের মধ্যে বুঝি কেঁপে উঠল একবার।

সুতপা তাঁর কাছে গিয়ে বলল, "আমি তোমায় ঠকাই নি ছোট-সাহেব। বিশ্বাস কর—"

"বিশ্বাস করব? তোমায়? সবিতার মনে তুমি বিষ ঢুকিয়েছ—"

"সবিতা দেবীব বন্ধু আমি। তাঁর শুশ্রূষার পথ আমাকেই বেছে দিতে হ'ল।"

"বন্ধু? ফুঃ! তুমি সবাবই বন্ধু হ'তে পার, আর আমার বেলাতেই কেবল—"

"তোমারও আমি বন্ধু, ছোটসাহেব।" এই ব'লে সুতপা হেঁটে চ'লে গেল দরজার দিকে। যা ভেবে এসেছিল তার কোন কিছুই ঘটল না। ছোটসাহেবের উঁচু মাথা হেঁট করবার জন্যেই কি সুতপা আজ দেওদার স্ট্রীটে ছুটে আসে নি? শ্যামনগরে বদলি করবার ক্ষমতা যে ছোটসাহেবের নেই তেমন খবরটা তাঁকে পৌঁছে দেওয়াব জন্যে সুতপা গতকাল থেকে ছটফট কবেছে। কোম্পানীর বড়সাহেব ক্যাপটেন হেওয়ার্ড যে ওঁর মুঠোর মধ্যে সেই খবরটাও সুতপা সরবরাহ করতে পারল না, করবাব দরকার হ'ল না। ছোটসাহেব নিজে থেকেই ওর বদলিব প্রস্তাব বাতিল ক'রে দিয়েছেন। মনের জ্বালা ওর নিজে থেকে মিটে গেল ব'লে গোপন-সন্তুষ্টির স্বাদ সুতপা পেলে না। খানিকটা বিরক্তির মনোভাব নিয়ে সুতপা নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে।

গলির পথটা হেঁটে এসে পৌঁছে গেল হাজরা রোডে। সঙ্গে চণ্ডী ভটচাজও ছিল। আসবার পথে কোন কথাই হয় নি তার সঙ্গে। বাসস্টপে পৌঁছে চণ্ডী ভটচাজ বলল, "একটু বেশী রাতই হ'য়ে গেল তপাদি। আট নম্বর বোধ হয় আর পাওয়া যাবে না।"

"কি করতে চাও, তুমি?"

"চল না, পণ্ডিতিয়া রোড ধ'রে রাসবিহারী এভিনিউ পর্যন্ত যাই। সেখান থেকে একেবারে গড়িয়া পৌঁছবার পাঁচ নম্বর পাব। নইলে চল, একটা ট্যাক্সি নিই, গড়িয়াহাটের মোড় পর্যন্ত আর কতই-বা লাগবে ?"

"চণ্ডীদা, আজ রোজগার খুব বেশী হয়েছে বুঝি ?" সুতপা তখন হাজরা রোড পার হ'য়ে পণ্ডিতিয়ায় ঢুকে পড়েছে। চণ্ডী ভটচাজও পার হ'ল বাস্তা। সুতপার কাছে এগিয়ে এসে সে বলল, "আগের কিছু বাকীবকেয়া ছিল। সব মিলিয়ে আজ একটা বড় নোট দিলেন লাহিড়ী সাহেব। একশ'টা টাকা একসঙ্গে পেলাম। তা ছাড়া এ পর্যন্ত গণনা ক'বে যা যা বলেছি তার মধ্যে শতকরা ষাট ভাগ তো মিলেও গেছে।"

"ষাট ভাগ ? একশ' ভাগ নয় কেন ?"

"মিলবে, মিলবে—তপাদি তোমার ভবিষ্যৎ তুমি জানতে চাও না ?"

"চণ্ডীদা, বর্তমানটা এত বিরাট আব জটিল যে ভবিষ্যতের ফল জানবার আমাব লোভ নেই। গোবিন্দপুরে শুনলাম, তোমার স্ত্রী খুব অসুখে ভুগছেন ?"

হোঁচট খেল চণ্ডী ভটচাজ। পণ্ডিতিয়া রোডের রাস্তাটা বড্ড এবড়ো-থেবড়ো। তা ছাড়া বাস্তার আলোগুলো সব জ্বালানোও নেই। সুতপা জিজ্ঞাসা কবল, "লাগল নাকি ?"

"না—চটিজুতো কিনা, পা থেকে বেরিয়ে আসে। গোড়ালিটা ক্ষ'য়েও গেছে, শুকতলাতে পা ঠেকছে এখন। রাস্তার কোন দোষ নেই। করপোরেশনের নতুন মেয়র তো আমার পুবনো খদ্দের।"

"বড় বড় খদ্দের তো তোমার অনেক চণ্ডীদা। কিন্তু নিজের ভাগ্যের রাস্তায় তো সাবাজীবন শুধু হোঁচটই খাচ্ছ। বাচ্চাটা তোমার কেমন আছে ?"

ঢোক গিলল চণ্ডী ভটচাজ। সুস্থ বোধ করবার চেষ্টা করছিল সে,

বোধ হয় করলও। তার পর বলল, "হোমিওপ্যাথি খেয়ে খেয়ে ও ওষুধে আর কাজ হচ্ছে না। দেড় বছর বয়স হ'ল, দেখতে সেই নেংটি ইঁদুরের মত। যা খায় সবই বমি ক'রে ফেলে দেয়। কেবল হোমিওপ্যাথির বড়িগুলো হজম করতে পারে। ভাবছি এবার এলোপ্যাথি ধরাব।"

"এখানে ওদের নিয়ে এস না? মাসীমার হোটেলে যত্ন-আত্তির অভাব হবে না।"

"তা ছাড়া তো অন্য পথ আর দেখছি না, তপাদি। ডাক্তার বরেন সেনগুপ্ত একসময়ে আমার মক্কেল ছিলেন। গোড়াতে গণনা ক'রে বলেছিলাম অনেক পয়সা হবে। হ'লও—এখন বত্রিশ টাকা ভিজিট। ক'বার চেষ্টা করলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করবার, দেখা হ'ল না। আমার নাম শুনেই বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন, ভিজিট দেওয়ার লোক আমি নই। শেষের দিকে গোটাকতক টাকা আমি পাই নি। হয়তো সেই জন্যেই দেখা করেন না—এই যে পাঁচ নম্বর এসে গেছে। এই রোকো, রোকো—ঘোড়ার ডিম, চটিব আব কিছু নেই। ভাল জুতো ছাড়া সরকারী বাসে ওঠাও মুশকিল! আর একটু দাঁড়াও না বাবা—"

বাসে উঠে আর কোন কথা হ'ল না। বাস থেকে নেমে সরকাব-কুঠি পর্যন্ত হেঁটে যেতে হয়, রাস্তা বড় কম নয়।

চণ্ডী ভটচাজ জিজ্ঞাসা করল, "রিকশা নেব না কি তপাদি?"

"না। খরচ না করতে পারলে তোমার মন আজ শান্ত হবে না দেখছি চণ্ডীদা। বড় নোটখানা কাল সকালে বাড়ী পাঠিয়ে দিও।"

কথা বলতে বলতে ওরা গড়িয়ার পোল পর্যন্ত এসে গেল। আর একটু এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকে মোড় ঘুরতে হবে। বড় রাস্তায় পথ খানিকটা বেশী। পোলের পাশ দিয়ে খাল পর্যন্ত নেমে যেতে পারলে তাড়াতাড়ি বাড়ী পৌঁছনো যায়। চণ্ডী ভটচাজ বলল, "চল, শর্টকাট্ ধরি। কাঁচাপথে তোমার কষ্ট হবে না তো তপাদি?"

"না, একটুও না।"

ওরা নেমে এল খাল পর্যন্ত। পথটা স্থতপার অজানা নয়, লালু সরকারের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে সে এই পথ দিয়েই সরকার-কুঠিতে প্রবেশ করেছিল। ডান দিকে লক্ষ্মণ গয়লার খাটালটাও দেখতে পেল স্থতপা—লম্বা ব্যারাকের মত খাটাল, খুবই লম্বা বলা যেতে পারে। স্থতপা দেখল, পর পর দশ-বারোটা ঘরের সামনের দিকে একটা ক'রে হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বলছে। চৌদ্দ-পনের বছর আগে এই দিকটা পুরো অন্ধকারে ঢাকা ছিল ব'লেই মনে পড়ল ওর। পেছন ফিরে স্থতপা জিজ্ঞাসা করল, "মাথা নিচু ক'রে কি ভাবছ চণ্ডীদা? গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান তো সব ওপর দিকে। বড় নোটটা তোমার ঘুম কেড়ে নেবে আজ।"

"না, ঠিক সেই জন্যে নয়, দিদি। লাহিড়ী সাহেবের জন্যেই ভাবছি। টাকা নিলাম, কিন্তু শুভফল কিছু দেখতে পেলাম না। ক'টা মাস বড্ড অশান্তি তাঁর—"

"ক'টা মাসের জন্যে অত বেশী ভাবছ কেন তুমি? যারা ত্রিশ-বত্রিশ বছর ধ'রে অশুভ ফল ব'য়ে বেড়ায়? এই যেমন তুমি, তোমার কথা তো কেউ ভাবে না?"

"আমার কথা কে ভাববে!" চণ্ডী ভটচাজ যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল।

"কেন সমাজ ভাববে—হয়তো ভাবনা সব রাষ্ট্রের।"

"না দিদি, রাজনীতির মধ্যে গিয়ে জড়াতে চাই না। মোদ্দা কথাটা কি বলতে চেয়েছিলাম জান? শনিগ্রহটা বেশ খানিকটা ক্ষতি করবে। অমন সাজানো-গোছানো বাড়ীটা ওলটপালট হ'য়ে যাবে। যাবেই।"

"তাতে লাহিড়ী সাহেবের কি, বাড়ীটা তো কোম্পানীর?"

দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির মুখে এসে স্থতপা বলল, "ঠাকুরকে ব'লে দিও আজ আর আমি খাব না। ওখানে কে রে?"

"আমি।" এগিয়ে এল বলরাম।

"অন্ধকারে ব'সে কি করছিস ?"

"পাহারা দিচ্ছি। মাসীমার শরীরটা ভাল নেই, এখন একটু ঘুমিয়েছেন। ষষ্ঠীদা বলল দরজার কাছে ব'সে থাকতে। মাঝরাত্রে যদি মাসীমার অসুখটা আবার বাড়ে—তপাদি, তুমি বুঝি নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলে ?"

ওপর দিকে উঠে গিয়ে সুতপা জবাব দিল, "হ্যাঁ।"

"তা হ'লে তোমার ভাত কে খাবে ?"

"তুই খে গে যা।"

অন্ধকারে মিশে গেল বলরাম। সুতপা ওকে আর দেখতে পেল না। টাইগার যে বলরামের পেছনে পেছনে ছুটল তার আওয়াজ দোতলার বারান্দা পর্যন্তও উঠে এল।

দরজায় খিল লাগাল সুতপা। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে পারলেই রক্ষা পায় সে। দেওদার স্ট্রীট থেকে ঘুরে আসতে পরিশ্রম বড় কম হয় নি। তা ছাড়া ছোটসাহেবের বাড়ী থেকে বিন্দু পরিমাণ চাপা আনন্দও সে সংগ্রহ ক'রে আনতে পারে নি ব'লেও বোধ হয় মানসিক ক্লান্তির বোঝা ওর বাড়ল। কেন গিয়েছিল সেখানে ? কি সে চেয়েছিল ? ক্যাপটেন হেওয়ার্ড আসবার পরে সুতপা নিশ্চয়ই জানত, ছোটসাহেব পরাজিত। নিজের খুশীমত সুতপা এখন সারা আপিসটায় ঘুরে বেড়াতে পারে। চার তলাব ঘরগুলো ওর কাছে আর নিষিদ্ধ এলাকা নয়। তবে সেখানে যাওয়ার কি দরকার ছিল ? প্রতিশোধ-প্রয়াসী মন ওর নয়। তবে ?

পাঁচ বছরের পেছন থেকে একটা অজ্ঞাত-অস্তিত্ব ভেসে উঠতে লাগল ওর চোখের সামনে। অস্তিত্বটা সুতপার। পাঁচটা বছব সে কাজেব মধ্যে দিয়ে ছোটসাহেবকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করেছে। একদিনও তিনি সুতপার মুখের দিকে চেয়ে দেখেন নি। তাঁর চোখের ভঙ্গীতে উপেক্ষার আর অন্ত ছিল না। নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছিল

সুতপা। তার পর? বিপরীত অবস্থার পরিবেশ শুধু ঘন হ'য়ে আসছে। ছোটসাহেবের দম্ভ টিকল কই? মানুষ কত দুর্বল! পরিণতির দাঁড়ি টানবার ক্ষমতা তার নেই। কিন্তু ছোটসাহেবের দুর্বলতার কারণ তো সুতপা নয়, সবিতা দেবী। দশ বছর বিবাহিত জীবনের ফাঁকিটা ধরা না পড়লে তিনি সুতপার দিকে মুখ তুলে চাইতেন না। তাঁর ভালবাসার মধ্যে কোন বস্তু নেই। একথা সুতপার চেয়ে বেশী আর কে জানে? ঘটনাব সঙ্গে ঘটনা এমন ক'বে বাঁধা রয়েছে যে, সুযোগের মধ্যে পা পড়লেই মানুষ বাধ্য হ'য়ে ভালবাসার কথা বলে। তবে কি ভালবাসা সুযোগের ওপর নির্ভরশীল? হয়তো তাই। এর সামাজিক রূপ ছাড়া দ্বিতীয় কোন রূপ নেই। সুতপা পাশ ফিরে শুল। কোন্ সুখের সংবাদ নিয়ে সে এখন ঘুমতে যাবে? ছোটসাহেব যে মহীতোষকে ঈর্ষা করছেন সেইটাই একমাত্র সত্য সংবাদ। কষ্ট পাক তপন লাহিড়ী। তাঁব ঈর্ষা-জর্জরিত অস্তিত্বেব অংশটুকু হাতেব মুঠোতে ধবতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সুতপা রায়।

কেতকী ট্যাক্সি চেপে সত্যিই ইউনিয়নের আপিসে এল। আপিস-ঘবে তখন সভা বসেছে। মহীতোষের গলা সে শুনতে পেল। বক্তৃতার শেষ অংশটুকুই শুনল সে। মহীতোষ বলছিল, "উনিশ শ' সাতচল্লিশ সালের আগস্ট মাসে দিল্লীর বেতারকেন্দ্র থেকে হঠাৎ আমবা ঘোষণা শুনলাম—ভাবতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। কমরেডস, বিদেশী হাত থেকে শাসনভাব ন্যস্ত হ'ল সংগ্রাম-বিক্ষত দিশী হাতে। কিন্তু আজ দশ বছর পরে দেখতে পাচ্ছি, সেই সব দিশী হাতগুলোতে ক্ষতের চিহ্ন আর নেই। তপন লাহিড়ীর স্পর্ধাও—"

"ইনক্লাব জিন্দাবাদ!" অরিন্দম চেঁচিয়ে উঠল প্রাণপণে। পাগলের মত ছুটে এল মহীতোষের টেবিল পর্যন্ত। টেবিলের ওপর গোটাদুই ঘুষি বসিয়ে দিয়ে সে বলতে লাগল, "মহীতোষদা, আর মিটিং নয়।

জবাব আমরা দেব। শ্যামনগর তুমি যাবে না, যেতে দেব না। ধর্মঘট ছাড়া আমাদের হাতে আর অস্ত্র নেই। তপন লাহিড়ীকে তাড়িয়ে দিতে হবে, এই আমাদের দাবি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।” মঞ্চের ওপর থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল অরিন্দম। কেতকীকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে সে ছুটে এল তার কাছে, বলল, “আপনিও এসেছেন ?”

“কেন আসব না ভাই, আমিও তোমাদের দলের।”

“তবে যে শুনলাম আমাদের ঘরের খবর সব আপনি ছোটসাহেবের কানে পৌঁছে দেন ? আপনি তাঁর স্পাই ?”

লজ্জায় কেতকী মাথা নীচু ক'রে রাখল। জবাব দিল না।

অরিন্দম বার বার ক'রে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, “জবাব দিন, জবাব দিন—”

বাধা দিল মহীতোষ। সে বলল, “ছিঃ অরিন্দম, এ কি হচ্ছে ? এদিকে এস।”

সভা শেষ হ'তে আর বোধ হয় মিনিট পনের লাগল। প্রস্তাব কিছু পাস হ'ল না, তবে ধর্মঘটের কথা নিয়ে খানিকক্ষণ আলোচনা চলল। প্রস্তাবের খসড়া নিয়ে বড়সাহেবের দরবারে যাওয়ার কথাও তুলল মহীতোষ। সাড়ে সাতটার মধ্যেই সবাই চ'লে গেল, কেতকী শুধু তখনও মাথা নীচু ক'রে বসেছিল। মহীতোষ কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, “আপনি যাবেন না ?”

“যাব।”

“অরিন্দমকে ক্ষমা করুন—ক্ষমা করুন আমাকেও।”

“আপনি ক্ষমা চাইছেন কেন ?”

“অরিন্দমের কাছে কথাগুলো বলেছিলাম আমিই।”

“মিথ্যে বলেন নি। সেই জন্যেই লজ্জা পেয়েছি বিষম।” কেতকী উঠে পড়ল। বাইরে এসে ওর নিজেরই খুব অবাক লাগল এই ভেবে যে, সত্য কথা স্বীকার করবার সাহস ওর এল কেমন ক'রে! কলকাতায় পা দেওয়ার পরে কাউকে ও সত্য কথা বলতে শোনে নি।

নিজেও বলে নি কখনও। মুখের কথাগুলো কখন সত্য কিংবা মিথ্যে হবে তার মীমাংসা ক'রে নিতে হয়েছে স্বার্থের যুক্তি দিয়ে। মহীতোষের কাছে সত্য স্বীকারের তো কোন দরকারই ছিল না—স্বার্থ তো ছিলই না। এমন একটা কাজ হঠাৎ ক'রে ফেলেছে কেতকী। মহীতোষের মুখের দিকে একবার সে চোখ তুলে চেয়েছিল। চাইবার পরে ওর কেবলই মনে হয়েছে, শুধু আজ নয়, কোনদিনই মহীতোষের সামনে ও মিথ্যে কথা বলতে পারবে না।

বাইরে বেরিয়ে মহীতোষ জিজ্ঞাসা করল, "কোন্ দিকে যাবেন ?"

"বালিগঞ্জের দিকে।"

"বাস, না ট্রাম ধরবেন ? চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।"

দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে চ'লে এল ডালহৌসি স্কোয়ারের দিকে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কেউ কারও সঙ্গে কথা বলে নি। কেতকী এবার জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কোন্ দিকে থাকেন ?"

"আমি থাকি হ্যারিসন রোডে, হোটেলে।" আরও কিছু বলা দরকার মনে ক'রে মহীতোষ বলল, "বালিগঞ্জে আর কে কে থাকেন ?"

"আমার কেউ নেই। আমাদের এক পরিচিত পরিবারের সঙ্গে থাকি, পেইং গেস্টের মত।"

"মা বাবা কোথায় ?"

"বাবা নেই, দেখি নি তাঁকে। ভাইবোনও আর কেউ নেই, মা থাকেন রাঁচীতে।"

"সেখানে তিনি একা একা থাকেন কেন ? এখন তো আপনার চাকরি হয়েছে। স্থায়ী হ'তেও সময় লাগবে না।"

একটু ভেবে নিল কেতকী, ভাবতেই হ'ল। সত্যিকথা বলবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে ওকে। অভ্যাসের দোষে আধখানা মিথ্যে কথাও বলা চলবে না। কেতকী চুপ ক'রে আছে দেখে মহীতোষ বলল, "পারিবারিক প্রশ্ন তোলা আমার বোধ হয় উচিত হয় নি।"

"খুব উচিত হয়েছে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, আপনার কাছে যা বলব সব সত্য কথাই বলব। পুরনো অভ্যাস বদলাতে একটু সময় লাগছে। তা ছাড়া, আপনার প্রশ্ন শুনে আমি বেশ খানিকটা অবাকও হচ্ছি।"

"কেন?"

"আমাদের পরিবারের দুর্নাম এত বহু বিস্তৃত যে, কেউ কোনদিন আমাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করে না। সহৃদয়তার প্রথম স্পর্শ আপনার কাছ থেকেই পেলাম আজ। থাক সে সব কথা। রাঁচীতে আমাদের একটা বাড়ী আছে—বাবা রেখে গিয়েছিলেন। আমার বয়স তখন ছ'মাস। খুবই বিপদে পড়লেন মা—তার পর তিনি বাড়ীতে পেইং গেস্ট রাখতে লাগলেন। ভালই চলছিল, আজও চলে। লোকের অভাব হয় না।—মাঝখানের ইতিহাসটুকু ভাল না। হয়তো ভাল না।"

"থাক—অনেক রাত হ'য়ে গেছে। এই ট্রামটায় আপনি উঠে বসুন। কাল আসছেন কি ইউনিয়নের আপিসে? আসা কিন্তু উচিত।"

"আসব।"

কেতকী চ'লে যাওয়ার পরেও মহীতোষ অনেকক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল ট্রাম লাইনের ধারে।

॥ দুই ॥

পরের দিন সকালবেলা মহীতোষ এল। সরকার-কুঠির বসবার ঘরেই সে অপেক্ষা করছিল। খবর নিয়ে বলরাম গেছে সুতপার কাছে। এখনও সে ফিরে আসে নি।

দেয়ালের গর্ত দুটোর ওপর দৃষ্টি পড়ল মহীতোষের। গত ক'মাসের মধ্যে গর্ত দুটো আরও বড় হয়েছে। চারদিকে পলস্তারা

যা একটু-আধটু ছিল তাও আর নেই। চ্যাপটা ধরনের ইটের কোনাগুলো বেরিয়ে রয়েছে বাইরের দিকে। পুরনো ইটের মধ্যে খুব বেশী সামর্থ্য না থাকলে এত বড় বাড়ীটা এতদিন পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না। একে ভেঙে না ফেললে এ বোধ হয় নিজে থেকে কোনদিনই ভেঙে পড়বে না। মেসোমশাই একদিন বলেছিলেন যে, মকদ্দমা চলছে। জেটমল এখানে প্রকাণ্ড বড় ম্যানসন তুলবে। ম্যানসন ছাড়া আর কিই-বা এখানে সে তুলতে পারে? ম্যানসনটায় ছোটবড় আকারের ফ্ল্যাট থাকবে অনেক। মধ্যবিত্ত পরিবারদের পরিচ্ছন্ন ভাবে বাস করবার সুবিধা হবে। লোকসান হবে শুধু মেসোমশাই আর মাসীমার।

গর্ত দুটোর দিকে চেয়ে মহীতোষ ভাবল, অন্যদিক থেকেও লোকসান হওয়ার সম্ভাবনা আছে। শহীদ-স্মৃতির প্রতি যদি ভারতবর্ষের শ্রদ্ধা থাকত, তা হ'লে গর্ত দুটোর গভীরতায় জন্ম নিত নূতন ইতিহাস। কিন্তু ভারতবর্ষের বুড়ো ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি এদিকে পড়ল কই? ঝাঁসীব রানীব তরবারির মুখে যাঁরা সরকারী পয়সায় মিথ্যে গবেষণার ধার তুলছেন তাঁরা সরকার-কুঠির ভাঙা দেয়ালের সংগ্রামটুকু দেখতে পান নি। দোষ হয়তো তাঁদের নয়—দোষ সমগ্র দেশের। গর্ত দুটোর গভীরতা অনুভব কববাব জন্যে একটা লোকও নিজের বুকে হাত রাখে নি।

মহীতোষ একটু ন'ড়েচ'ড়ে বসল। সমালোচনার চুল টানতে গিয়ে মাথাটাও এগিয়ে এল, মাথাটা ওর নিজের। সেখানে তো সংগ্রামেব কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই! স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগ দেওয়ার সুযোগ কি সে পায় নি? অন্তত ঘরে ব'সে তো সে অহিংসার চরকা কাটতে পারত। অতীতের দিকে দৃষ্টি ফেলতে গিয়ে ওর মনে পড়ল, প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সে যোগ দেয় নি বটে, কিন্তু ওর মনের দেয়ালে ক্ষতের চিহ্ন স্পষ্ট। সেই ক্ষতটিই তো আজ পরাধীনতার বিষে জর্জরিত হ'য়ে উঠেছে। নইলে ইউনিয়ন গড়বার দরকার ছিল

কি ? মননরাজ্যে পরিভ্রমণ করতে লাগল কমরেড ঘোষ। উজানের স্রোতে স্মৃতির নৌকো ভাসিয়ে দিল সে। উপস্থিত হ'ল এসে উনিশ শ' সাতচল্লিশ খ্রীষ্টাব্দে। হ্যাঁ, বিপ্লবের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য প্রস্তুত ছিল সে। ওর মত ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ যুবক সেদিন তৈরী ছিল জীবন দেওয়ার জন্যে। স্মরণ করতে মহীতোষের কষ্ট হ'ল না যে, সেদিন সবাই ওরা দেখেছিল, বিপ্লবের বাষ্প সবেমাত্র ঊর্ধ্বদিকে গতি নিয়েছে। তার পর হঠাৎ সেই নষ্ট ইতিহাসের ঘোষণা ভেসে এল দিল্লীর বেতারকেন্দ্র থেকে—আমরা স্বাধীন।

দ্বিতীয়বার ন'ড়েচ'ড়ে বসল মহীতোষ ঘোষ। হ্যাঁ, সেদিনের সেই বাষ্পটুকু ফাঁকা আকাশে মিলিয়ে যায় নি। বুকের তলায় ধরা আছে। নতুন বিপ্লবের প্রতিশ্রুতি নিয়ে বাষ্পটুকু ঘন হচ্ছে প্রতিদিন।

বলরাম ফিরে এসেছে—মহীতোষকে ওপরে ডেকে পাঠিয়েছে সুতপা। ওর শয়ন-কামরায় ব'সে গল্প করবার ব্যবস্থা মহীতোষের ভালই লাগল। ব্যবধান আর নেই। এত দিন পর সুতপা নিজেই ব্যবধান সব ঘুচিয়ে দিচ্ছে!

বেরিয়ে এল মহীতোষ। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে লাগল সে। ভবিষ্যৎ-বিপ্লবের কিছু পরিমাণ বাষ্পও আর ওর চোখের সামনে ভাসছে না। সরকার-কুঠির শক্ত সবল মেরুদণ্ডের ওপর হাত রেখে মহীতোষ দোতলায় উঠছে। পুরনো মেরুদণ্ডের সামর্থ্যের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ল ওর। আহা, জেটমল এখানে আধুনিক আঙ্গিকের ম্যানসন তুলবে! আরাম-আয়োজনের অভাব হয়তো থাকবে না, কিন্তু চরিত্রের অভাব ম্যানসনে চিরদিনই থাকবে। এই ভেবে মহীতোষ এসে দাঁড়াল সুতপার ঘরের সামনে।

সুতপা ডাকল, "এস, ভেতরে এস কমরেড। তোমায় বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রাখলাম। বুঝতে পার তো এটা হোটেল। ঘরটা গুছোতে একটু সময় লাগল। চারপেয়ে একটা চেয়ারও খুঁজে আনতে হ'ল তোমার জন্যে। বস।"

"প্রথমে ক্ষমা চেয়ে নিই। সেদিন আসব ব'লে কথা দিয়েছিলাম কিন্তু ইউনিয়নের একটা জরুরী কাজে আটকে গেলাম।"

"এবার ছোটসাহেব বুঝি কোপ বসিয়েছেন তোমার ঘাড়ে?"

"সেজন্যে ভয় নেই, ঘাড় আমার শক্ত আছে। দু'এক জন ছোটসাহেবকে আমি একাই সামলাতে পারব। তুমি তো এখন আর বদলি হচ্ছ না, কাজে যোগ দিচ্ছ কবে?"

"দেখি—" এই ব'লে সুতপা বাইরের দিকে চেয়ে বলল, "তুই এখন যা বলরাম। বাবুর জন্যে এক পেয়ালা চা নিয়ে আয়।—তার পর খবর কি বল? ভবিষ্যতের খবর আমি শুনতে চাই নে—"

"তোমার বর্তমান তো আপাতত ভাল মনে হচ্ছে। কিন্তু ভবিষ্যৎ না থাকলে আমি তো শুধু বর্তমানকে আশ্রয় ক'রে বেঁচে থাকতে পারতাম না।"

"তা বটে। রাষ্ট্রের রাষ্ট্রহীনতা দেখবার স্বপ্ন তোমার আছে। সেই জন্যে সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছ, না?"

"হ্যাঁ।"

"পৃথিবীর সব মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে পার?"

"আদর্শের খসড়ায় তেমন পরিকল্পনার উল্লেখ আছে।" রুমাল দিয়ে মুখ মুছল মহীতোষ। ফাল্গুনের বুকে তাপের মাত্রা আজ অত্যন্ত বেশী। সকালেই এই রকম, দুপুরের দিকে কি হবে বলা যায় না। বলরাম দু' পেয়ালা চা নিয়ে এসে হাজির হয়েছে। টেবিলের ওপর চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রাখতে গিয়ে পিরিচের ওপর খানিকটা চা গেল প'ড়ে। বিব্রত ভাবে বলরাম বলল, "চুলগুলো চোখের ওপর এসে পড়ল, দেখতে পাই নি।"

"এত বড় বড় চুল রেখেছিস কেন?" জিজ্ঞাসা করল সুতপা।

"কি করব তপাদি, সব জিনিসেরই দাম বেড়েছে। চুল কাটতে চার আনা পয়সা লাগে।"

"আমি দিচ্ছি তোকে চার আনা।" উঠে গিয়ে সুতপা পয়সা

বার করতে যাচ্ছিল। বলরাম ব্যস্ত হ'য়ে ব'লে উঠল, "লাগবে না তপাদি, আজ আমি গোবিন্দপুর যাচ্ছি—চণ্ডীদা নিয়ে যাবে। প্রত্যেক দিন কিছু কিছু তার জিনিস আমি নিয়ে আসব। প্রতিবারে আট আনা ক'রে দেবে বলেছে। আসছে রবিবারে চণ্ডীদার বউ এখানে উঠে আসবে। আমার সঙ্গে ফুরন ক'রে নিয়েছে।"

মনের আনন্দে চুলের গোছা দোলাতে দোলাতে বলরাম ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মহীতোষের হাতে চায়ের পেয়ালা তুলে দিয়ে সুতপা বলল, "গোবিন্দপুর এখান থেকে প্রায় মাইল সাত হবে! হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়ল। মেসোমশাইয়ের কাছে তুমি তো সরকার-কুঠির প্রাচীন ইতিহাস খানিকটা শুনেছিলে মহীতোষ?"

"হ্যাঁ।"

"তা হ'লে তো ক্যাপটেনের পরিচয়ও পেয়েছ?"

"পেয়েছি।"

"অনেকদিন আগের কথা—বোধ হয় উনিশ শ' চুয়াল্লিশ সালের গোড়ার দিকেই হবে। মাসীমাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ী আসতেন—রক্ষিতের মোড়ে। রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হ'ত। আমি অবশ্য অংশ নিতাম না। মনে পড়ে, সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে তিনি মাসীমাকে এক দিন বোঝাচ্ছিলেন, 'আন্টি, সব মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে কি করবে? কার বিরুদ্ধে করবে? তার চেয়ে বরং জীবনটাকে অর্গানাইজ করা ভাল—ভাল তা সত্যি যদি ওপরের রহস্যকে বিরুদ্ধপক্ষ ক'রে নাও—' মহীতোষ—"

বাধা দিয়ে মহীতোষ জিজ্ঞাসা করল, "ওপরের রহস্যটা কি?"

"প্রশ্নটা আমার নিজেরও। ক্যাপটেন একটা মন্তব্য করেছিলেন মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন, 'সেই রহস্যের বিরুদ্ধে নয়, তার মধ্যে গিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া চাই।' তুমি কিছু বুঝলে মহীতোষ?"

"না। কিন্তু আশ্চর্য, এই কথাগুলো এত বৎসর পরেও তুমি মনে রাখলে কি ক'রে তপা? কথাগুলো কি খুব বেশী জরুরী?"

একটু হেসে সুতপা জবাব দিল, "স্মরণশক্তির পাগলামী সব সময়ে বোঝা যায় না। কত জরুরী কথা ভুলে গেছি, অথচ এতগুলো বাজে কথা কি ক'রে যে মনে রাখলাম ভেবে আমি নিজেও কম আশ্চর্য হই নি। তুমি আজ আপিসে যাবে না ?"

"কেন, ক'টা বাজল ?" চমকে উঠে মহীতোষ নিজের হাতঘড়িতে সময় দেখে বলল, "হ্যারিসন রোডে আর ফিরব না, এখান থেকে সোজা চ'লে যাব আপিসে। যে কথা তোমায় বলতে এসেছিলুম—"

এই ব'লে মহীতোষ পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার ক'রে প্রশ্ন করল, "দেখ তো, বিজ্ঞাপনটা তোমার দেওয়া নাকি ?"

"হ্যাঁ, কাল কাগজে বেরিয়েছে। দশ বছর পরে বিজ্ঞাপন দিলাম—খুব বেশী তাড়াতাড়ি হ'ল না তো ? তুমি দুঃখ পেলে, না খুশী হ'লে ?"

"অতীতের দাসত্ব তুমি ঘুচিয়ে দিলে—সুতপা, এবার তুমি মুক্ত। আনন্দে কাল রাত্রে আমি ভাল ক'রে ঘুমতে পারি নি।"

উসখুস করতে লাগল সুতপা রায়। আলোচনার সুরটা মহীতোষ হঠাৎ যেন বদলে দিল। মনে হচ্ছে, এবার বুঝি ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাও উঠে পড়বে। তা ছাড়া অতীতের দাসত্বই শুধু অগৌরবের বোঝা বইবে কেন ? বর্তমানের দাসত্বের সবটুকুই কি গৌরবের ? দাসত্ব সব সময়েই দাসত্ব।

সুতপা বলল, "ঠিক করলাম কিনা জানি না, কোনকিছুর সঙ্গেই আমি আর বাঁধা রইলাম না।"

"বাঁধা কি তুমি পড়তে চাও না ? বাঁধা পড়া আর দাসত্ব যে এক অবস্থা নয় তা তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে। আমি এবার চলি।"

"এস।" ওকে ধ'রে রাখবার কোন চেষ্টাই করল না সুতপা। কিন্তু মহীতোষই বা যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছে কই ? সে উঠে গিয়ে পশ্চিমের জানালার কাছে দাঁড়াল। সেখানে দাঁড়িয়ে সে বলল, "গড়িয়ার পোলটা এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়।"

"হ্যাঁ। আমি যখন অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিলাম, তখন এখানে দাঁড়িয়ে থাকতাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। রোজই দেখতাম, ঘাড়ের ওপর ব্যাগ ঝুলিয়ে মেয়েরা সব গড়িয়ার পোলটা পার হচ্ছে। মাসীমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, ওরা সব কোথায় যায়? তিনি বললেন, আপিসে। মেয়েরা যে আপিস করে তা আমি জানতামই না। কথাটা শোনবার পর থেকে আমার মধ্যেও উৎসাহ হ'ল, চাকবি করবার উৎসাহ। এই উৎসাহটুকুই হ'ল আমার জড়তা ভাঙবার প্রথম ওষুধ! তোমার বোধ হয় দেরি হ'য়ে যাচ্ছে—"

"হ্যাঁ, এবার চলি। আচ্ছা রতন কোথায় থাকে? তাকে তো আমি একদিনও দেখতে পেলাম না। কেমন আছে সে?"

"ক্রমশই ভাল হ'য়ে উঠছে। এস।" মাঝখানের দরজাটা খুলে ফেলল সুতপা, মহীতোষ এগিয়ে গেল রতনের ঘবের দিকে।

সুতপা বলল, "রতন, ইনিই হচ্ছেন মহীতোষবাবু।"

মহীতোষ জিজ্ঞাসা করল, "কেমন আছ ভাই?"

"অনেকটা ভাল। দিদি, আমার চেঞ্জে যাওয়াব কি ব্যবস্থা করলে? বড়সাহেবের কাছ থেকে—"

সুতপা কথাটা শেষ করতে দিল না, তাড়াতাড়ি ব'লে ফেলল, "ব্যবস্থা সব ঠিকই আছে, তুই ভাবিস নে। চল, মহীতোষ।"

নিঃশব্দে দুজনেই নেমে এল একতলায়। একটা কথাও আর হ'ল না। বাগানে নেমে গিয়ে মহীতোষ বলল, "মাসীমার শুনলাম শরীরটা ভাল নেই। আজ আর দেখা করতে পারলাম না।"

"সন্ধের পরে আজ কি তুমি আসবে?"

"বোধ হয় আজ আর আসতে পারব না, যদি বাড়ী থাক কাল আসব।"

বড় ফটক পর্যন্ত সুতপা গেল মহীতোষের পেছনে পেছনে।

অন্তরঙ্গতার স্রোত আর সাবলীল নেই। খোলাখুলি ভাবে কেউ যেন কারো সঙ্গে কথা কইতে পারছে না। যা বলছে তার সবই

প্রায় অবান্তর, না বললেও চলত। ফটকের বাইরে গিয়ে মহীতোষ বলল, "শুনলাম, কেতকীকে স্থায়ী ক'রে নেবার জন্যে ছোটসাহেব মিস্টার হেওয়ার্ডের কাছে সুপারিশ করেছেন।"

"ভালই তো, অস্থায়ী কাজে মনের অশান্তি বড্ড বেশী। তোমার কি মিস মিত্রের সঙ্গে আলাপ হয়েছে? মানে আলাপ তো ছিলই—" কথাটা শেষ না ক'রে সুতপা একটু হাসবার চেষ্টা করল।

লজ্জা পেল মহীতোষ, জবাব কিছু দিল না। সামনের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে মহীতোষ দেখল, বড়সাহেবের বেয়ারা কৃষ্ণবল্লভ হনহন ক'রে ছুটে আসছে সরকার-কুঠির দিকে। জিজ্ঞাসা করল সে, "ব্যাপার কি? কৃষ্ণবল্লভ তো বড়সাহেবের বেয়ারা!"

"বোধ হয় মেসোমশাইয়ের কাছে আসছে। তাঁর সঙ্গে বড়-সাহেবের পরিচয় আছে, আমিও অবশ্য চিনি।"

কৃষ্ণবল্লভ সুতপার সামনে এসে হাতটা যথাসাধ্য ভাবে লম্বা করল, তার পর কপালে ঠেকাল হাত। সেলামের সমারোহ শেষ ক'রে সুতপার হাতে একটা চিঠি দিয়ে বলল, "বড়সাহেব জবাব চেয়েছেন।"

খামের ওপর সুতপারই নাম লেখা ছিল, মহীতোষও দেখল নামটা। কি মনে ক'রে সে আর অপেক্ষা করতে চাইল না। বলল, "আচ্ছা, আমি চলি। আমি বরং আজ রাত্রির দিকেই একবার আসব।"

"বেশ তো, এস। মহীতোষ, তুমি শুনলে হয়তো অবাক হবে, চুয়াল্লিশ সালের সেই ক্যাপটেনই হচ্ছেন শেলী এণ্ড কুপার কোম্পানীর বড়সাহেব।"

"আজকাল আর ছবি আঁকেন না?"

"দেখা হ'লে জিজ্ঞাসা করব।"

মহীতোষ আর অপেক্ষা করল না। নানাবিধ মানসিক জটিলতার জট পাকিয়ে সে ধীরে ধীরে হেঁটে চ'লে গেল দৃষ্টির বাইরে। সুতপা

তার দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে সবই দেখতে পেয়েছে। বুঝতেও পেরেছে যে, এতদিন পরে মহীতোষ সত্যি সত্যি বাস্তবের বেলাভূমিতে পা দিয়েছে। সংগ্রাম ওর ঘরের দরজায় অপেক্ষা করছে।

বিপ্লব শুধু জীবনকে পরিচ্ছন্ন করে না, পোড়ায়ও।

ওখানে দাঁড়িয়েই চিঠিখানা পড়ল সুতপা। বড়সাহেব ওকে 'ডিনার' খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছেন। বেয়ারা মারফৎ স্বীকৃতি পেলে তিনি নিজেই এসে ওকে নিয়ে যাবেন। ফিরিয়ে দিয়ে যাওয়ার দায়িত্বও তাঁর। নেমন্তন্ন কোন হোটেলে নয়, বড়সাহেবের নিজের বাড়ীতেই।

ঘরে এসে ভাল ক'রে ঠিকানাটা টুকে নিল সুতপা। স্বীকৃতি জানিয়ে সুতপা তাঁকে লিখল, নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। ফিরিয়ে দিয়ে গেলেই চলবে।

সুতপার বিবৃতি

দশ বছর পরে একখানা ভাল শাড়ি খুঁজতে বসলাম আমি। বিয়ের সময় দু'চারখানা ভাল এবং দামী শাড়ি কিনে দিয়েছিলেন বাবা। কোনদিনও পরি নি, কেনবার সময়েই বাবাকে বারণ করেছিলাম, বাবা তবু কিনলেন। তাঁর মত অবস্থায় মানুষের তো পাগল হ'য়ে যাওয়ার কথা! চার আনার ফুলুরী খেয়েও দিন কেটেছে আমাদের। বিয়ের আগে দেখলাম, বাবা গহনা কিনলেন, কাপড়চোপড়ও কম কিনলেন না। পাড়ার সবাই ভেবেছিল, বাবা বোধ হয় পয়সা দিয়ে একটা কলাগাছও কিনতে পারবেন না। অথচ কলাগাছ না হ'লে হিন্দু মেয়ের বিয়েই বা হয় কি ক'রে? তার পর বিয়ের দিন আরও অনেক কথা প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। বাবা নাকি চার হাজার টাকা নগদ দিয়ে জামাই কিনে আনছেন! পাড়ার রামসদয়বাবু বললেন, 'তবু বলতে হবে এমন কিছু বেশি দাম পড়ে নি। লড়াই থেমেছে বটে, কিন্তু ভাল পাত্রের দাম কমল কই? অপেক্ষা করলে ছেলেটি হাজার দশেকও নগদ পেত।' রামসদয়বাবু নিজেই বোধ হয় হাজার দশেক দিতে প্রস্তুত ছিলেন। যুদ্ধের সময় ঠিকেদারী ক'রে অনেক পয়সা করেছিলেন। তাঁর মেয়ের বয়স আমার চেয়ে এক বছর বেশি ছিল। বিয়ের দিন সকাল বেলায়ই এলেন তিনি। এলেন অনুসন্ধান করতে। তাঁর ধারণা ছিল, বাবা তখনও চার হাজার টাকা যোগাড় করতে পারেন নি। আমার স্বামীর ঠিকানা তিনি জানতেন, দু'দিন আগে লোক পাঠিয়ে খবর নিয়েছিলেন তিনি যে, পাত্রের হাতে তখনও নগদ টাকা গিয়ে পৌঁছয় নি। রামসদয়বাবু সেই থেকে লম্বা কোটের গুপ্ত-পকেটে হাজার দশেক নগদ নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিলেন। অথচ বিয়ের দিন রাত্রে তিনি যখন নেমন্তন্ন খেতে এলেন তখন উপহারের জন্যে হাতে ক'রে নিয়ে এলেন একখানা বই। বইটির নাম ছিল, 'মন্বন্তর'।

কি ক'রে অত টাকা যোগাড় করলেন বাবা, তার জবাব তাঁকে দিতে হয় নি, হাত দুটো তো আগে থেকেই অবশ হ'য়ে গিয়েছিল। বিয়ের দিন শুনলাম, তাঁর জিভেও নাকি জড়তা এসেছে। বাবার সুবিধে হ'ল তাতে, হাজার হাজার প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'ল না। ছবি-আঁকা পিঁড়িতে চেপে যখন ছাঁদনাতলার দিকে রওনা হব, তখন শুধু বাবা একবার কথা বলার চেষ্টা করলেন। আমার কানের কাছে মুখ নামিয়ে তিনি বলেছিলেন, "মা, ছেলেটি ভাল। বাপের কি একটা চার হাজার টাকার ঋণ ছিল। সেই জন্যেই চার হাজারের ওপরে একটা পয়সাও সে বেশি নিল না। বামসদয় তো আজ সকালেও হাজার দশেক দেওয়ার জন্যে সেখানে দালাল পাঠিয়েছিল।"

এর পরে বাবার মুখ থেকে আর একটি কথাও শুনি নি। মরবার দিন পর্যন্ত তিনি নীরব ছিলেন। অবিশ্যি আমার নীরবতাও ছিল সে সময়কার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বিয়ের পরেও আমি কথা কই নি। স্বামীর ঘরে ঢুকতে আমার ভয় করত, নাগপুর থেকে আমার এক ননদ এসেছিলেন আমার ভয় ভাঙাবার জন্যে। প্রথমে স্বামী সন্দেহ করেছিলেন আমি সম্ভবত অন্য কোন পুরুষমানুষকে ভালবাসি। আমি বুঝতাম, মনে মনে তিনি কষ্ট পাচ্ছেন। আর দেহের কষ্ট যে তাঁব প্রতিদিন সহ্যের সীমা অতিক্রম করছে তা তো জানা কথা। ননদের কোন তুকতাকই কাজে লাগল না। বক্তৃতা দিয়ে ভেতরের রহস্য সব বোঝাবার তিনি কম চেষ্টা করেন নি। কাপড় পরবার অজুহাতে সবরকম খুঁটিনাটির দিকেও তিনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু স্বামীর ঘরে ঢুকলেই আমার কান্না পেত। কেঁদেছিও আমি। পাড়ার মেয়েরা ননদকে দু'এক দিন জিজ্ঞাসা করেছে, "নতুন বউকে তোমার ভাই মারধোর করেন নাকি ?"

শেষ পর্যন্ত এঁরা সবাই বুঝতে পারলেন, আমার পেছনে কোন ব্যর্থ প্রেমের জটিলতা নেই, আমি অসুস্থ। ঠাণ্ডা ব্যাধিতে ভুগছি

আমি। ডাক্তাররা কেউ কেউ বললেন, এর পরে আমি হিস্টিরিয়া রোগে ভুগব। অবিশ্যি তাঁদের কথা ঠিক হয় নি। বিয়ের পরে এমন বউকে নিয়ে কেউ তো ঘর করতে চায় না—আমার স্বামীও চাইলেন না। তিনি মানুষ, ধৈর্য হারিয়ে অস্থির হয়ে ওঠা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিকই হ'ল। ফিরে এলাম বাবার কাছে। গহনাগুলো সঙ্গে নিয়েই এসেছিলাম। সেগুলো বেচে চাল-ডাল কিনতে লাগলাম আমি। ওষুধ কেনবার জন্যে একটা পয়সাও খরচ করতে হয় নি। বাবা এক ফোঁটা ওষুধও খাবেন না ব'লে শয্যা নিয়েছিলেন। মেয়ে-বিয়ের সামাজিক কর্তব্য পালন করবার পর আর কোন কর্তব্য পালনের চেষ্টা তিনি করেন নি। সময় যখন এল তিনি চোখ বুজলেন। আমার চেয়েও বেশি বিপদে পড়লেন জেটমল মারোয়াড়ী। তাঁর কাছে বাড়ী বাঁধা রেখেছিলেন বাবা। এখন তাঁর টাকা শোধ করবার লোক রইল কে? তা ছাড়া এত বেশি টাকা নাকি তাঁর কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল যে, অমন বাড়ী দু'খানা বেচলেও উদ্বৃত্ত কিছু থাকবে না! আধুনিক রাজপুতনার ইতিহাসে লাভ-লোকসানের হিসেবটাই উজ্জ্বলতম অধ্যায়। মকদ্দমা রুজু করলেন তিনি।

আজ একটা ভাল শাড়ি পরবার জন্যে ট্রাঙ্কের ডালা খুলে বসলাম। জর্জেট একটা হাতে ঠেকল। কালো জমিনের ওপর নানা রঙের লতাপাতার প্রিণ্ট। বাবার পছন্দ খুব খারাপ ছিল না। সাজতে-গুজতে অনেক সময় নিলাম আজ। জানি, সাজবার কোন দরকার নেই। নতুন ক'রে ক্যাপটেনকে কিছু দেখাবারও ছিল না, তবুও যত্ন নিয়ে সাজলাম আজ।

যেতে হবে লুডন স্ট্রীটে। ঠিকানা লেখা কাগজের টুকরোটা ব্যাগের মধ্যে ভ'রে রাখলাম। রতনকে ব'লে গেলাম ফিরতে দেরি হবে আজ, নইলে রতন হয়তো জেগে ব'সে থাকবে। সন্ধে সাড়ে ছ'টা হ'ল।

নিচে নেমে এলাম। এটা হোটেল, আর কাউকেই জানিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই—এমনকি মাসীমাকেও নয়। এই ভেবে বাগানের রাস্তায় নেমে পড়তে যাচ্ছিলাম, বলরাম এসে সামনে দাঁড়াল। সারা দুপুরটা হেঁটে হেঁটে সে এইমাত্র গোবিন্দপুর থেকে এসে পৌঁছল।

বলরাম বলল, "বাক্সটা একটু ধরবে, তপাদি ?"

মাথার ওপরে রং-চটা একটা বত্রিশ ইঞ্চি মাপের টিনের ট্রাঙ্ক। তার ওপরে শতরঞ্জি দিয়ে বাঁধা মস্ত বড় একটা বিছানা। তার তলায় গোঁজা রয়েছে দু'খানা মাদুর। ট্রাঙ্কের হাতল দুটো দেখলাম এখনও খুলে পড়ে নি। হাতলের সঙ্গে দুটো মগ আর তিনটে কাঁসার ঘটি নারকোলের দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছে। সম্ভবত ব্যালান্স রাখবার জন্যেই চণ্ডীদা অন্য দিকের হাতলটাও খালি রাখে নি, বেশ বড় সাইজের একটা পেতলের কলসী দিয়েছে বেঁধে। ভাল ক'রে নজর দিতে গিয়ে বুঝতে পারলাম, কলসীটা শূন্য নয়। বলরাম বলল, "এতে গঙ্গাজল আছে, তপাদি। বউদি ছুটে গিয়ে ভটচাজদের গঙ্গা থেকে এক কলসী জল নিয়ে এলেন। বললেন, হোটেলের ঘরে হাজার জাতের যাওয়া-আসা। মাল ঢুকবার আগে ঘরটা ধুয়ে দিতে হবে। তুমি আজ সেজেছ কেন, তপাদি ? ষষ্ঠীদা বুঝি মুখে তোমাব রং মাখিয়ে দিলে ?" চোখের ওপর থেকে লম্বা চুলের গোছা ঠেলে ঠেলে পেছন দিকে সরিয়ে রাখল সে।

বললাম, "বড়সাহেবের বাড়ী যাচ্ছি। শম্ভুঠাকুরকে বলিস, রাত্রে খাব না। হ্যাঁ রে, চণ্ডীদা পয়সা দিয়েছে ?"

"না। বললে যে, ফুরনে যখন কাজ ধরেছি তখন সব মাল না নিয়ে এলে পয়সা পাব না। রবিবার দিন একসঙ্গে দেবে। তপাদি, শম্ভুঠাকুরকে একটু ব'লে যাও না—"

"কি ? কি বলব রে, লক্ষ্মীছাড়া ?" মুহূর্তের মধ্যে একটা কাণ্ড ক'রে বসলাম !

রাগ সামলাতে না পেরে বলরামের গালে ঠাস ক'রে একটা চড় বসিয়ে দিলাম। তার লম্বা চুলের গোছা ধ'রে টানতে টানতে নিয়ে এলাম রান্নাঘরে। বললাম, "আহাম্মক, দুনিয়াসুদ্ধ লোকে ঠকিয়ে ঠকিয়ে হদ্দ ক'রে দিচ্ছে, বুঝতে পারিস না? ষষ্ঠীদা ঠিকই করে। তোকে গাল দেয়, রিফিউজীর বাচ্চা বলে।"

"না, গাল দেয় না। ষষ্ঠীদা আমায় ভালবাসে।"

"ভালবাসে? চড় খেয়েও বাঙালের গোঁ যায় না দেখছি! ভালই যদি বাসে, তবে খাওয়ার বায়না সব আমার কাছে কেন? যা না ষষ্ঠীদার কাছে, যা না খাদ্যমন্ত্রীর দরজায়—আমি তোর কে? বল লক্ষ্মীছাড়া, আমি তোর কে?"

"তুমি আমার তপাদি। মারতে গিয়ে হাতে ব্যথা পেলে বুঝি?"

"না।"

"তবে কাঁদছ যে? অত জোরে মারতে গেলে কেন?"

"মারব না? বেশ করব। তোর মত আহাম্মককে সবাই মারবে। বাঙাল কোথাকার! তোর জন্যে কাঁদব, না ছাই!"

এই ব'লে একটা পাঁচ টাকার নোট ওর পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এলাম রান্নাঘর থেকে।

মুখের পাউডার চোখের জলে গ'লে গিয়েছিল। আয়নায় দেখলাম, ছাতলার মত জায়গায় জায়গায় পাউডার সব জ'মে রয়েছে। বাড়ী থেকে বেরুতে দেরি হ'য়ে গেল। যে মন নিয়ে বড়সাহেবের বাড়ী যাচ্ছিলাম 'ডিনার' খেতে সে মন আর রইল না। সারাটা পথ ব'সে ব'সে শুধু ভাবলাম, বলরামকে সঙ্গে নিয়ে এলেই হ'ত। আমি আর কতটুকু খাব, টেবিল থেকে সব খাবারই তো বাবুর্চিখানায় ফিরে যাবে। যাদের ঘরে প্রচুর খাবার আছে এবং যারা অপরকে খাওয়াতেও চায়, তারা কেন বলরামকে নেমন্তন্ন করে না?

বড়সাহেব বাইরের গেটের সামনেই অপেক্ষা করছিলেন।

জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, "বাড়ীটা খুঁজে বার করতে দেরি হ'ল নাকি ?"

"না—একবারেই পেয়ে গেলাম।"

দোতলায় উঠতে উঠতে তিনি বললেন, "আপিস থেকে বেরুতে আজ খুবই দেরি হ'য়ে গেল। ফিরেছি বোধ হয় মিনিট দশেক আগে।"

দেখলাম, আপিসের পোশাক তাঁর পরাই রয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, "এত দেরি হ'ল যে ?"

"কর্মচারী ইউনিয়নের ছেলেরা সব এসেছিল দেখা করতে। তাদের কথা সব শুনতে হ'ল।"

"সিদ্ধান্ত কিছু দিতে হয় নি তো ?" কায়দা ক'রে অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়লাম আমি।

"না—গুরুতব ব্যাপার কিছু নয়। তবু ডিসিশন নিতে একটু সময় লাগবে। থাক, আপিস থেকে বেরিয়ে আপিসের আলোচনা আর ভাল লাগে না। ছবি আঁকার কাজই আমার ভাল ছিল। এ সব কাজে ঝঞ্ঝাট অনেক—"

"মাইনেও তাই পাঁচ-দশ হাজার—।" হঠাৎ থেমে গেলাম।

বড়সাহেব হেসে ফেললেন। ড্রইং-রুমের ভেতরে গিয়ে বললেন তিনি, "তুমি এখানে ব'সে কফি কিংবা চা খাও। চট ক'রে আমি আপিসের কাপড়টা বদলে নিই। ওখানে অনেক দেশের অনেক রকমের ম্যাগাজিনও আছে। কৃষ্ণবল্লভ—"

"জী—" ভেতরে ঢুকল কৃষ্ণবল্লভ সিং।

"মেমসাহেবকে কফি—"

"কফি আমি খাই নে ক্যাপটেন।"

"তা হ'লে চা দাও। আর কি খাবে ? বেয়ারা—" ঘুরে দাঁড়িয়ে বড়সাহেব বললেন, "মিঠাই আনবার কথা ছিল—"

"আনা হয়েছে হুজুর।"

"ভেরি গুড। লে আও।"

"এখন শুধু চা-ই খাব।" বললাম আমি।

"বেশ, বেশ—আমি তা হ'লে আসছি।" বড়সাহেব পর্দা ঠেলে ভেতর দিকে চ'লে গেলেন। কৃষ্ণবল্লভ গেল অন্য দিকে, অন্য দরজা দিয়ে।

আমাদের সবকার-কুঠির দু'খানা ঘরের সমান হবে বড়সাহেবের ড্রইং-রুমটা। জানালা-দরজার সংখ্যাও বড় কম না। প্রত্যেকটা জানালা ও দরজার ওপর থেকে পাতলা লেসের পর্দা টাঙানো। দু'দল লোক একসঙ্গে ব'সে যেন গল্প করতে পারে তার ব্যবস্থা রয়েছে। ঘরের দু'দিকে দু'সেট সোফা। পর্দা, সোফা আর দেয়ালের রং একই রকম—হল্‌দের মধ্যে ঈষৎ গোলাপী মেশানো। ঘরের চার কোণায় চারটে টেবিল, বড় নয় মাঝারি সাইজের। প্রত্যেকটা টেবিলের ওপর একটা ক'রে টেবিল-ল্যাম্প। ল্যাম্পের শেডগুলোও সব একই রঙের, পর্দার সঙ্গে ম্যাচ করানো। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, ঘরের কোথাও কোন ছবি নেই। দেয়ালগুলি ফাঁকা। দেখলাম, দু'একটা নামহীন জংলী পোকা শুধু আলোর আকর্ষণে দেয়ালের ওপর উড়ে এসে বসেছে। বোধ হয় লুডন স্ট্রীটের সেই অপরিষ্কার পার্কটাতে এদের আদি বসতি ছিল। আমি উঠে পড়লাম।

দক্ষিণ দিকের টেবিলটার দিকে হেঁটে গেলাম আমি। একগাদা ম্যাগাজিন উঁচু ক'রে সাজানো রয়েছে। তারই পেছনে দেখলাম, ফ্রেমে-বাঁধানো একটা ছবি। সামনের দিক থেকে ছবিটা দেখা যায় না।

বছর পনের-ষোল বয়সের একটি চীনা ছেলে। বুকের ছাতি খুবই চওড়া। গোল-গলার উলের গেঞ্জি পরেছে ব'লেই বোধ হয় বুকটাকে অত বেশি চওড়া দেখাচ্ছে। মাথার ওপর কালো রঙের স্পোর্টস ক্যাপ বসান। মাথায় তার এত বেশী চুল যে, টুপির তলা থেকে চুলের গুচ্ছ বেরিয়ে পড়েছে সামনের দিকে। চীনদেশের ছেলে, সে সম্বন্ধে ভুল করবার কোন কারণই নেই।

এরই মধ্যে কৃষ্ণবল্লভ চা নিয়ে এসেছে। সাজিয়ে দিয়েছে চায়ের সরঞ্জাম। আমি টেরই পাই নি, টের পাওয়ার কথাও নয়। সারা মেঝে জুড়ে পুরু কার্পেট পাতা। কৃষ্ণবল্লভ যখন আমাব পেছনে এসে দাঁড়াল, তখন আমি ফোটোখানা হাতে তুলে নিয়েছি। সে ডাকল, "মেমসাহেব—"

"ও, তুমি!" নামিয়ে রাখলাম ফোটো। কিছু একটা তাড়াতাড়ি বলতে হ'ল, জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি কি সাহেবের বাড়ীতেও কাজ কর নাকি?"

"জী না, শুধু আজকেই এসেছি। কাউকে নেমন্তন্ন করলে সাহেব আমাকেও ডাকেন।"

"ও, বেশ।" টেবিল থেকে একটা ম্যাগাজিন তুলতে গিয়ে দেখলুম প্রথমখানাই চীনদেশের কাগজ। কভারের ওপরে একটা ছবি রয়েছে। ছবিটার সঙ্গে ফোটোখানার কি অদ্ভুত সাদৃশ্য! সবকিছু কেমন যেন গুলিয়ে গেল। স'রে এলাম সেখান থেকে। হয়তো আমারই ভুল হ'ল। ভুল? না, আমি ঠিকই দেখেছি।

কৃষ্ণবল্লভ তখনও দাঁড়িয়েছিল সেণ্টার টেবিলের পাশে। চা ঢালতে ঢালতে জিজ্ঞাসা করলাম, "ফোটোখানা কাব?"

মনে হ'ল, ঠিক এই প্রশ্নটা শোনবাব জন্যেই সে অপেক্ষা করছিল এবং জবাবটাও ঝুলছিল তাব ঠোঁটের বাইরে। কৃষ্ণবল্লভ বলল, "হামি ঠিক জানি না, তবে শুনেছি, সাহেবের লেড়কা, বিলাইতে পঢা শিখছে।"

"লেড়কা?" ধাক্কা খেলাম যেন! চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে বললাম, "ও তো চীনা ছেলের ফোটো?"

"হা হা, সো তো আপনি ঠিকই বোলিয়েছেন। মগর শুনতা হায়, উনিকো লেড়কা। আচ্ছা মেমসাব, হামি বাবুর্চিখানায় যাচ্ছি, দোরকার হ'লে ডাকবেন। রোসগোল্লা খাবেন মেমসাব?"

"না।"

চ'লে গেল কৃষ্ণবল্লভ।

ব'সে ব'সে আকাশপাতাল ভাবতে লাগলাম আমি। এযাবৎকাল যা ভেবেছি তার কেন্দ্র ছিল আমার নিজের মধ্যেই। বাইরের ঘটনা আমায় স্পর্শ করতে পারে নি। যে ঘটনার সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ নেই তার প্রতি আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। আজ বোধ হয় এই প্রথম পুরনো অভ্যাস ছাড়তে হ'ল আমায়। আমি একেবারে নিঃস্বার্থ ভাবে বড়সাহেবের কথাই ভাবছি। শেলী এণ্ড কুপার কোম্পানীর বড়সাহেবদের পুরনো বেয়ারা কৃষ্ণবল্লভ সিং। তার কথা হেসে উড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব, আমি অন্তত পারি নে। হাজার হ'লেও আমি তো ওই কোম্পানীর একজন সাধারণ স্টেনো-টাইপিস্ট। কৃষ্ণবল্লভের চেয়ে মাইনে আমার বেশি বটে, কিন্তু মর্যাদা আমার কম।

বড়সাহেব এলেন। 'ডিনার' খাওয়ার বিশেষ পোশাক তিনি আজ বর্জন করেছেন দেখলাম। স্যাটিন কাপড়ের সাদা ট্রাউজার আর নীল রঙের বুশ শার্ট পরেছেন তিনি। শেলী এণ্ড কুপার কোম্পানীর বড়সাহেব ব'লে আর তাঁকে চেনা যাচ্ছে না। বুঝলাম, লোকটিকে চিনতে সময় লাগবে।

মুখোমুখি হ'য়ে বসলাম আমরা। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "চা খেলে না যে?"

"চা খেতে ভুলে গেছি, মনেই ছিল না। তা ছাড়া ঠাণ্ডা চা খেতেই আমি ভালবাসি।" পেয়ালাটা তুলে নিলাম হাতে।

"ঠাণ্ডার প্রতি আকর্ষণ তোমার গেল না—" পাইপটা দাঁতের ফাঁকে ধ'রে রেখে ক্যাপটেন জিজ্ঞাসা করলেন, "আন্টি কেমন আছেন?"

"ভাল নেই।" জবাবটা সত্য হ'ল কিনা জানি না। আমি নিজে গিয়ে এখনও একবার মাসীমার খোঁজ নিই নি। আত্মকেন্দ্রিক মনন-রাজ্যে বাইরের হাওয়া ঢুকছে। আবদ্ধ-অর্গল খোলবার যে লোভ একটু হচ্ছে না অস্বীকার করি কি ক'রে?

"ক'টার সময় খাও?" জিজ্ঞাসা করলেন বড়সাহেব।

"ঘড়ি মিলিয়ে খাওয়ার অভ্যাস আমার নেই। তুমি যখন বলবে তখনই খাব।"

"আচ্ছা সুতপা—" পাইপ নিবে গিয়েছিল, "আচ্ছা সুতপা, এই কোম্পানীতে কতদিন চাকরি করছ তুমি?"

"পাঁচ বছর হ'য়ে গেছে।"

"ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত ঠেকছে আমার। সেই রক্ষিতের মোড় থেকে লুডন স্ট্রীট—কি ভীষণ পরিবর্তন! কি ভীষণ বিপ্লব!"

"বিপ্লব কোথায় দেখলে তুমি?"

"বিপ্লব নয়? তোমার বিয়ে হ'ল, অথচ—"

"অথচ স্বামী হারিয়ে গেল, এই তো? যুদ্ধের সময় তো হাজার হাজার মেয়ে স্বামী হারিয়েছে! তাতে পৃথিবীর কি ক্ষতি হ'ল? আমারও হয় নি।"

"কিন্তু তোমার স্বামী তো যুদ্ধে প্রাণ হারান নি?"

ঠাণ্ডা চাটুকু এক চুমুকে খেয়ে নিলাম আমি। নিয়ে বললাম, "যুদ্ধ শুধু জলে, স্থলে এবং আকাশে হয় না। প্রতিটি মানুষ নিজের মনের মধ্যেও যুদ্ধ করে। তার বাহ্যরূপ কিছু নেই। কিন্তু ভিকটিম আছে। যেমন আমার স্বামী।"

মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন বড়সাহেব। বললেন তিনি, "ভূমিকাটুকু ভাল। পরে আরও শুনব। চল, খেয়ে নিই।"

ডাইনিং রুমে উঠে এলাম আমরা। টেবিলে ব'সে বড়সাহেব বললেন, "জানি না, রান্না তোমার পছন্দ হবে কিনা। দিশী, বিলিতি দু'রকমই আছে।"

জবাব দিলাম না। মনে মনে ক্যাপটেনের হ'য়ে আমি বোধ হয় বলরামকে ডাকছিলাম। একটু বাদেই চমক ভাঙল আমার। যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। সুপ, ফিশফ্রাই থেকে কোর্মা কাবাব কিছুই বাদ যায় নি। বেছে বেছে খাওয়ার সুবিধে ক'রে দেবার জন্যে বড়-সাহেবের হুকুমমত সব খাবারই টেবিলের ওপর সাজিয়ে দিল কৃষ্ণ-

বল্লভ। নানা রকমের ঘ্রাণ একসঙ্গে টানতে সুবিধে হ'ল বটে, কিন্তু গোটাতিনেক আইটেমের বেশি খেতে পারলাম না। খাওয়ার দিকে মনোযোগ ছিল না আমার। চীনা ছেলেটির মিষ্টি মুখখানা মাঝে মাঝেই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। ভাসিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলাম আমিই। বড়সাহেবের মুখের সঙ্গে কোথাও কিছু মিল ধরা যায় কিনা সেই চেষ্টাই ছিল আমার খাবার টেবিলের বিশেষ কাজ। খাওয়া শেষ হ'ল, কাজও ফুরলো।

বসবার ঘরে এসে প্রথমেই আমি ঘোষণা করলাম, "ক্যাপটেন, এমন কোন বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব না যার মধ্যে তর্কের সুযোগ আছে। তুমি আমায় গল্প শোনাও। তোমরা সভ্য দেশের মানুষ, একটা সভ্য গল্প বল।"

"সভ্য, না সত্য ?" প্রশ্ন করলেন ক্যাপটেন। মনে হ'ল তিনি শুধু সত্য গল্প বলতে চান না, বিশেষ একটি গল্প তাঁর মনে পড়েছে। না পড়লেও যেন পড়ে, সেই চেষ্টা তাঁকে বুঝতে না দিয়ে বললাম, "মনে পড়ে মাসীমাকে তুমি একবার বলেছিলে—অবিশ্যি আজ থেকে প্রায় বারো বছর আগে বলেছিলে যে, কি এক অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে প'ড়ে তোমার জীবনের ধ্যানধারণা সব বদলে গেল। তুমি যে বদলেছ তা আমরা জানি। কারণ, ভারতবর্ষকে তুমি ভালবাস। কিন্তু কি অবস্থায় তুমি পড়েছিলে তার উল্লেখ সেদিন তোমার মুখ থেকে শুনি নি, কাহিনীটা শোনাও না।"

"সুতপা, তোমার কথা বলবার ধরন দেখে মনে হচ্ছে, মাঝখানের ক'টা বছর তোমার সত্যিই নষ্ট হয় নি।" এই ব'লে ক্যাপটেন হেওয়ার্ড রহস্যজনক ভাবে হাসতে লাগলেন। রহস্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ আছে আমি জানি। বিশেষ ক'রে ওপরের রহস্য যে তাঁকে টানে তাও আমার অজানা নেই। মাসীমার উক্তি যদি সত্যি হয় তা হ'লে তাঁর কাছেই শুনেছি, 'ওপরের রহস্য' কথাটা ভগবানের বদলে ব্যবহার করেন ক্যাপটেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি হাসছ যে? না হয় চল, বেড়িয়ে আসি। তোমার তো তেলের অভাব নেই।"

"হ্যাঁ, সেই বরং ভাল। কলকাতায় এসে গঙ্গার দিকটায় যাওয়া হ'য়ে ওঠে নি।"

ক্যাপটেন গাড়ি চালাচ্ছেন। তাঁর পাশেই বসলাম আমি, সাবধান হওয়ার দরকার হ'ল না। লুডন স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে আসতে না আসতেই মনে হ'ল, লাহিড়ী সাহেব আর ক্যাপটেন হেওয়ার্ডের মধ্যে কত তফাৎ! একই পৃথিবীব দু'অংশের সভ্যতা একরকম নয়। গঙ্গার ধারে পৌঁছবার আগে ফস্ ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রে বসলাম, "বড়সাহেব, আমায় তুমি বিলেত নিয়ে যাবে?"

"কি করবে সেখানে গিয়ে?"

"তোমাদের অংশে গিয়ে মানুষ দেখব।"

"অভাব পৃথিবীর সব অংশেই আছে, বিশেষ ক'রে মানুষেব। খরচ ক'রে কষ্ট পেতে যাবে কেন?"

বাকি পথটা নিঃশব্দেই কাটল। উনিশ শ' সাতান্ন খ্রীষ্টাব্দের স্মরণীয় রাত এটা। শেলী এণ্ড কুপাব কোম্পানীর বড়সাহেবের পাশে ব'সে হাওয়া খেতে যাচ্ছি আমি। কৃষ্ণপক্ষের রাত। খোলা গাড়ির মাথার ওপরে আকাশ, বুকটা তার কালো কুচকুচে। নক্ষত্র-গুলো মিট্‌মিট্ ক'রে জ্বলছে বটে, এবং তার সংখ্যাও অনেক, কিন্তু সমুদয় নক্ষত্রের আলোতেও বড়সাহেবের মুখটা দেখতে পেলাম না।

আউটরাম ঘাটের সামনে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে দিলেন মিস্টার হেওয়ার্ড। দিয়ে বললেন, "জাপানীদের কাছে মার খেয়ে যে আমরা বর্মা থেকে পালিয়েছিলাম সে খবর তো তুমি জান।"

"গল্পটা পুরনো হ'য়ে গেছে, অনেকবার শুনেছি।"

"হেরে যাওয়ার গল্পটা শুনেছ, জেতবার গল্পটা শোন নি। শেষেরটা সাম্প্রতিক।"

"তার মানে? ইংরেজরা যে বর্মায় আবার ফিরে গিয়েছিল তার সন-তারিখ তো সাম্প্রতিক নয়?"

ক্যাপটেন চশমার কাচ মুছতে মুছতে বললেন, "আমি অবিশ্যি বর্মায় আর ফিরে যাই নি। তবুও জিতলাম। এটা আমার সম্পূর্ণই ব্যক্তিগত জয়ের সংবাদ, সুতপা। গল্প শুনতে চেয়েছিলে, গল্পটা শুরু করি রেঙ্গুনের জাহাজঘাট থেকে। সাতসমুদ্রের বুকে আমি বার দুই পাড়ি জমিয়েছি। কিন্তু রেঙ্গুন আর কলকাতার মাঝখানে যে জলটুকু দেখতে পাচ্ছ তার মধ্যেই আমার জয়ের সূচনা ভেসে উঠল। পাঁচ হাজার টনের জাহাজটা ডক থেকে একটু দূরেই নঙ্গর ফেলে বসেছিল।

"ইউনান সীমান্ত থেকে মার খেতে খেতে রেঙ্গুন এসে পৌঁছলাম। পৌঁছে দেখি, শহরটার ওপর বারকয়েক জাপানীরা বোমা ফেলে গেছে। বুঝতে পারলাম, জাপানী সৈন্যবাহিনী শহরে ঢোকবার পথ তৈরি করছে। তা করুক, আমাদের তখন বর্মা থেকে পালিয়ে আসবার কথা। জাহাজটা অপেক্ষা করছিল আমাদের নিয়ে রওনা হওয়ার জন্যে। আমার ব্যাটালিয়নের মধ্যে এক-চতুর্থাংশ মরেছে উত্তর-বর্মায়—সত্যি সত্যি যুদ্ধ ক'রেই মরেছে। দ্বিতীয়-চতুর্থাংশ মরল পালিয়ে আসবার পথে। বাকী অর্ধেকটাকে যখন জাহাজে টেনে তুললাম তখন দেখলাম, খুব তাড়াতাড়ি কলকাতায় গিয়ে না পৌঁছতে পারলে আরও এক-চতুর্থাংশ মরবে ওষুধ না পেয়ে। অনেকেরই হাতে-পায়ে পচা ঘা, আর পেটে ব্লাড ডিসেন্ট্রি। জামাকাপড় পুরো কারো গায়েই নেই। বুকের চামড়ায় বারুদে পোড়া চিহ্নগুলো গুনতে গেলে আমায় আরও সাত দিন অপেক্ষা করতে হ'ত রেঙ্গুনের ডকে। হ'টে আসবার পথে ঘাড়ের বোঝা কমিয়ে আসতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত হাতের বন্দুকও নালা-নর্দমায় ফেলে দিতে হ'ল। অনেকে বইতে পারল না, অনেক পারলও। যারা পারল তারা শেয়াল-কুকুর তাড়াবার জন্যেই হাতে রাখল বন্দুক। গুলিগোলার স্টক তখন

একেবারে নিঃশেষ। অথচ নেমে আসবার পথে জাপানী স্নাইপারদের সংখ্যা কেবল বাড়ছে। অতএব বুঝতে পারছ, আমরা যখন জাহাজে এসে উঠলাম তখন দুনিয়ার কোন দিকেই দৃষ্টি ফেলবার মত আমাদের আর উদ্বৃত্ত উৎসাহ ছিল না। জাহাজের ক্যাপটেনকে ব'লে এলাম, আমরা সব উঠেছি। জাহাজ সে এবার ছাড়তে পারে। ছাড়বার জন্যে তৈরিও হ'ল সে। হঠাৎ কি মনে ক'রে তাঁকে বললাম, 'একটু অপেক্ষা কর, দেখে আসি, দু'একটা আহত সৈনিক আবার পেছনে প'ড়ে রইল কিনা। ফাইনাল চেক-আপ।' আমরা মার খেয়েছি বটে, তবু আমি অফিসার। বন্দী না হওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত দায়িত্ব অনেক। একজন সৈনিক নিয়েও যদি ফিরতাম তবুও দায়িত্ব আমার কমত না। কারণ, তখনও আমি নামাঙ্কিত ডিভিশনের একটা অংশ। ফিরে গেলাম ডকে—আহত সৈনিক কেউ আর নেই। কিন্তু আহত সিভিলিয়ানদের সংখ্যা দেখলাম অনেক। এঁদের মধ্যে প্রায় সবাই আতঙ্কে আহত। এতক্ষণ এদের আমি কাউকে দেখতে পাই নি। মেজরিটি ভারতীয় এবং তাঁদের মধ্যে মেজরিটি স্ত্রীলোক এবং শিশু। কতবার আমি ডকে আসাযাওয়া করলাম, অথচ এঁদের আমি দেখতে পাই নি কেন? মার-খাওয়া ব্যাটালিয়নের অফিসার আমি—তবুও আমি ইংরেজ, দেখতে না পাওয়ার অভ্যাসটা দেড় শ' বছরের চেষ্টায় শিখতে হয়েছে—কিন্তু তাঁরা আমায় দেখছিলেন। একজন যুবতী বাঙালী মেয়ে এগিয়ে এলেন আমার কাছে, খুবই কাছে। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ সুতপা, আমার কাছে এগিয়ে আসতে কতটা তাঁর সাহসের দরকার হয়েছিল? হ'তে পারি আমি মার-খাওয়া ব্যাটালিয়নের অফিসার, কিন্তু আমি ইংরেজ। আমার ব্যাট্‌ল-ড্রেস পরা, কোমরের বেল্টে পিস্তল বাঁধা, হাতে মালাক্কা বেতের টুকরো, জিভের আগায় 'রুল্‌ ব্রিটানিয়া'র উষ্ণ অনুভূতি। তবুও বাঙালী মেয়েটি এগিয়ে এলেন। অনুরোধ করলেন, 'অফিসার, আমাদেরও সঙ্গে নিয়ে চল।' পালাবার পথ পরিষ্কার থাকা সত্ত্বেও

এই প্রথম আমার মনে হ'ল, আমি পালাতে চাই না। আমি অফিসার, আমার কর্তব্য সবার শেষে পরিবহণের পাটাতনে পা দেওয়া। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ব্যাপারটা খুব সোজা ঠেকল না। মেয়েটি এমন একটা অনুরোধ ক'রে বসলেন যার ওপরে আমার কর্তৃত্ব পুরো নেই। জাহাজের হুইসল বেজে উঠল, আমি উসখুস করতে লাগলাম। মেয়েটি দ্বিতীয়বার অনুরোধ করলেন, অনুরোধ করবার দরকার ছিল না। গোটা ভিড় তখন আমার চারদিকে ঘন হ'য়ে এসেছে। প্রত্যেকের মুখ আমি দেখতে পাচ্ছি। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার হাতে ওটা কি?'

'এ ডেড চাইল্ড! সাত দিন থেকে ডকের নোংরায় প'ড়ে ছিলাম। জন্মেছিল গতকাল মাঝরাত্রে, মরেছে ভোর বেলা।'

'আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমি দেখছি।'

ছুটে চ'লে এলাম জাহাজে। মুহূর্তের মধ্যে অনেক কথাই মনে পড়ল। যুদ্ধ, রাজ্যলোভ, অবিচার আর শোষণলিপ্সা—এই রকমের গাদা গাদা কথা। ক্যাপটেনের কাছে এলাম, বুড়ো মানুষ, জাহাজ চালাচ্ছেন অনেক দিন থেকে। সমুদ্র আর আকাশের বিস্তৃতি এঁরা সারাজীবন ধ'রে চেখে চেখে দেখছেন—অন্তত চেখে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন, অবসর পেয়েছেন প্রচুর। সব কথা বললাম তাঁকে, জিজ্ঞাসা করলাম, 'পারবে এঁদের রক্ষা করতে? জবাব দাও, ক্যাপটেন, দেরি ক'রো না,—জবাব দাও—'

'আমি আর কি জবাব দেব? দু'হাজার বছর আগে জবাব তো তিনিই দিয়ে গেছেন।'

'তার মানে?' রুখে উঠলাম আমি।

ক্যাপটেন বললেন, 'তিনি কি ঘোষণা ক'রে যান নি যে, যখন তোমরা এই সব হতভাগ্যদের কোন উপকার করবে, তখন তা আমাকেই করা হবে? নিয়ে এস ওঁদের। হারি আপ!' সুতপা, কথা শুনে কেমন যেন হ'য়ে গেলাম আমি! আমার উচিত ছিল দৌড়ে

যাওয়া, পারলাম না। খুব ধীরে ধীরে নিচে নামতে লাগলাম। আমার আগে নিচে নামলেন বুড়ো ক্যাপটেন। ডেকের ওপর থেকে আমাদের বাকী যা অস্ত্রশস্ত্র ছিল সব জলে ফেলে দেবার হুকুম দিলেন তিনি। হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'ভার কমাও, অনাবশ্যক জিনিস সব ফেলে দাও জলে।' আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'হারি আপ, বয়! নিয়ে এস। যারা আসতে চায় কাউকে ফেলে এস না। লেট ইট বি এ শিপ অফ মারসি! আরও অনেক মাল ফেলে দিতে হবে। কি ফেলব? জীবনের চেয়ে সোনার দাম তো বেশি নয়।' নাবিকদের ডেকে বললেন, 'কাম হিয়ার বয়েজ—ড্রপ দোজ বক্সেস. তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? কি দেখছ তুমি?' দেখছিলাম ক্যাপটেনকে! সুতপা, জাহাজ যখন জলে থাকে তখন তার ক্যাপটেন হচ্ছেন একচ্ছত্র সম্রাট। তাঁর মুখের কথাই আইন। জাহাজের মধ্যে তিনি বিচারক, ইচ্ছে করলে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দিতে পারেন ক্যাপটেন। জাহাজে যদি ডাক্তার উপস্থিত না থাকেন তা হ'লে তিনি পারেন ওষুধ দিতে। দরকার হ'লে রোগীর হাত কিংবা পা কেটে ফেলে দিতে পারেন তিনি। শুধু তাই নয়, বিয়ে দেওয়ার ক্ষমতাও তাঁর আছে। এমন কি কেউ মরলে, তাকে কবর না দিয়ে তিনি টান মেরে মৃতদেহ জলেও ফেলে দিতে পারেন। এত বেশি যাঁর ক্ষমতা তাঁকে তুমি সম্রাট বলবে না?"

জবাব দিলাম, "বলব।"

"কিন্তু এই ক্যাপটেনটির সাম্রাজ্যভোগের লোভ ছিল না।" এই ব'লে মিস্টার হেওয়ার্ড একটু থামলেন।

আউটরাম ঘাটের হাওয়া ঠাণ্ডা হ'য়ে এসেছে। রাত নিশ্চয়ই অনেক হয়েছে। আমি চেয়েছিলাম রেঙ্গুনের সেই ডকটির দিকে। জিজ্ঞাসা করলাম, "বড়সাহেব, তুমি কি আর ডকে নামলে না? সব দায়িত্বই কি সম্রাটের ওপর চাপিয়ে দিলে? তুমি নিজেই তো বললে, ক্যাপটেনটি বুড়ো মানুষ।"

"না, আমি নেমে গেলাম তখখুনি। সবাইকে জাহাজে তুলে

দিয়ে আমি উঠলাম এসে সবার শেষে। গোটা ভারতবর্ষকে আমি দেখলাম। বাঙালী, মাদ্রাজী, পঞ্জাবী, উড়িয়া—সব ছিল সেই দলে। বাঙালী মেয়েটির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'ডেড চাইল্ড, কোন কাজেই তো আর লাগবে না। দাও—"

'নাঃ, কোন কাজেই আর লাগবে না এটা। এই নাও, অফিসার।' এই ব'লে পুঁটলিটা তুলে ধরল সে।

ডকের পাশে জলের মধ্যে টুপ ক'রে ফেলে দিলাম রক্তমাখা পুঁটলিটা। ফেলে দিয়ে বললাম, 'দেখছ, আরও পাঁচছ'টা মৃতদেহ ভাসছে?'

চোখ খুলে মুখ নিচু ক'রে মেয়েটি জলের দৃশ্য দেখল। তার পর দ্রুত পায়ে হেঁটে চ'লে গেল জাহাজের দিকে।

আমিও ফিরে আসছিলাম। শেষবারের মত পেছন দিকটা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে দেখি রেলিং ধ'রে একটি চীনা মেয়ে চেয়ে রয়েছে জলের দিকে। সঙ্গে কিছু নেই, মানে মালপত্র কিছু নেই। চেহারা দেখে মনে হ'ল, কষ্ট পেতে পেতে এখন আর কোন কষ্টকে ভয় পায় না। নির্বিকার, নির্লিপ্ত তার ভঙ্গী। দেহটাকেও ভাল ক'রে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করে নি! ভাবলাম, মেয়েটির নিশ্চয়ই পালাবার দরকার নেই। কিংবা হয়তো দরকার আছে, আমাকে অনুরোধ করবার সাহস পাচ্ছে না। দাঁড়ালাম গিয়ে তার পাশে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি যেতে চাও?'

'কোথায় যাচ্ছ তোমরা?' ভাসমান মৃতদেহগুলোর দিকে তখনও তার দৃষ্টি নিবদ্ধ।

বললাম, 'আপাতত কলকাতায় যাচ্ছি।'

'আমার জন্যে জাহাজে কি জায়গা হবে?' এবার সে মুখ তুলে আমার দিকে চাইল। বুঝলাম, ঘুমোয় নি। একদিন দু'দিন নয়, বহুদিন চোখের পাতা বন্ধ করে নি।

বললাম, 'হ্যাঁ, হবে।'

'তা হ'লে নিয়ে চল। পয়সাকড়ি কিছু আমার সঙ্গে নেই। আমার নাম লী। ক'দিন আগে হংকং থেকে এসে পৌঁছেছি।'

লী সেদিন আমার শেষ প্যাসেঞ্জার। নঙ্গর তুলল জাহাজ, ভেসে পড়লাম আমরা। দু'দিনের মধ্যে জাহাজের মজুদ খাবার সব ফুরিয়ে গেল। দুটি অসুস্থ যাত্রী পথে মারা গেল, একজনের বাচ্চাও হ'ল একটি। সর্দি, কাসি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ম্যালেরিয়া এবং টাইফয়েডের উৎপাতও সহ্য করতে হ'ল। তৃতীয় দিন সকালবেলা মৃত্যুর অন্ধকার ঘনিয়ে এল আমাদের মাথার ওপরে। তিনখানা জাপানী উড়ো-জাহাজ উড়তে দেখা গেল। আত্মরক্ষার কোন অস্ত্র আমাদের সঙ্গে নেই, ছুটে গেলাম ক্যাপটেনের কেবিনে। দেখলাম, তিনি মেঝেতে হাঁটু ভেঙে ব'সে প্রার্থনা করছেন। আমি দাঁড়িয়েছিলাম তাঁর পাশে। একটু বাদেই তিনি উঠলেন। ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি উপায় হবে? এনিমি উড়োজাহাজ মাথার ওপরে উড়ছে। এতগুলো জীবন—আত্মরক্ষার অস্ত্র কই?'

'অস্ত্র?' একটু হেসে ক্যাপটেন দৃষ্টি ফেললেন তাঁর টেবিলের ওপর।

আমি দেখলাম, টেবিলের ওপরে একটা ছবি রয়েছে।

এরই মধ্যে কয়েকটা বোমা পড়েছে জাহাজের দু'দিকে। বোধ হয় ইচ্ছে ক'রেই বোমাগুলো জাহাজের ওপরে ফেলে নি ওরা। এটা ট্রুপ-শিপ কিনা সে সম্বন্ধে বৈমানিকেরা নিঃসন্দেহ হয় নি। বাঙালী মেয়েটি ভিড়ের মধ্যে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। একটু বাদে দেখাও পেল আমার। বলল, 'আমাদের ক'টি শাড়ীপরা মেয়েকে জাহাজের ছাদে নিয়ে চল—শীগগির।'

'কেন?'

'আমরাই পারব জাহাজটাকে রক্ষা করতে।'

দশ-বারটি মেয়েকে ছাদে নিয়ে তুললাম। তারা সব শাড়ীর আঁচলগুলো উড়িয়ে দিল আকাশের দিকে। ব্রীজের তলায় লুকিয়ে

লুকিয়ে ওদের কাণ্ড দেখছিলাম আমি। বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে পারছি না, আমার তখনও ব্যাট্‌ল-ড্রেস গায়ে। একটু বাদেই উড়ো-জাহাজ তিনটে ঘুরতে ঘুরতে অনেক নিচে নেমে এল। ভারতীয় মেয়েদের পরিষ্কারভাবে দেখে নিল জাপানীরা। তার পর স্যালুট করবার ভঙ্গী ক'রে উড়োজাহাজ স'রে যেতে লাগল দূরে, অনেক দূরে, দিগন্তের বাইরে। সাড়ে পাঁচ দিন পরে আমরা এসে পৌঁছলাম কলকাতায়। এই সেই আউটরাম ঘাট।"

"কিন্তু সেই চীনা মেয়েটির কি হ'ল?"

"সে তো অন্য গল্প—আজ নয় সুতপা। রাত কত হয়েছে জান?"

"কত?"

"প্রায় সওয়া একটা।"

"তাতে কি বড়সাহেব? সওয়া একটার পরে গল্প শুনতে পারব না কেন? জীবনে রাত তো কম জাগি নি! হিসেব রাখলে হাজার দুই রাত্রি তো হবেই।"

"তা নয় সুতপা। ভোর রাত্রে চ্যাং এসে পৌঁছবে দমদম বিমান-ঘাঁটিতে। তাকে আনতে যাব আমি।"

"চ্যাং? সে কে?"

"লীর ছেলে। কিন্তু লোকে বলে চ্যাং আমার ছেলে। আমার বিরুদ্ধে দুর্নাম রটায়। বিলেত থেকে ফিরছে সে। সিনিয়র পাস ক'রে এল। তোমার কি চায়ের তেষ্টা পায় নি সুতপা?"

"পেয়েছে। চল, আমরা এখনই দমদম যাই। আমিও চ্যাংকে অভ্যর্থনা করব। বড়সাহেব, এখানে বসতে আর ভাল লাগছে না। পুলিশ-কনস্টেবলটা বার বার ক'রে আমাদের সামনে দিয়ে যাওয়া-আসা করছে।"

হো হো ক'রে হেসে উঠে বড়সাহেব গাড়িতে স্টার্ট দিলেন।

বিমানঘাঁটির লাউঞ্জে ঢুকে পড়লাম আমরা। রাত্রি আর দিনের

মধ্যে খুব কিছু তফাৎ নেই এখানে, চারদিকে উজ্জ্বল আলো। যাত্রীর সংখ্যাও অনেক। ভারতবর্ষের বাইরে যাচ্ছেন এঁরা। যাত্রীদের ওজন নেওয়া হচ্ছে। সাহেব-মেমের ভিড়ই সবচেয়ে বেশি। ভারতবর্ষের গরম থেকে পালাবার জন্যে এঁরা নিশ্চয়ই অস্থির হ'য়ে উঠেছেন। এঁদের ব্যস্ততার কাছে দাঁড়িয়ে মনটা কেমন উদাস হ'য়ে এল। ভোররাত্রির গায়ে যেন দূরের পোশাক পরা। ভারতবর্ষের খণ্ড-সীমান্তের বিস্তৃতি বুঝি আমার চোখের সামনে ক্রমশই প্রসারিত হচ্ছে। বড়সাহেবের সামনে ব'সে কফি খেতে খেতে আমি বোধহয় আমার ভৌগোলিক বিশেষত্বটুকুও হারিয়ে ফেললাম আজ। সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "অত তন্ময় হ'য়ে কি ভাবছ, সুতপা?"

"ভাবছিলাম, পৃথিবীতে অতশত সীমান্ত সব না থাকলে ক্ষতি কি! উড়োজাহাজের যুগেও দেখছি দূরের মানুষ কাছে এল না। সীমান্তের সংখ্যা যেন প্রতিদিনই বাড়ছে। বড়সাহেব, জাতীয়তাবাদের খণ্ড-সীমান্তে মানুষ এখনও লড়াই ক'রে মরছে। তোমার কি মনে হয়?"

"ঠিকই বলেছ তুমি, কথাটা মিথ্যে নয়। কিউবা থেকে করাচী তো কম দূর নয়, সুতপা। উড়োজাহাজে ডাক-বিলি হয় বটে, কিন্তু খণ্ড-সীমান্তের সংখ্যা বেড়েছে বই কমে নি।"

এই ব'লে বড়সাহেব দ্বিতীয় পেয়ালা কফি ঢাললেন। আমি অবিশ্যি চা-ই খাচ্ছিলাম। প্রথম পেয়ালা শেষ করতে পারি নি। ঘড়ি দেখছিলেন ক্যাপটেন, জিজ্ঞাসা করলাম, "ক'ঘণ্টা বাকী?"

"ঠিক সময়ে পৌছলে ঘণ্টা দুই লাগবে।"

"চ্যাংয়ের বয়স কত হ'ল?"

"প্রায় চৌদ্দ।"

"গল্পটা শুনি না। স্ত্রী এখন কোথায়?"

"সে নেই। মারা গেছে।"

"তা হ'লে জিতলে কি ক'রে? গল্পের সুরুতে তুমি বলেছিলে, রেঙ্গুনের ডকে তোমার জয় হয়েছে।"

"চ্যাং ফিরে আসছে—"

মাঝখানে হঠাৎ জিজ্ঞাসা ক'রে বসলাম, "তুমি যে তার পিতা নও, তা কি সে বিশ্বাস করে?"

"হয়তো পুরোপুরি করে না সন্দেহ থাকা স্বাভাবিক। সেই বুড়ো ক্যাপটেন দ্বিতীয়বার পেনাং থেকে লোক উদ্ধার করতে গিয়ে বোমা খেয়ে মারা গেছেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে জাহাজটাও গেছে। তিনি বেঁচে থাকলে সুবিধে একটু হ'ত। কি করব, উপায় তো নেই। চ্যাংয়ের জন্মের পেছনে যে আমার কোন অন্যায় লুকনো নেই, ওকে তা একদিন পুরোপুরি বিশ্বাস করাতেই হবে। নইলে ওর মনে চিরটা কাল দাগ ব'সে থাকবে—খোঁচা দেবে যখন-তখন। একটু আগে কিউবার নাম বলছিলাম না তোমায়?"

"হ্যাঁ।"

"একটা দৃষ্টান্ত দেখাতে গিয়ে হঠাৎ কিউবা নামটা মুখে এসে পড়ল। এখন ভাবছি, হঠাৎ নয়, নামটা আমার সর্বক্ষণই মনের মধ্যে গেঁথে রয়েছে। কারণ, লী জন্মেছিল কিউবায়। তিনপুরুষের বাস ছিল সেখানে। আখের ক্ষেতে কুলীর কাজ করবার জন্যে ঠাকুরদা গিয়ে প্রথমে ঘর বাঁধলেন সেখানে। রাজধানী হাভানা অঞ্চলে যেতে পারেন নি। পূর্ব-কিউবার সিয়েরা মেসস্ত্রো পর্বতমালার কাছাকাছি কি একটা জায়গায় যে তিনি প্রথমে কাজ করতে গিয়েছিলেন লী-র তা মনে নেই। সেই অঞ্চলটা ছিল সবচেয়ে গরীব দেশ, কারণ আখের চাষ সবচেয়ে বেশি হ'ত ওইখানেই। ঠাকুরদাকে লী দেখেছে কি না মনে করতে পারে নি। কিন্তু বাবার কথা পরিষ্কার মনে আছে। সানটিয়াগো শহরটা পূর্ব-অঞ্চলের নামজাদা জায়গা। লী-র বাবাও কাজ করতেন আখের ক্ষেতে, কিন্তু বাস করতেন এই শহরে। লী-র বর্ণনা যদি সত্যি হয় তা হ'লে রাজধানী হাভানার তুলনায় সানটিয়াগো ছিল নর্দমা। নর্দমার সবচেয়ে দুর্গন্ধযুক্ত অংশে লী-র বাল্যজীবনটা কাটে। বাবা ওর নেশা করতেন বটে, কিন্তু স্বপ্নও

দেখতেন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন, পয়সা জমিয়ে একদিন হাভানা শহরে যাবেন। তোমাদের কলকাতার মত হাভানার ছুটো চেহারা ছিল না। বালিগঞ্জ আর চৌরঙ্গীর পাশে রাজাবাজার কিংবা বেনিয়াপুকুরের বস্তি দেখতে খারাপ হ'লেও সভ্যসমাজের কাছে কোনদিনও অসহ্য মনে হয় নি। হাভানার ধনপতিরা আগে থেকেই সতর্ক হয়েছিলেন। তাঁরা বস্তি গড়লেন সান্টিয়াগো অঞ্চলে, আর চৌরঙ্গী গড়লেন হাভানায়। লী-র যখন বারো বছর বয়স, তখন ওকে একা ফেলে বাবা ওর স'রে পড়লেন। হাভানায় নয়, স্বর্গে। স্বর্গ বলতে কি বোঝায় তা তিনি জানতেন না বটে, কিন্তু মরবার সময় ব'লে গিয়েছিলেন, 'এ জায়গার চেয়ে স্বর্গ অনেক ভাল। পারিস তো দেশে পালিয়ে যাস।' স্বর্গে যাওয়ার স্থবিধে অনেক, ভাড়া লাগে না। চায়নায় ফিরতে হ'লে পয়সা লাগবে। ছু'দিকের একদিকেও লী যেতে পারলে না। রাগ পড়ল গিয়ে সব মায়ের ওপর। কি দরকার ছিল সংসারে ওকে টেনে আনবার? পুরুষমানুষেরা স্ফূর্তির জন্যে কি না করতে পারে! বিয়ে করলেই বুঝি ওদের সাতখুনও মাপ করতে হবে? বাবা প্রথম খুন করলেন মাকে। লী জন্মাবার পরেই মা মারা যান। বারো বছর বয়সে সে খুবই মুশকিলে পড়ল। পথ কিছু দেখতে না পেয়ে লী আখের ক্ষেতেই কাজ করতে লাগল। প্রথম দিন সে কি ওর ভয়! আখের ক্ষেতেই হারিয়ে গেল লী। ওর মাথার ওপরে আখের পাতা, আর ডাইনে-বাঁয়ে ম'দোমাতাল। দ্বিতীয় দিনেও ভয় গেল না। তার পর স'য়ে গেল সব। হাভানায় নয়, দেশে ফিরে যাওয়ার স্বপ্ন ওকে পেয়ে বসল। লী-র মুখেই শুনেছি, স্বপ্ন দেখা ওদের সাতপুরুষের রোগ। এই সময়ে ওর লুসের সঙ্গে দেখা হয়। একদিন সকালবেলা খবর এল, রাজধানী থেকে একজন মস্তবড় ধনীলোক আসছেন ক্ষেতের ফসল পরিদর্শন করবার জন্যে। হাভানার সবচেয়ে বড় দালাল তিনি, র‍্যামন বারকুইন। মরবার সময়ও নামটা তাঁর মনে ছিল লী-র। সকালের দিকেই আদেশ

এল, মজুরদেব সব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে হবে। আখের গোড়ায় যেন একটিও আগাছা না থাকে। র‍্যামন বারকুইনের মত বিশেষজ্ঞের চোখে আবর্জনা সব ধরা পড়বে। ফসলের বুকে রসেব পরিমাণ কত, তাব হিসেব নিতেই আসছেন তিনি। খুবপি হাতে নিয়ে লী বেরিয়ে পড়ল। অনেকটা পথ হেঁটে গেলে তবে ওর অংশটায় পৌঁছনো যায়। সান্‌টিয়াগো থেকে মাইল পাঁচেক হবে, সিয়েরা মেসস্ত্রো পর্বতমালার পায়ের কাছে। দলেব সঙ্গেই সে যাওয়া-আসা করত, আজও সে দলেব সঙ্গে পথ ধরল। হঠাৎ কোথা থেকে কুলীর সর্দার নাভাবো এসে ওর পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। আলাপ-আলোচনা সুরু হ'তেও দেবি হ'ল না। দুজনেই দল থেকে পেছিয়ে পড়ল একটু। নাভাবো জিজ্ঞাসা করল, 'তোব কি মনে হয়, লী?'

'কি মনে হবে?'

'না, এই ফসলেব কথা জিজ্ঞেস করছিলাম। কাল তো দেখলাম, আখের দেহ সব রসে টইটুম্বুর!'

'তা হ'লে তো দেখেছই তুমি, সর্দাব।'

'খোঁচা দিয়ে তো দেখি নি—' এই ব'লে নাভাবো লী-র বুকের ওপর দৃষ্টি ফেলে বলতে লাগল, 'সোনালী রং ফেটে পড়ছে! বারকুইন দেখতে ভুল করবে না। তোর বয়স কত রে, লী?'

'তেরো চলছে।'

'দেখে তো তা মনে হয় না।'

'কত মনে হয়, সর্দাব?'

'পনেবর কম নয়। দাঁড়া হিসেব কবি, তোব মা যখন মারা যায়—'

'অত কষ্ট করছ কেন সর্দাব? আমার বয়স বাড়িয়ে তোমার লাভ কি?'

'দালালকে সব দেখাতে হবে তো। আর যে-সে দালাল নয়, স্বয়ং র‍্যামন বারকুইন! শুনেছি, হাভানাব আদ্দেকই তার।'

'তুমি ভয় পেয়ো না সর্দার, আমার জমিতে আগাছা একটিও থাকবে না।' খুরপিটা হলদে-হাতে একটু ন'ড়েচ'ড়ে উঠল।

'না, বলছিলাম কি—লী, তোর তো এখানে কেউ নেই। কিউবা তোর দেশই হ'য়ে গেল। বারকুইন হচ্ছে গিয়ে খাঁটি কিউবান। তাব ঘরে যাবি?'

'না, দেশে যাব।'

'দেশ?'

'চায়না।'

'সে আবার কোথায় রে ছুঁড়ি? হাভানার হারেম থাকতে কষ্ট ক'রে দেশে যাবি কেন?' মুখ ভ্যাংচালো নাভারো, 'আর বারকুইনেব হারেম?'

হাতের খুরপি দোলাতে দোলাতে হাঁটতে লাগল লী। ভয় সে অবশ্যই পেয়েছে। এত অল্পবয়সে ভয় পাওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু ক্ষেতের মধ্যে ঢুকে একটু আড়াল পেয়ে লী তার খুরপির মুখটা বুকের ওপর বসিয়ে দিয়ে অনুভব করল, বয়সের অনুপাতে দেহটা একটু বেশি ভারি। আখের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লী-ও বোধ হয় মাটি থেকে রস টেনেছে। আট-দশ ঘণ্টা মাটির সঙ্গে লেগে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ওকে প্রত্যেক দিন, তা-ও বছর প্রায় ঘুরে এল।

"দুপুর নাগাদ ঘোড়ায় চেপে বারকুইন এল। দলবল সঙ্গেই ছিল তার। পিছনে ছিল বিশ-তিরিশটা শিকারী কুকুর। সিয়েরা মেসস্ত্রো পর্বতমালার দিকে বারকুইন শিকার করতে যাবে তেমন প্রোগ্রাম সে ক'রেই এসেছিল। আখগাছের ফাঁক দিয়ে লী দেখল, বারকুইনের পোশাক-পরিচ্ছদ কাউবয়দের মত। হাতের চাবুকটা মাথার ওপরে ঘুরিয়ে নিল একবার। আওয়াজ হ'ল, আওয়াজটা লী-র কানেও এল। মাঠের কিনারে অপেক্ষা করছিল নাভারো। ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল বারকুইন। চাবুকটা হাতে নিয়ে সে আখের ক্ষেতে ঢুকল।

দলবল কেউ এল না। সর্দার অবিশ্যি সঙ্গে রইল। পিছনদিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে লী অপেক্ষা করছিল। চেয়েছিল মোটা একটা আখের দিকে। হঠাৎ সে ভয়ে থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল। মস্তবড় একটা কোবরা ল্যাজ দিয়ে আখটাকে জড়িয়ে ধরেছে। বাকী অংশটা এগিয়ে এনেছে লী-র কপালের কাছে। মস্তবড় ফণা! বিষদাঁতের লোভ লী-কে প্রায় ছুঁয়ে দেয় আর কি! লী নড়তে পারছে না। পাথরের মত শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। কি করবে সে? পিছনদিকের পথ তো আরও বেশি ভয়সঙ্কুল। হাভানার সবচেয়ে বড় এবং বিষাক্ত কোবরাটা তখন লী-র গায়ের সঙ্গে লেগে দাঁড়িয়েছে। চাবুকের গোড়া দিয়ে লী-র গায়ের মাংস খোঁচা মেরে পরীক্ষা করতে করতে র‍্যামন বারকুইন্‌ও দেখল, সাপের ফণা বিপজ্জনক এলাকায় ঢুকে ছোবল মারবার জন্যে প্রস্তুত। আকাঙ্ক্ষার আগুন তার নিবে যেতে এক মুহূর্তও লাগল না। আর ঠিক সেই মুহূর্তে লুসের ধারাল ছুরিটা এসে লুটিয়ে পড়ল র‍্যামনের পায়ের কাছে। আসবার পথে ছুরিটা আখটাকে দু'টুক্‌রো ক'রে এসেছে—টুক্‌রো করেছে সাপটাকেও। ওপাশের আখের জঙ্গল থেকে লুসে মুখ বার করল। সবাই দেখল ওকে, বছর ষোল-সতেরো বয়সের একটি চীনা যুবক। বারকুইন জিজ্ঞাসা করল, 'ছোঁড়াটা কে?' জবাব দিল সর্দার, 'কাল থেকে কাজ করছে এখানে।'

'কিউবান?'

'না। চাইনীজ,' জবাব দিল লুসে, 'পাহাড়-অঞ্চলের শক্ত মাটিতে বাপ একসময়ে লাঙল চালাত। ম্যালেরিয়ায় মারা গেছে। আমার তাকত যেটুকু দেখলেন তা ওই সিয়েরা মেসস্ত্রো পর্বতমালারই তাকত।'

'বটে?' এই ব'লে র‍্যামন বারকুইন কাটা সাপটার পেটের ওপর পা রাখল। · তারপর—সুতপা—"

"বড়সাহেব—"

"চিনি ফুরিয়ে গেছে দেখছি—" এই ব'লে তিনি বেয়ারাকে বললেন, "আউর চিনি। আরও এক পট কফি নেওয়া যাক।"

"আমিও কফি খাব—"

"বেশ, বেশ।" বড়সাহেব উল্লসিত হ'য়ে উঠলেন। তার পর তিনি পুনরায় ফিরে গেলেন কিউবায়। চিনির পাত্রটায় হাত বুলতে বুলতে গল্প সুরু করলেন হেওয়ার্ড সাহেব, "ভারতবর্ষে এখন প্রচুর চিনি হচ্ছে। কিউবা থেকে অল্প চিনিই আমদানী করতে হয়। তবুও কিউবার সমৃদ্ধি আজও চিনির ওপর নির্ভরশীল। সেদিন লুসে আর লী একসঙ্গেই সান্টিয়াগোর বস্তিতে ফিরে গেল। লী রান্না করলে, লুসে খেলে। দিনসাতেক পরে লুসে বলল, 'তোমার আর ক্ষেতে যাওয়ার দরকার নেই, ইস্কুলে যাও। খরচ যা লাগবে আমি যোগাব : বন্দোবস্ত ক'রে এসেছি।' লী আপত্তি করল না। লী-র ঠাকুরদা বোধ হয় বৌদ্ধ ছিলেন। বাবা কি ছিলেন তা লী কেন, বস্তিব পুরনো লোকেরাও কেউ জানত না। লী ভর্তি হ'ল রোমান ক্যাথলিক ইস্কুলে। তা ছাড়া উপায়ও ছিল না, সান্টিয়াগোয় যে-ক'টা ইস্কুল ছিল তার সব ক'টিই পরিচালনা করতেন স্প্যানিশ ধর্মযাজকেরা। লেখাপড়ায় প্রতি লী-র আকর্ষণ বাড়তে লাগল দিন দিন। খুশী হ'ল লুসে। কিন্তু আসল লেখাপড়া লী শিখতে লাগল লুসের কাছে। লুসে শিখছিল হাভানার এক ইস্কুলেব শিক্ষকের কাছে। শিক্ষকটি ইস্কুলের কাজ ছেড়ে দিয়ে চ'লে এসেছিলেন আখের ক্ষেতে কাজ করতে। লুসে ছাড়া এ খবর আর কেউ জানত না। শিক্ষকটি আগাছা তুলতেন লুসের পাশে ব'সে। আর ইতিহাস ও সমাজের আগাছাগুলোর দিকে বিপ্লবের খুবপি তুলে বলতেন, 'এদের উপড়ে ফেলতে হবে।' কাদের ? শিক্ষকটি চেয়ে থাকতেন হাভানার দিকে। তার পর ক্রমে ক্রমে লুসে বুঝতে পারল, শুধু হাভানা নয়, তাঁর খুরপিটা পৃথিবীর গোটা মানচিত্রটা প্রদক্ষিণ করছে। সুতপা, তুমি নিশ্চয়ই খবর রাখ না যে, আধুনিক কিউবায় নতুন ফসলের

সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। উনিশ শ' ত্রিশ সালের সেই শিক্ষকটি এখন বেঁচে নেই বটে, কিন্তু খুরপির কাজ আজও থামে নি। সিয়েরা মেসস্ত্রো পর্বতগুহায় কিউবাব জননেতা কাসস্ত্রো আজ তাঁর অফিস খুলেছেন। কিউবার বর্তমান প্রেসিডেণ্ট বাতিস্তাব ভাষায় কাসস্ত্রো রিবেল। রিবেল তো বটেই। কিন্তু বাতিস্তার ধনতান্ত্রিক অভিধানে এই 'রিবেলিয়ানে'র যা ব্যাখ্যা দেওয়া আছে সানটিয়াগোর সবাই তা ভুল ব'লে জানে। গেরিলানেতা কাসস্ত্রো হচ্ছেন কিউবাব নতুন ফসল। ফসল যেদিন সত্যিই তৈরি হবে সেদিন তোমরা সেই শিক্ষকটির নামের সঙ্গে লুসের নামটাও স্মরণ ক'রো।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ স্বরু হওয়ার বছর দুই আগে লুসে টিকিট কাটল, দেশে যাওয়ার টিকিট। মাঞ্চুরিয়ার বুকের ক্ষত তখন পাতালের চেয়েও গভীর। জাপানীরা দেখতে বেঁটে বটে, কিন্তু তাদের কারখানা থেকে বেয়নেটগুলো যখন তৈরি হ'য়ে বেরুত তখন সেগুলো হ'ত লম্বা লম্বা। মাঞ্চুরিয়ার ক্ষত ছেয়ে গেল সারা চায়নার বুকে। ইংরেজের বাণিজ্য-বেয়নেট যে সেই ক্ষতটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বড় করেছে তেমন সত্য কি তুমি অস্বীকার করতে পার? পার না। লুসে চ'লে এল দেশে, লী চ'লে গেল হাভানায়, ছোট্ট একটা ইস্কুলে শিক্ষকতার কাজ নিয়ে। মাঝে মাঝে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলত। বিপ্লবের চাপা-বহ্নি ভাষার বুকে গোপন থাকত। জাপানী গুপ্ত পুলিস টের পেল তা। টের পেতে সাহায্য করল হংকংয়ের ইংরেজ পুলিস। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ স্বরু হ'ল। বছর-দুয়েক পর্যন্ত লুসে আর লী-র মধ্যে যোগাযোগ রইল না। হঠাৎ লী-র কাছে কি ক'রে যেন একটা চিঠি এসে পৌঁছয়—লী বুঝতে পারল চিঠিখানা লুসেরই। লুসে লিখেছে, ওকে হংকংয়ে আসবার জন্যে। কোথায় গিয়ে লী উঠবে তাও লেখা ছিল চিঠিতে এবং কোন্ মাসের কোন তারিখে লুসে হংকং এসে লী-র সঙ্গে দেখা করবে তেমন সব খুঁটিনাটি বিবরণও ছিল তাতে। লী গিয়েছিল হংকং, জাপান তখনও যুদ্ধে নামে নি। পার্ল হারবার

আক্রমণের ঠিক দশ মাস আগে। লী-র জীবনে সেইটেই ছিল এক মাত্র স্মরণীয় রাত। রাত্রির অন্ধকারেই লুসে এল লী-র সঙ্গে দেখা করতে। এসেই সে বলল, 'শুধু একটা রাতই থাকতে পারব। তাও পুরো রাত নয়, ভোররাত্রিতেই পালিয়ে যেতে হবে। আমায় ধরবার জন্যে জাপানী পুলিস ওপারে অপেক্ষা করছে। মনে হয়, ইংরেজরা আমার যাওয়া-আসার খবর সব জানে। বহুদূর থেকে এসেছি লী।'

'কিন্তু—' লী থেমে থেমে বলতে লাগল, 'কিন্তু আমাদের বিয়ের কি হবে? ত্বটো দিন অন্তত থাক। আমি যে আব অপেক্ষা করতে পারছি নে, লুসে!'

'অপেক্ষা করতেই হবে যতদিন না বিপ্লব সার্থক হয়।'

লী উঠেছিল একজন ছুতোর মিস্ত্রিব বাড়ীতে। থাকবার জন্যে ঘরও একটা পেয়েছিল। কিন্তু লুসে সেই ঘরে ঢুকতে সাহস করল না, সাহস পেল না মিস্ত্রিও। বাড়ীর পেছন দিকে ছিল চীনা মিস্ত্রির ভাঙাচোরা কাঠ রাখবার জায়গা। সেখানে দাঁড়াবার মত একটু খালি জায়গায়ও ছিল না। বুড়ো মিস্ত্রিটা এসে বলল, 'এখানেই থাক। আমাব চাকরটাকে বিশ্বাস করি নে।'

এই ব'লে সে ত্বটো তক্তা পাশাপাশি সাজিয়ে দিল। দেখতে পাটাতনের মত হ'ল বটে, কিন্তু সমান হ'ল না। কাৎ হ'য়ে রইল। তার তলায় রইল শত শত কাঠের টুকরো। লুসে আর লী সেখানেই বসল। মিস্ত্রি চ'লে যাওয়ার পরে লুসে বলল, 'বড্ড ত্বর্গন্ধ আসছে।'

'আসবেই। কাঠের স্তূপের তলায় রয়েছে চওড়া একটা নর্দমা। নোংরা সব সরতে পায় না, কাঠেব টুকবোব সঙ্গে সব আটকে যায়। লুসে—'

'বল—'

'আমি দেশে যাব কবে?'

প্রশ্নটার জবাব দিল না লুসে। ক্রমে ক্রমে কথাও বন্ধ হ'য়ে এল। লুসে পরিশ্রান্ত, তক্তার ওপর শুয়ে পড়ল সে। শুলো লীও।

ওদের পূর্বপুরুষেরা বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, না মুসলমান ছিলেন দুজনের একজনও কেউ মনে রাখল না, রাখবার দরকার হ'ল না। ভোর-রাত্রি পর্যন্ত দুজনেই জেগে রইল, কথা কইল না। লী-র মনে আছে, সেই ক'ঘণ্টার মধ্যে ওরা নর্দমা'র গন্ধ পর্যন্ত পায় নি! ভোর হওয়ার আগেই মিস্ত্রিটা দূরে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে কেশে উঠছিল। লুসে বুঝল, এবার ওর যাওয়ার সময় হয়েছে—গেলও। এত তাড়াতাড়ি গেল যে, লী শরীরের জড়তা ভাঙবারও সময় পেল না। তার পর লী চ'লে এল নিজের ঘরে। পেছন ফিরে দেখল, বুড়ো মিস্ত্রিটা তক্তা দুটো উপুড় ক'রে রাখল। লুসে যে এখানে এসেছিল তার জন্যে বুড়োটার ভয় বড় কম ছিল না। গুপ্ত পুলিসের চোখে সবকিছু ধরা পড়তে পারে। এমন কি লুসের দেহটার উত্তাপ পর্যন্ত! পরের দিনই লী খবর পেল, লুসে জাপানী পুলিসের হাতে ধরা পড়েছে। তিন মাস পরে জানল, টোকিওর কুখ্যাত স্নুগামো জেলখানায় আছে। তার পর শুনল, আর ঠিকই শুনল, জাপানীরা ওকে গুলি ক'রে মেরে ফেলেছে। হংকংয়ের ইংরেজ গবর্নর পরে একদিন দুঃখ ক'রে লী-কে বলেছিলেন, 'জাপান যে এত বড় বেইমানী করবে বিলেতের ফরেন-আপিস তিন মাস আগেও তা বুঝতে পারে নি। লুসের জন্যে সত্যিই আমি দুঃখিত। তুমি কি করতে চাও?'

'কি করব, এখানেই এখন থাকব।'

লী তখন গর্ভবতী। গবর্নর বললেন, 'কোন সাহায্যের দরকার হ'লে আমায় জানিও।'

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাপানের বিজয়-বাহিনী তুমুল কাণ্ড করতে লাগল। ভয় পেল লী। উড়োজাহাজে চেপে চ'লে এল ব্যাঙ্ককে, সেখান থেকে এল রেঙ্গুনে। এই ঘোরাঘুরির মধ্যে আরও প্রায় ছ' মাস কেটে গেল। তার পর একদিন আমার সঙ্গে দেখা হয় রেঙ্গুনের ডকে। চ্যাং জন্মাল জাহাজের মধ্যে। লী তার গল্প শেষ করল। দু'একটা অনুরোধ রাখবার প্রতিশ্রুতি আমার কাছ থেকে আদায়

ক'রে নিয়ে চোখ বুজল লী। জাহাজের ক্যাপটেনের অনুমতি নিয়ে মৃতদেহটা ওর ফেলে দিলাম জলে। আমরা তখন কাকদ্বীপের কাছাকাছি প্রায় পৌঁছে গেছি। সুতপা, এই তো গল্প, এই তো কাহিনী।"

"আর কিছু কি বলবার নেই, ক্যাপটেন?" জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

"আছে। আজ নয়। চ্যাংয়েব উড়োজাহাজ বোধ হয় মাটি ছুঁচ্ছে। চল, সময় হ'য়ে গেছে।"

লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে দেখি ভোর হ'য়ে গেছে। কলকাতার কাকগুলোর চেঁচামেচি এতক্ষণ আমাব কানে যায় নি। বাইরে বেরিয়ে তাদের কর্কশ আওয়াজ আমি শুনতে পেলাম। ভোর সত্যিই হয়েছে। কাস্টমস্ ব্যারিয়ারের এপাশে এসে আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম চ্যাংয়ের জন্যে।

বোধ হয় আধ ঘণ্টা পরেই ডাক্তারের আপিসের দিক থেকে যাত্রীদের গলা শুনতে পেলাম। সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে চ্যাংয়ের আরও প্রায় মিনিট পনের লাগল। আমাদের আর এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা নেই। আমাদের পায়েব কাছে বেড়া। বেড়ার পাশে পুলিস মোতায়েন করা আছে। তবুও বড়সাহেব মাথাটা এদিক-ওদিক হেলিয়ে, তুলিয়ে, নুইয়ে চ্যাংকে দেখবার চেষ্টা করছিলেন। আমাদের এত কাছে যে, সীমান্তের একটা বেড়া রয়েছে তা আমি দেখতে পাই নি। দমদম বিমানঘাঁটিতে এই আমি প্রথম এলাম।

দূরের করিডোর থেকে চ্যাং চেঁচিয়ে উঠল, "ড্যাড—"

"চ্যাং!" জবাব দিলেন বড়সাহেব। চ্যাং আসছে—চ্যাং হাঁটছে, তার পর চ্যাং দৌড়চ্ছে। দৌড়চ্ছে আর ডাকছে, "ড্যাড।" মনে হ'ল চৌদ্দ বছর বয়স হ'লে কি হবে, লম্বায় সে বড়সাহেবের সমান। মুখের আকৃতি পুরোপুরি চাইনীজ। দু'একটা খুঁতও আমার চোখে

পড়ল। কিন্তু তাই নিয়ে প্রশ্ন করবার সময় এটা নয়। 'চায়না পিকটোরিয়াল' ম্যাগাজিনের সেই ছবিটার সঙ্গে চ্যাংয়েব মিল আছে সেকথা ঠিক।

বেড়া ঠেলে চ্যাং বেরিয়ে এল। এমন ভাবে বেরিয়ে এল যে, বেড়ার অস্তিত্ব সে বোধ হয় বুঝতেই পারল না। পুলিস প্রহরীটাও কেমন বোকার মত মুখ ক'রে স'রে দাঁড়াল। চ্যাংয়ের মধ্যে বোধ হয় বেড়া ভাঙবার প্রতিভা আছে, কিংবা প্রতিজ্ঞা থাকাও সম্ভব।

দৌড়তে দৌড়তে এসে চ্যাং লাফিয়ে পড়ল বড়সাহেবের ঘাড়ের ওপর। তিনি ওকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি ঠিকই বলেছিলাম, চ্যাং লম্বায় বড়সাহেবের সমান। তাঁর ঘাড়েব ওপর মুখ গুঁজে চ্যাং আবার ডাকল, "ড্যাড!"

পরিচয় করিয়ে দিলেন বড়সাহেব। বললেন, "এই তোমার আন্টি।"

"আন্টি!" বড়সাহেবকে ছেড়ে দিয়ে সে জড়িয়ে ধরল আমাকে। পকেট থেকে চকোলেটের একটা বাক্স বার ক'রে চ্যাং বলল, "আন্টি, সবটা তোমার।"

দেওয়ার আনন্দে চ্যাংয়েব মুখ লাল হ'ল।

মনে হয়, ভবিষ্যতেও রঙের পরিবর্তন কিছু হবে না।

লেখকের বিবৃতি

॥ এক ॥

মাসীমার মারফৎ সবাই খবর পেয়েছে, পুরনো দিনের ক্যাপটেন হেওয়ার্ড আবার ফিরে এসেছেন শেলী এণ্ড কুপার কোম্পানীর বড়সাহেব হ'য়ে। তিনি এসে মাসীমার সঙ্গে দেখা ক'রে গেছেন তা-ও জানে সবাই। ক'দিন থেকে হোটেলের আবহাওয়ায় অপরিমিত আনন্দের ঢেউ বইছে। কেউ বড় একটা কাজের দিকে আর মন দিচ্ছে না। চণ্ডী ভটচাজ বড় নোটখানা ভাঙিয়ে ঘরে ব'সে খরচ করছে। এ-সপ্তাহে বউকে আনা হয় নি। দিনক্ষণ দেখে বেরুতে হবে ব'লে আগামী সপ্তাহের রবিবার তার আসবার কথা। জিনিসপত্র এসে গেছে। একতলার দক্ষিণ কোণের ঘরটা সে দখল করেছে। ঘরটা বড়, অন্য ঘরের চেয়ে এই ঘরটার ভাড়া এক টাকা বেশি। মাসীমার বালিশের তলা থেকে চাবি নিয়ে ঘরের তালা খুলে দিয়েছে বলরাম। চণ্ডী ভটচাজ ধ'রেই নিয়েছে শেলী এণ্ড কুপার কোম্পানীতে চাকরী করছে সে। প্রতি মাসের পয়লা তারিখে মাইনে সে পাবেই। পুরনো পঞ্জিকার গাদা ঝুড়ি ভ'রে বলরামের মাথায় চাপিয়ে ফেলে রেখে এসেছে চিলেকোঠার গুদামঘরে। সারা দিনের মধ্যে মাসীমার খোঁজখবর সে একবারের বেশি দু'বার নিতে পারত না। এখন তো ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘরে ঢুকছে তাঁর, জিজ্ঞাসা করছে, "জ্বরটা বাড়ে নি তো আর? বুকের ব্যথাটা কম না বেশি? ক্যাপটেন কি আজ একবার আসবেন?"

বিজয় মাস্টার একটু আগেই বড়সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রে ফিরল। জ্যান্ত কইমাছের মত লাফাচ্ছিল সে। এত কথা বলবার আছে যে, কোন্‌টা আগে বলবে আর কোন্‌টা পরে বলবে ভেবে কূল-কিনারা করতে পারছে না সে। সব কথাই সমান সমান ভারী। কোনটার চেয়ে কোনটা ওজনে কম নয়। মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন, "ক'টার সময় গিয়ে পৌঁছলি?"

"এ্যাঁ ? ক'টার সময় ? ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দশটায়।"

"চিঠিটা দিলি আমার ?"

"এ্যাঁ ? দিলাম মানে ? তখখুনি ডেকে পাঠালেন।"

"পাঁচ মিনিটও বসলি নে ?"

"এ্যাঁ ? পাঁচ মিনিট কি গো, দু'মিনিটের বেশি নয়। বড়-সাহেবের কামরাটা কি ঠাণ্ডা মাসীমা! নিশ্বাস নিতেও আরাম, ফেলতেও আরাম।"

"ইশ !" পাশে দাঁড়িয়ে মুখ দিয়ে আওয়াজ বার করল বলরাম।

চণ্ডী ভটচাজ তখন বিজয় মাস্টারের প্রায় গা ঘেঁষে বসেছে। সেই তালি-দেওয়া ফতুয়াটা তার ঘাড়ের ওপর ঝুলছিল। ঠাণ্ডার কথা শুনে সে তাড়াতাড়ি ফতুয়াটা মাথা দিয়ে গলিয়ে দিল। তার পর অন্যমনস্কভাবে তলার দিকটা টেনে টেনে সে নাভিটাকে ঢাকবার চেষ্টা করতে লাগল। লম্বা করবার মত বহরের ফতুয়া এটা নয়। নাভিটা ঢাকল না, কুঁজো হ'য়ে ব'সে বুকের দৈর্ঘ্য ইঞ্চিখানেক কমিয়ে ফেলল সে। যেন বড়সাহেবের ঠাণ্ডাঘরে চণ্ডী ভটচাজ ঢুকে ব'সে আছে !

মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন, "তার পর কি হ'ল ? বাঁদরটা তোকে বললে কি ?"

"এ্যাঁ ? বাঁদর ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোদের কাছে বড়সাহেব। তার পর বল্।"

বিজয় মাস্টার বলতে লাগল, "আমার বয়স কত জিজ্ঞাসা করলেন। বললাম, সার্টিফিকেটের হিসেবে পঁচিশ, আসলে সাতাশ। সত্যি কথা শুনে সাহেব ড্যাম গ্ল্যাড।"

"তার পর ?"

"এম-এ পাস ক'রে এতদিন কি করছিলাম তাও জিজ্ঞেস করলেন।"

"কবে থেকে কাজে যোগ দিচ্ছিস্ ? কত ক'রে মাইনে দেবে ?"

প্রশ্ন করতে করতে মাসীমা উঠে বসতে যাচ্ছিলেন। বাঘের মত লাফিয়ে প'ড়ে চণ্ডী ভটচাজ তাঁকে শুইয়ে দিয়ে বলল, "সর্বনাশ, করছ কি মাসীমা ? তোমার অসুখ না ?"

গল্‌গল্‌ ক'রে ঘাম বেরুচ্ছিল বিজয় মাস্টারের। উঠে পড়ল সে —উঠে প'ড়ে বলল, "বড়সাহেব বললেন এ্যাপ্লিকেশন পাঠাতে। কালই নিয়ে যেতে হবে।"

"হ্যাঁ রে চণ্ডীর কথা কিছু বললে সে ?"

"চণ্ডী ? ও, হ্যাঁ, চণ্ডীর কথা বলছ, না ? কিন্তু পাসের কথা জিজ্ঞেস করলে চণ্ডীদা কি বলবে ?"

"সে ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না। চণ্ডী পাকা জ্যোতিষ। গণনায় ওর ভুল হয় না। তোদের মত ছোটখাট পাস ও করতে যাবে কেন রে বিজয় ? বলি হ্যাঁ রে বলরাম, তপা কি তার ঘরে নেই ? ক'টা বাজল ?"

"তোমার বোধ হয় ওষুধ খাওয়ার সময় হ'ল, না মাসীমা ?"

উঠে পড়ল চণ্ডী। পাসের কথাটা শোনাব পব থেকে মনটা তার হঠাৎ দ'মে গেল। একবাব মনে হ'ল, মক্কেল ধরবার জন্যে নিয়মিত যেমন সে বাইরে বেরোয় আজও ওর তেমনি বেরুনো উচিত ছিল। একটা টাকার হাতের পাখী কি জঙ্গলের হাজারটার চেয়ে বেশি নয় ?

বিকেলের দিকে বিপ্রদাসবাবু এলেন। বললেন তিনি, "আজ সকালে বিজয়ের কাছে আপনার অসুখের কথা শুনলাম। কেমন আছেন ?"

"বসুন।" বললেন মাসীমা। দু'খানা চেয়ার বলরাম ঘরে এনে রেখেছে। কাল থেকে লোকের ভীড় ক্রমশই বাড়ছে। বলরাম মনে মনে বিস্মিত বড় কম হয় নি ! ব্যাপারটা ঠিক ও বুঝতে পারে নি— মাসীমাকে দেখবার জন্যে হঠাৎ এত লোক আসছে কেন ? তবে কি মাসীমাব অসুখ খুব বেশি ?

বিপ্রদাসবাবুর তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে, সান্ধ্য-ভ্রমণের সময় প্রায়

সমাগত। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "বিজয় বুঝি ইস্কুলের কাজে ইস্তফা দিচ্ছে ?"

"চাকরীটা পেলে ইস্তফা ওকে দিতেই হবে।"

"কত টাকা মাইনে হবে ?"

"শ'তিনেক তো বটেই।"

চিবুকের তলা থেকে ছড়িটা ঝট্ ক'রে সরিয়ে ফেললেন বিপ্রদাসবাবু। চোখের মণিদুটো চিক্‌চিক্ ক'রে উঠল। সুস্থ হওয়ার জন্যে সময় নিতে হ'ল। তার পর তিনি বললেন, "বড়-সাহেবকে আপনি অনুরোধ করলে বিজয়ের বোধ হয় আরও গোটা পঞ্চাশেক টাকা বাড়তে পারে।"

"বললে তো চারশ'ই দেবে !"

"দেবে ?" মাসীমার মুখের ওপর ঝুঁকে বসলেন ভদ্রলোক, "দেবে ?"

"সুরুতে শ'তিনেকই ভাল।"

মিনিট দুই সময় কেউ কোন কথা বললেন না। এবার বিপ্রদাসবাবু কথাটা পাড়লেন, "আমার ছোট মেয়ে মলিনাকে আপনি তো দেখেছেন ?"

"দেখেছি।"

"একসময়ে মলিনা বোধ হয় আপনার এখানে খুবই আসত—"

"পাঁচ বছর আগে একবার এসেছিল মনে পড়ে। কত বড়টি হ'ল মেয়ে ?"

"কম কি, কুড়ি চলছে। বি-এ দেবে।"

আলোচনা করতে মাসীমার খুবই ভাল লাগছিল। লালু ম'রে যাওয়ার পরে সরকার-কুঠিতে কেউ কখনও আসত না। একেবারে একঘরে হ'য়েই ছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও মাসীমার মর্যাদা কিছু বাড়ে নি। সরকারী মন্ত্রীদের মধ্যে কেউ একজন এসেও যদি একবার পায়ের ধুলো দিতেন তা হ'লেও সন্তানহারা মায়ের

বুকের জ্বালা কিছু কমত। লালু যদি ভুলও ক'রে থাকে, তবুও সে দেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছে, জলজ্যান্ত কচি ছেলেটাকে গুলি ক'রে মেরে ফেলল বিপিন চাটুজ্জে! সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, চাকরীর উন্নতির পরে উনিশ শ' আটচল্লিশ সনে বিপিন চাটুজ্জে এসেছিলেন মাসীমার সঙ্গে দেখা করতে! পঞ্চানন ঠাকুরের মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন তিনি! ক্ষমা চেয়েছিলেন বিপিন চাটুজ্জে, মুখের কথায় ক্ষমা প্রকাশ করা সোজা। কিন্তু অন্তরের খবর কেই বা রাখে!

বিপ্রদাসবাবু বললেন, "বিজয়ের সঙ্গে ভাবছি মলিনার বিয়ে দেব। আপনার মত না হ'লে তো কোন কিছুই স্থির হবে না। বিজয়ের আস্থা মাসীমার ওপর ষোল আনা।"

বুকের ব্যথাটা কমল। এত তাড়াতাড়ি মতটা দিয়ে দেবেন কি? তা হ'লে বিপ্রদাসবাবু হয়তো সেই বিয়ের আগের দিন ছাড়া আর আসবেন না।

মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন, "বিজয়ের মত আছে তো?"

"অমত কিছু নেই।"

"বেশ তো—" মত না দিয়ে মাসীমা অন্য পথ ধরলেন, "চাকরী পেলেই তো হ'ল না, থাকবার একটা জায়গা চাই। কলকাতায় বাড়ীঘর পাওয়া সোজা নয়। আমার অবশ্য দোতলায় ঘর আছে গোটা তিন। ছোট সংসারের পক্ষে ভালই হবে।"

"কিন্তু—" বারান্দায় কেউ কান পেতে কথা শুনছে কি না পরীক্ষা ক'রে নিয়ে বিপ্রদাসবাবু বললেন, "বিজয় বলছিল, দোতলায় থাকতে ও সাহস পায় না। মিসেস রায়ের ভাইটি তো টি-বিতে ভুগছে।"

"বিজয়ের আস্পর্ধা তো কম নয়। আপনার মেয়েকে বিয়ে করবে ব'লে ছেলেটাকে আমি রাস্তায় বার ক'রে দেব নাকি? দিন না আপনি, যাদবপুরের হাসপাতালে ওকে ভর্তি ক'রে। সেখানে ঢুকতে গেলে তো নেতাদের পায়ে তেল মাখাতে হয়। আসুক বিজয়—"

"না, না, তেমন কোন কথা বিজয়ের সঙ্গে হয় নি। কথার পিঠে কথা উঠে পড়ল কিনা—থাক্, থাক্, দোতলার ব্যাপারটা পরে ভাবা যাবে। আর ভাববার আছেই বা কি? তিনখানা ঘর পাওয়া তো ভাগ্যের কথা! আজ চললাম, আবার আসব। কেমন থাকেন খোঁজ নেব এসে মাঝে মাঝে। মত আপনার তা হ'লে তো পাওয়া গেলই—"

"বিজয় কোথায় গেল?" বলরামের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন মাসীমা। শিশি থেকে বলরাম ওষুধ ঢালছিল। ঘরের বাইরে গিয়ে বিপ্রদাসবাবু বললেন, "দরখাস্তটা টাইপ করছে। আমার একটা টাইপরাইটার মেসিন আছে। চাকরীর জীবনে কিনে রেখেছিলাম। বাড়ী গিয়ে ওকে পাঠিয়ে দেব কি?"

"নাঃ, থাক্। আপনি আবার কবে আসবেন? আমার মতটা আপনাকে পরে জানাব।"

"বেশ তো, বেশ তো—এখন তো মাসের মাঝামাঝি, চাকরীতে যোগ দিতে দিতে সেই পয়লা তারিখই হবে। আচ্ছা, নমস্কার।"

একটু পরে বলরাম জিজ্ঞাসা করল, "তোমার কি অসুখ বেড়েছে, মাসীমা?"

"না, কমেছে।"

"তবে এত লোক আসছে কেন?"

"এত দিন আসে নি কিনা, তাই। বলরাম, দেখ তো বাইরে কেউ এল নাকি? পায়ের শব্দ পাচ্ছি।"

ঘরের বাইরে গিয়ে ঘুরে দেখে এসে বলরাম বলল, "না, কেউ নয়, টাইগার।"

"জানোয়ারটা ওখানে কি করছে?"

"আমাকে খুঁজছে। দুটো দিন তো তোমার কাছ থেকে ছুটি পাই নি।"

কি মনে ক'রে মাসীমা টাইগারের আলোচনা বন্ধ ক'রে দিয়ে

জিজ্ঞাসা করলেন, "ষষ্ঠী তোকে আজকাল খোঁজে না? তাকে তো আজকাল দেখতেও পাই না।"

গুপ্ত খবরটা ফাঁস ক'রে দিল বলরাম, "গোয়ালের পেছন দিকে ষষ্ঠীদা একটা মন্দির তুলছে। ছোট্ট মন্দির, প্রায় শেষ হ'য়ে এল।"

"মন্দির?"

"হ্যাঁ। খুব ঘটা হবে প্রতিষ্ঠার দিন। ষষ্ঠীদা বলেছে, যাবা পঞ্চানন ঠাকুরের মন্দিরে যায় তারা এখানে আসবে না। এই মন্দিরে দেবতা থাকবেন না, মানুষ থাকবেন।"

"ষষ্ঠী এসব কি করছে? কার কাছে অনুমতি নিল সে?" প্রশ্নগুলো যেন মাসীমা বলরামকে করলেন না।

"তোশকের তলায় ষষ্ঠীদার আর টাকা নেই। সব খরচ ক'রে ফেলেছে।"

বলরামের ধারণা, সে বুঝি অনুপস্থিত ষষ্ঠীদার ভাল দিকগুলো খুলে খুলে মাসীমাকে দেখাচ্ছে। ষষ্ঠীদা যে কত ভাল মানুষ মাসীমা তা জানেন না।

"একবার তপাদিকে ডেকে নিয়ে আয় তো। তাড়াতাড়ি আসতে বলবি, দেবি করিস নি বুঝলি?"

"আচ্ছা।"

পুজোর দিনটা সবিতা দেবীর ভাল কাটে নি। সারাটা দিন তিনি অস্বস্তি বোধ করেছেন। স্বামীকে দেওদার স্ট্রীটে একলা ফেলে আসা উচিত হয় নি। সাব-জজ অঘোর চক্রবর্তী ভাটপাড়ার বামুন এনেছেন বটে, কিন্তু সমস্ত দিন তিনি দৃষ্টি রেখেছিলেন মেয়ের ওপর। পুজো কিংবা দেবদেবীর কথা মনেই ছিল না তাঁর। সন্তান মরলে আবার সন্তান জন্মাবে। স্বামী শুধু একবারই পাওয়া যায়। অঘোর চক্রবর্তী সন্দেহ করেছেন, মেয়ের সাংসারিক জীবন সুখের হয় নি। গুচ্ছের-খানিক টাকা খরচ ক'রে জামাই কিনলেন তিনি, অথচ এক পয়সার

সুখ নেই তপনের ঘরে। ব্যাপারটা কি? ব্যাপারটা অনুসন্ধান করবার জন্যে তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে শ্যামবাজার থেকে দেওদার স্ট্রীটে এসেছিলেন সেইদিন রাত্রেই—পুজোর আগের দিন, যেদিন সুতপা গিয়েছিল ছোটসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। সুতপা তখন ওপরেই ছিল, বেয়ারাটা বসেছিল একতলার সিঁড়ির পাশে। খবর যা নেওয়ার সবই তিনি পেলেন একতলাতেই, ওপরে উঠবার দরকার হয় নি। সুতপা নীচে নেমে আসবার আগে অঘোরবাবু হাজরা রোডে বেরিয়ে এসেছিলেন। বেয়ারাটা সঙ্গে ছিল তাঁর। আটের-বি বাস ধরবার জন্যে হেঁটে ল্যান্সডাউন রোড পর্যন্ত যেতে হয়। যাওয়ার মুখেই খুঁটিনাটি খবর পেলেন সব। বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি, "ওখানে ব'সে আছে কে?"

"জ্যোতিষ হুজুর।"

"ও, জ্যোতিষ—আচ্ছা, তুমি এবার যাও, আটের-বি ধরব আমি।"

ধরেওছিলেন অঘোর চক্রবর্তী। মানিকতলায় বাস বদলাতে হ'ল। একটা ছেড়ে এবং অন্য একটা ধ'রে তিনি যখন শ্যামবাজারে পৌঁছলেন তখন রাত দশটা বেজে গেছে। পরের দিন পুজো তাড়াতাড়ি শেষ করবার জন্যে বামুনদের তিনি তাগাদা দিলেন বার বার। মেয়েকে ডেকে বললেন, "পুজোর তাৎপর্য খুব গভীর কিন্তু, দেওদার স্ট্রীটে তোর তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার।"

"কেন বাবা?" জিজ্ঞাসা করেছিলেন সবিতা দেবী।

"হিন্দুর জীবনে পুজোপার্বণের পবিত্রতা খুবই বেশি অস্বীকার করি না, কিন্তু তার চেয়ে বেশি না হ'লেও, প্রায় সমান সমান হচ্ছে স্বামীভক্তি। বয়-বাবুর্চি নিয়ে কেউ কেউ নবসংসার করছে বটে, কিন্তু ঘরের দেবতাকে একলা ফেলে আসতে নেই। দেবতার কি পা ফসকায় না?"

সাব-জজ অঘোর চক্রবর্তীর ধর্মবোধ প্রবল। আদালতে ছুটি

থাকলেই বেলুড় কিংবা দক্ষিণেশ্বর যান। বেলুড়ের দেবতা আর ঘরের দেবতা যে প্রায় সমান সমান তেমন থিয়োলজি সবিতা দেবী বিশ্বাস করলেন না। অঘোরবাবুকে সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন তিনি, "যে দেবতার পা ফসকায় তাকে তুমি দেবতা বল নাকি ?"

"এ্যাঁ ? না, মানে—" মুহূর্তের মধ্যে তিনিও সোজা পথ ধরলেন, "থিয়োলজি থাক্। মোদ্দা কথাটা কি জানিস্, মা ? আপিসেব সেই মেয়েটা যাওয়া-আসা করছে দেওদার স্ট্রীটে।"

"কোন্ মেয়েটা, বাবা ? আপিসে তো আজকাল অনেক মেয়ে।"

"সেই যে তপনের টাইপিস্ট রে—"

ঈশ্বরতত্ত্বের চেয়ে ঈর্ষাতত্ত্ব বেশি কার্যকরী হ'ল। সাব-জজ অঘোর চক্রবর্তী তত্ত্ব কিছু কম জানেন না। যেটুকু অজানা আছে সেটুকু পেনসন নেওয়ার পরে জানলেই হবে। তা ছাড়া পেনসন নেওয়াব আগে ঈশ্বরতত্ত্ব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়ও না। মরণকালে হরিনাম করার ধর্ম তিনি অক্ষরে অক্ষবে পালন করবেন। এখন শুধু তাঁব আইনমন্ত্রীর নাম করাই কাজ। জেলা-জজ হ'য়ে পেনসন নিতে পারলে তত্ত্বজিজ্ঞাসা তিনি সুরু করতে পারেন।

তাঁর মুখ থেকে খবর শোনার পরে সবিতা দেবী বেশিক্ষণ আর শ্যামবাজারে থাকেন নি। পুজো শেষ হওয়ার আগেই ট্যাক্সি নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত অঘোরবাবু ভাটপাড়ার বামুনদের সঙ্গে ঝগড়াই ক'রে বসলেন। তাঁরা যত বেশি মনোযোগ দিয়ে পুজো করবার চেষ্টা করতে লাগলেন অঘোরবাবু তত বেশি তাঁদের মনোযোগ ভাঙবার ছুতো খুঁজতে লাগলেন। পাঁচটা দশ মিনিটের রানাঘাট লোকাল ধরতে হ'লে তাঁদের যে শ্যামবাজার থেকে তিনটেতে বেরুতে হবে তা কি এঁরা জানেন না ? তিনটের মধ্যেই তিনি তাঁদের বার ক'রে দিলেন। দিয়ে বললেন, "ট্রামেবাসে বড্ড ভিড় আজকাল। সাবধানে ওঠানামা করবেন। ফতুয়ার পকেটে

টাকা রাখবেন না। ভাড়ার পয়সা ক'টা হাতে রাখুন। বাকী টাকা সব ট্যাঁকে·· ”

বাকী টাকা বলতে চুক্তির অর্ধেক টাকা তিনি দিলেন। পুজো তো পুরো হয় নি? গরীব-ব্রাহ্মণদের তর্ক করবার সময় দিলেন না অঘোরবাবু। রানাঘাট লোকাল যদি বেরিয়ে যায়? তবুও তিনি শুনলেন, বুড়ো বামুনটি অপর বামুনটিকে বলছেন, “বুঝলি তারিণী, আমরা হচ্ছি গিয়ে ভারতবর্ষের বামুন। ধম্মকম্ম নিয়ে থাকাই হচ্ছে আমাদের কাজ। সেইজন্যেই চিরকাল আমরা ঠ'কে এসেছি। চ' রানাঘাট লোকাল আজ পাঁচটা দশ মিনিট পর্যন্ত হয়তো অপেক্ষা করবে না।”

গত দু'চার দিনের ঘটনাপ্রবাহে পরিবর্তন এসেছে। সে কথা সুতপা নিজেও জানে। আপিসে এখনও সে যায় না। ছুটি ফুরতে আরও পনের দিন বাকী। কিন্তু সুতপা আপিসের খবর কিছু কিছু রাখে। সবিতা দেবী আপিস থেকে স্বামীকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবার জন্যে গাড়িতে ব'সে অপেক্ষা করেন। দুপুরবেলা টেলিফোনে যখন-তখন স্বামীর সঙ্গে কথা বলেন। ছোটসাহেবের মানসিক বিপর্যয়ের মেঘ নাকি ক্রমশই তরল হ'য়ে আসছে। এমনি ধরনের দু'চারটে কথা কানে এসেছে সুতপার। আসবে তা সে জানত, যেন আসে সেইজন্যে সে কম চেষ্টা করে নি। সবিতা দেবীর মনে ঈর্ষার আগুন জ্বালাবার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা সুতপার নিজের চেষ্টাতেই হয়েছে।

বেলা শেষ হ'য়ে এল। আজ আর কোথাও যাওয়ার কথা নেই। সেদিন মহীতোষ এসে ফিরে গেছে। সঙ্গে নাকি কেতকীও ছিল। সন্ধের পরে একবার ইউনিয়নের আপিসে যাবে ব'লে সুতপা মনে মনে স্থির ক'রে রাখল।

একটু বাদে এল বলরাম। বলল, “মাসীমা তোমায় এখুনি একবার যেতে বললেন তপাদি।”

"তিনি কেমন আছেন ?"

"ভালই তো। দেরি ক'রো না, চল।"

"যাচ্ছি। শোন্—হ্যাঁ রে, তোদের মন্দির কতদূর উঠল ? শেষ হবে কবে ?"

"শীগগীরই। তপাদি, মন্দিরের কথা মাসীমাকে সব ব'লে দিয়েছি। ষষ্ঠীদা শুনতে পেলে আমায় হয়তো গাঁট্টা মারবে।"

"তা মারুক, ষষ্ঠীদার হাতেই ব্যথা লাগবে।"

সুতপার কথা শুনে হেসে ফেলল বলরাম, "সেদিন তুমি আমায় মারতে গিয়ে নিজের হাতেই ব্যথা পেয়েছিলে, না ?"

"ব্যথা পেয়েছিলাম, কিন্তু হাতে নয়।"

"আর আমি বেশি ভাত খেতে চাইব না তপাদি। দিন দিন ক্ষিধে আমার ক'মেও আসছে।" এই ব'লে বলরাম বারান্দায় বেরিয়ে এল। দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসবার চেষ্টাও করল না সে। বোধ হয় ক্ষিধের সঙ্গে সঙ্গে ওর চঞ্চলতাও ক'মে আসছে।

একতলায় নেমে আসতেই সুতপা দেখল, তু'জন ভদ্রলোক বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। সুতপাকে দেখতে পেয়ে নিজেদের পরিচয় দিলেন তাঁরা। রমাপ্রসাদ দাস ও দ্বিজেন্দ্র নাথ, গড়িয়ার কলেজে নতুন চাকরী নিয়ে এসেছেন। কলেজের কাছাকাছি থাকবার কোন জায়গা পাচ্ছেন না। তাঁরা শুনেছেন এটা হোটেল এবং ঘরও অনেক খালি প'ড়ে আছে। যিনি হোটেল চালান তাঁর সঙ্গে তাঁরা দেখা করতে পারেন কি ? "পারেন, নিশ্চয়ই পারেন। একটু অপেক্ষা করুন।" এই ব'লে সুতপা চ'লে এল মাসীমার ঘরে। বলল, "কলেজে পড়ান এঁরা, লোক ভালই হবে। তোমার কিছু আয় বাড়বে। ঘরগুলো তো খালিই প'ড়ে রয়েছে।"

"এখানে ডেকে নিয়ে আয়।" আদেশ দিলেন মাসীমা। সুতপা ডেকে নিয়ে এল অধ্যাপক তুটিকে। তুখানা চেয়ার তো ছিলই। মাসীমা বললেন, "বসুন। গড়িযায় নতুন কলেজ হয়েছে বুঝি ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। রাস্তার ধারে মস্ত বড় বাড়ী উঠেছে।"

"কোন্ রাস্তায় বাবা ?"

"বড় রাস্তায়, যেখানে পেট্রল-পাম্প আছে।"

"ত্রিশ বছর আগে ওখানে ভুট্টাক্ষেত ছিল। আশপাশে রাই-সরষের চাষও কিছু হ'ত। কোথা থেকে একবার একটা বুনো শুয়োর এসে উৎপাত সুরু করে। চাষীদের ভুট্টা খেয়ে ফেলত। আজকাল সেসব জায়গা দেখলে চেনাই যায় না। ভুট্টাক্ষেতের ওপর অট্টালিকা! হ্যাঁ বাবা, শুনতে পাই আজকাল নাকি মানুষের ওপর মানুষের উৎপাত অনেক বেড়েছে ? সে যুগে অবিশ্যি মোহন সামন্ত মাত্র একটা তীর ছুঁড়েই শুয়োরটাকে সাবাড় ক'রে দিয়েছিল। কিন্তু আজকাল তো একটা-দুটো বন্দুকও কাজে লাগে না। সেই ভুট্টাক্ষেতও নেই, বুনো শুয়োরও নেই! সব মানুষ।"

শেষের দিকের আলোচনার সুরটা ধ'রে ফেললেন অধ্যাপক রমাপ্রসাদ দাস। অধ্যাপক নাথ কথাগুলো বোধ হয় মনোযোগ দিয়ে শোনেন নি। তিনি ঘরের সিলিং দেখছিলেন। দেখছিলেন দেয়ালগুলোও। মাসীমার কথা শেষ হ'তেই অধ্যাপক নাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "বাড়ীটা খুবই পুরনো, না ?"

"হ্যাঁ। শ্বশুরের ভিটে।"

"মেঝে থেকে ড্যাম্প ওঠে না ?"

"আমি তো মেঝেতেই শুয়ে আছি, বয়সও কম হ'ল না। কই, ড্যাম্প তো লাগে নি ?"

রমাপ্রসাদবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, "দ্বিজেনবাবু, পুরনো হ'লে কি হবে, এসব বাড়ীর গাঁথুনি খুব ভাল। তাজমহলের মেঝেতে পাঁউরুটি ফেলে রাখুন তিন দিন, দেখবেন ছাতলা ধরে না। ড্যাম্প থাকলে ধরত। বাড়ী আমাদের পছন্দ হয়েছে, মাসে জনপ্রতি কত ক'রে লাগবে ? আমরা মাগগি ভাতা নিয়ে একশ' পঁচাশি টাকা পাই।"

"মাত্র ?"

"মাত্র। সাহেব কোম্পানীর হেড বেয়ারা পায় একশ' পঁচিশ, এর ওপরে বক্‌শিশ আছে। আমরা বক্‌শিশ পাই না। ঝামেলা অনেক। ঢোকবার সময় সে কি ঝঞ্ঝাট! চাকরীর ইন্‌টারভিউ দেবার জন্যে আলিপুরে যেতে হয়েছিল।"

"থাক, থাক—" অধ্যাপক দ্বিজেন নাথ রমাপ্রসাদবাবুকে পাল্টা দিলেন এবার, "থাক, থাক, আমাদের যেমন পাঁউরুটি নিয়ে তাজমহলে যাওয়ার দরকার নেই, তেমনি দরখাস্ত নিয়ে আলিপুরেই বা আর যাব কেন? আত্মীয়স্বজন কিংবা কোন সমাজভুক্ত না হ'য়েও যে চাকরী পেয়েছি সেই তো যথেষ্ট। কোন্ ঘরটায় আমাদের থাকতে দেবেন?"

"ঘর তো আর খালি নেই, বাবা। সব ভর্তি হ'য়ে যাবে আগামী মাসের পয়লা তারিখের মধ্যে।"

মাসীমার কথা শুনে সবচেয়ে বেশি অবাক হ'ল সুতপা। দ্বিজেনবাবু তবুও জিজ্ঞাসা করলেন, "সবার কাছ থেকে আগাম পেয়েছেন?"

"কথা যখন পেয়েছি, তখন আগামের দরকার কি, বাবা?"

"সবাই তো আজকাল কথা রাখেন না।" দ্বিজেনবাবু উঠলেন।

"তবে আর ভুট্টাক্ষেতগুলোর ওপর বড় বড় অট্টালিকা তুলে লাভ হচ্ছে কি? বেকার-সমস্যা সমাধানের সুযোগ তো রাইসরষের মধ্যেও কম নেই।"

সুতপা বিব্রত বোধ করল। তাই সে একটু জোর দিয়েই বলল, "তোমার বোধ হয় হিসেব করতে একটু ভুল হ'ল, মাসীমা। একতলার একটা ঘর অন্তত খালি থাকবেই।"

"না। সেখানে মহীতোষ আসবে। আর কেতকী যদি সঙ্গে আসে, তা হ'লে দোতলার তিনখানা ঘর বিজয়কে দেওয়া চলবে না।"

আকাশ থেকে পড়লেও সুতপা এত বেশি অবাক হ'ত না। অথচ মাসীমাকে আর কিছু বলাও চলে না। মহীতোষ, কেতকী এবং

বিজয়বাবু যে ভাগ ক'রে সরকা -কুঠিটা নিজেদের মধ্যে বণ্টন ক'রে নিয়েছে তেমন খবব তো সে আ ও শোনে নি। বোধ হয় মাসীমার কোন দোষ নেই। সে নিজেই তো ক'দিন থেকে বাইবের জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সরকাব-কুঠির কোন খোঁজই রাখে নি সে।

নিরাশ হ'যে অধ্যাপক দুজন চ'লে গেলেন। সুতপা জিজ্ঞাসা করল, "বিজয়বাবু তিনখানা ঘর দিয়ে কি কববেন?"

"সংসার পাতবে। বিয়ে কবছে সে। শ্বশুর হওযাব জন্যে বিপ্রদাসবাবু কাল আমার অনুমতি নিতে এসেছিলেন।"

"বিপ্রদাসবাবু? শুনেছি, তিনি তো মেয়ের জন্যে বড় চাকুবে খুঁজছেন?"

"আসছে মাসে বিজয়ও বড় চাকরী পাবে। আমার চিঠি নিয়ে সে আজ গিয়েছিল ক্যাপটেনের সঙ্গে দেখা করতে। তুই ভেবেছিস্ কি? ওই কোম্পানীতে চাকবী পাবে চণ্ডীও। দেখিস, বলরামও ব'সে থাকবে না। সরকার-কুঠির ঋণ ইচ্ছে করলে ক্যাপটেনই মিটিয়ে দিতে পাবে। এটাকে রক্ষা করার দায়িত্ব বড় কম নয়। তোদেব ছোটসাহেব চিরদিন ছোটই থাকবেন। ক্যাপটেন আর তপন লাহিড়ীব মধ্যে তফাৎটা তুই আজও কি দেখতে পাস নি?"

"তুমি পেয়েছ, সেইটেই বড় কথা। না, তপন লাহিড়ী কোনদিনও সরকাব-কুঠিকে বক্ষা করতে পারতেন না। সেই জন্যেই তাঁকে সবাই ছোটসাহেব বলে। বড় হওয়ার স্বপ্ন তাঁব নেই, মাসীমা।"

"সত্যি, খুবই সত্যি। তাঁকে চিনতে আমাব মাত্র এক দিনই লেগেছিল। দ্বিতীয় দিন দেখার সুযোগ পেলাম না। বেশি রাত্রে এসেছিলেন তিনি। তপা, তোর কি কেতকীর সঙ্গে আলাপ হয় নি?"

"হয়েছে।"

"মহীতোষ ওকে নিয়ে এসেছিল সেদিন।" মাসীমা চুপ ক'রে গেলেন। ইচ্ছে করলে তিনি আরও অনেক কথা বলতে পারতেন। বললেন না ব'লেই সুতপার মধ্যে একটু অস্থিরতা এল। না-বলা

কথাগুলো কি হ'তে পারে তাই নিয়ে নিজের মনে প্রশ্নোত্তর তৈরি করতে লাগল সে। বাইরে থেকে মাসীমা টের পেলেন না তা।

"বলরাম কই রে, বলরাম।" বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন মেসো-মশাই। সুতপাকে ঘরের মধ্যে দেখতে পেয়ে তিনি বললেন, "এই ছাখ, ষষ্ঠী কি কাণ্ড করেছে—কারও কাছেই কোন কথা শুধল না, গোয়ালের পেছন দিকটাতে একটা মন্দির খাড়া করেছে! জেটমল খবর পেয়ে ছুটে এসেছিল আজ।"

মুখ ঘুরিয়ে মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন, "আমরা মন্দির তুলব, না ভাঙব তাতে জেটমলেব কি?"

"না—মানে, মকদ্দমাটা শেষ হ'য়ে গেল কিনা।" মেসোমশাই এমনভাবে চুপ ক'রে গেলেন যে, সবাই বুঝল, গুরুতর কথা এইখানেই শেষ হ'ল না, আরও আছে। প্রকাশ করতে ভয় পাচ্ছেন তিনি। মাসীমা বললেন, "মকদ্দমায় আমরা জিতব, তা তো কেউ বলে নি। মন্দির তুলতে আপত্তি কেন?"

"আপত্তি—মানে, বাড়ীটা নীলাম হবে কিনা। বুঝতেই পারছ, জেটমল ছাড়া আর ডাকবেই বা কে? পেলে লক্ষ্মণ গয়লাও নিত। ওপারেই তো ওর এলাকা, কিন্তু জেটমল লক্ষ্মণের সঙ্গেও দেখা করেছে।"

"বাড়ীটা বেচে জেটমলের দেনা চুকিয়ে দিয়ে আমাদের উদ্বৃত্ত কিছু থাকবে না?"

"থাকা তো উচিত ছিল। জমির দাম এত বেড়েছে যে, বেশ মোটা টাকাই উদ্বৃত্ত থাকা উচিত। কিন্তু শেকলেব মত আইন-আদালতের সবকিছুই এমনভাবে বাঁধা যে, যেখানেই একটু নবম জায়গা আছে মনে ক'বে হাত রাখতে গেছি সেখানেই দেখি জেটমল আগেই গিয়ে জায়গা সব দখল ক'রে ব'সে আছে। বুঝলি সুতপা, আইন-কানুনের জগৎটাতে আদালত আছে দেখলাম, কিন্তু আইন কিছু নেই। শক্তি-শালীর মুখ থেকে দুর্বলের রক্ষা পাওয়া একবকম অসম্ভব।"

"বক্তৃতা রাখ—" উত্তেজিত সুরে মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন, "আমরা কি তবে কিছুই পাব না ?"

"বোধ হয় না। ভাড়া দিয়ে থাকতে চেয়েছিলাম, জেটমল তাতেও রাজী হচ্ছে না। বলে, ম্যানসন ভুলবে।"

"আমার সংসারের এই সব হতভাগাগুলো কোথায় যাবে ?"

"এর জবাব আদালত দিতে পারে না। আমিই বা কি ক'রে দেব ?"

"তা হ'লে কালকেই একবার ক্যাপটেনকে ডাক তো তপা। সে বড়সাহেব, ব্যবস্থা একটা সে করতে পারবেই।"

নিঃশব্দে সুতপা উঠে এল ওখান থেকে। মনে ভয় এসেছে ওর। মামলা মকদ্দমার খবর সে রাখত, কিন্তু সব সময়েই মনে হয়েছে, সরকার কুঠি নষ্ট হবে না, বেঁচে যাবে। কেমন ক'রে বাঁচবে তার পথ অবশ্য সুতপার জানা নেই। এখন, এখখুনি যা ও শুনল, তাতে নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে, এর বাঁচবার কোন পথ নেই—সরকার-কুঠি মরবে। এমন একটা বিরাট মৃত্যুর জন্যে সুতপাই দায়ী। মেসোমশাই যে সুতপাকে কতখানি ভালবাসেন তার শেষ প্রমাণটা যেন ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। জেটমলের লোক এসে বাড়ীটাকে ভাঙছে। সবার আগে তারা চূড়ার ওপর আঘাত করছে—মন্দিরের চূড়াটার মধ্যে অধিকারের সাক্ষী আছে। জেটমল সেই জন্যেই ভয় পেয়েছে। আবার ওকে হয়তো নতুন মামলা-মকদ্দমা সুরু করতে হবে। সুতপা জানে, সুরু করলে শেষ হ'তে সময় লাগবে। সময় পেলে হয়তো নতুন ঘটনার সৃষ্টি হবে। রক্ষা পাওয়ার সুযোগ আসাও সম্ভব। সরকার কুঠিতে আঘাত করলে সুতপা নিজেই বা আস্ত থাকে কি ক'রে ? না, ষষ্ঠীদার চেষ্টাকে সমর্থন করাই উচিত। সবাই মিলে সাহায্য করলে এতদিনে মন্দির-প্রতিষ্ঠার কাজ শেষ হ'য়ে যেত। জেটমলের ভয় বাড়ত বেশি, মিটমাটের উৎসাহ দেখাত সে। হিন্দু দেবতার মাথার ওপর আঘাত করা তার সাহসে কুলতো না।

সুতপা যেন এই প্রথম নিজেকে হিন্দু ব'লে প্রচার করবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠল। ছত্রিশ কোটি না হোক, দু'-চারটি হিন্দু দেবদেবীর নামও সে মনে মনে আওড়াতে লাগল। ভোলে নি, এত বছর পরেও সুতপা হিন্দু দেবতার নাম মনে রেখেছে! মন্দিরের চূড়াটা না হয় ক'দিন পরেই শেষ হবে—আগে চাই বিগ্রহ। বিগ্রহ? থমকে দাঁড়িয়ে রইল সিঁড়ির তলায়। ষষ্ঠীদাব ঘরের দিকেই যাচ্ছিল সে। ভাবতে হচ্ছে। বিগ্রহ কোথায় পাওয়া যায় তা তো সুতপা জানে না। হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে না বেরুলে ধর্মের ঐতিহাসিকতা প্রমাণিত হবে কি ক'রে? আদালতে গিয়ে দেখাতে হবে, ধর্মপ্রাণ বিচারককে বোঝাতে হবে যে, বিগ্রহের সঙ্গে সভ্যতার যোগ রয়েছে। দু'-চার শ' বছরের সভ্যতা নয়—কয়েক হাজার বছরের সভ্যতা। মাহেনজোদরো, হরপ্পা নয়, তারও আগে—আগের চেয়েও আগে। বুদ্ধি এবং বিশ্বাস দিয়ে বোঝাতে হবে, সবাব আগে বিগ্রহই ছিল, একমাত্র বিগ্রহ যাঁর পরিকল্পনা থেকে বিশ্বের সৃষ্টি, সময়ের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। সে দু'-চার শ' কিংবা দু'-চার হাজার বছরের সময় নয়, কোটি কোটি বছবেব কথাও নয়, একেবারের সুরুর কথা। ঘেমে উঠল সুতপা। এমন গভীর চিন্তার ধারে-কাছেও তো ওকে দাঁড়াতে হয় নি কোনদিন! বিগ্রহ না হ'লে যেন সমস্যা মিটবার দ্বিতীয় কোন পথ নেই। অন্ধকার বাগানে নেমে পড়ল সুতপা, সেই সুতপা—রক্ষিতের মোড়ে যার নাম ছিল সুতপা বিশ্বাস, সরকার-কুঠিতে যে এল সুতপা রায় নাম নিয়ে—আর এইমাত্র যে নেমে পড়ল বাগানে, তার নামের পেছনে বিশ্বাস কিংবা রায় নেই। এমন কি সে সুতপাও নয়, সে এক, যার দ্বিতীয় নেই, সে ভক্তি। সুতপা বিগ্রহ চায়। ছুটে এল গোয়ালের পেছনে। হাঁটু ভেঙে ব'সে পড়ল মাটিতে। চোখ বুজল সে। মাটির তলায় কম্পন উঠল নাকি? ফাটল নাকি মাটি? বিগ্রহ আসুক। ভক্তির জল দিয়ে সে স্নান করাবে পাথরের মুড়ি।

কোন কিছুই এল না। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল মানুষ। বেশ মোটাসোটা দেখতে, সারা মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, হাঁটুর ওপরে ধুতির প্রান্ত, গায়ে জামা নেই, হাতে একটা তুলি—মেয়েদের মুখে রং মাখাবার তুলি। নীচু হ'য়ে ব'সে লোকটা কি খুঁজছে? এগিয়ে গেল সুতপা, ঘাড়ে তার হাত রাখল সে। জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি খুঁজছ, ষষ্ঠীদা?"

"দাগ।"

"দাগ?"

"হ্যাঁ, তপাদি। সেই যে বিয়াল্লিশ সনে দাগ পড়েছিল এখানে সেইটে খুঁজছি। না, ভুল হয় নি, মন্দিব ঠিক জায়গায়ই উঠেছে। আসছে রবিবারে মন্দির-প্রতিষ্ঠা হবে। প্রতিষ্ঠার জন্যে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত ডাকব না—কাশী কিংবা ভাটপাড়ায় যাওয়ার দরকার নেই। পৌরোহিত্য কববেন স্বাধীন ভারতবর্ষের একজন রাষ্ট্রনেতা।"

"এ পাগলামী কেন করছ, ষষ্ঠীদা? লালু সরকাবকে তুমি আর কোনদিনই বাঁচাতে পাববে না।"

"বাঁচাবার দায়িত্ব দিদি আমার নয়, রাষ্ট্রের। আমি শুধু ক্ষমা চাই—একটু ক্ষমা—ক্ষমা।" এই ব'লে ষষ্ঠী দত্ত হাতের তুলিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল খালের দিকে। অন্ধকাবে কিছু দেখাও গেল না। মেক-আপ ম্যানের মুখোশটা সুতপাব চোখে তবু মুখোশ হ'য়েই রইল।

॥ দুই ॥

হ্যারিসন রোডের হোটেলটা ছেড়ে দেবার ইচ্ছে মহীতোষের আজকের নয়, কয়েক মাস আগের। সরু মত পাঁচতলা বাড়ীটায় হাওয়া-বাতাস পাওয়া যায়—মহীতোষ পায়। এত উঁচুতে ওর ঘরটা যে, উল্‌টো দিকের কোটিপতির বাড়ীটা হাওয়া-বাতাস রুখতে পারে না।

এমন কি তাঁদের টাকার উত্তাপ পর্যন্ত মহীতোষের গায়ে একবিন্দু ফোস্কা ফেলতে পারে নি। তবুও এবার সে হোটেলটা ত্যাগ করবার সিদ্ধান্তই করেছে। ছোটখাট একটা ফ্ল্যাট-বাড়ীতে উঠে যাওয়ার ইচ্ছাই ছিল। কিন্তু টাকার পরিমাণ এত কম যে, বিজ্ঞাপন প'ড়ে ভাড়া নিতে গেলে একটা স্নানঘর ভাড়া নিতেও ওর পুরো মাসের আয় যেত ফুরিয়ে। অতএব সে মাসীমাব হোটেলেই উঠে যাওয়ার ব্যবস্থা মনে মনে পাকা করেছে। কিন্তু নতুন গণ্ডগোল বাধিয়েছেন ছোটসাহেব। শ্যামনগরে তাকে নাকি যেতেই হবে। যেতেই হবে? কেন যাবে? হোটেলের পাঁচতলার ছাদে পায়চারি করতে লাগল মহীতোষ ঘোষ। আপিস বন্ধ আজ। কেতকীর আসবাব কথা আছে। সুতপা তো আসবে ব'লে কত দিনই কথা দিয়েছিল, আসে নি। হোটেলের পাঁচতলায় এত দিন বাস কবতে করতে সে প্রায়ই চেয়ে থাকত রাস্তার দিকে। কার্নিসেব ওপবে হাতেব কনুই দুটো ঠেকিয়ে বেখে রাস্তার লোক দেখত সে। দেখেছে ঘণ্টাব পর ঘণ্টা। মানুষগুলোকে অত ওপব থেকে ছোট ছোট দেখায়। মানুষ দেখতে গিয়ে মহীতোষ মেয়েদেরও দেখত। কতদিন মনে হয়েছে, দেখতে ছোটই হোক না, দু'একটি মেয়ে কি পাঁচতলায় উঠে আসতে পারে না? এসে একটু গল্প ক'রে গেলে বড় মেয়েদেরই বা ক্ষতি হ'ত কি? কিন্তু মহীতোষ বেঁচে যেত। মরুভূমির সঙ্গে পাঁচতলাটা সে তুলনা করতে চায় না। তবুও এক এক সময় চোখ দিয়ে জল পড়ত ওর। স্নেহ-মমতা, এমন কি নরম ব্যবহারেব একটু স্পর্শ পেলেও হোটেলের জীবনটা এত কঠিন মনে হ'ত না। আপিসের অত্যাচারও সে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দোহাই দিয়ে সহ্য ক'বে যেত। কিন্তু পরিবেশের পরিবর্তন হ'ল কই? কখনও-সখনও নিচে-ওপরে ওঠা-নামার সময় অপর বাসিন্দাদের ঘরে দু'একটি মেয়েকে গল্প করতে মহীতোষ দেখেছে—দাঁড়িয়ে গেছে একটু। তাইতেই যেন সে গঙ্গা-স্নানের পুণ্য নিয়ে আপিসে গিয়ে ঢুকেছে। কাজ করেছে ডবল

উদ্যম নিয়ে। সুতপা বোধ হয় মহীতোষের এত বেশি খবর রাখে না —রাখতে চায় নি। অথচ এইটুকু ছাড়া মহীতোষের আর কোন ব্যক্তিগত খবর কিছু ছিল না। যাক সে জন্যে অনুতাপ ক'রে লাভ নেই। চোখের জল ফেলবার মত দুর্বলতাকে সে জয় করেছে। মহীতোষ আর একা নয়। গোটা আপিসটাই ওর গায়েব সঙ্গে লেগে রয়েছে। এত বড় একটা বৃহৎ অস্তিত্বকে ছাদের ওপব থেকেও ছোট দেখায় না।

কার্নিসের ওপরে একটু বেশি ঝুঁকে দাঁড়াল মহীতোষ। হোটেলের দরজা দিয়ে কেতকী ঢুকছে। এসেছে কেতকী, কেতকী আসছে। মহীতোষ নীচে নামতে লাগল। চারতলা থেকে তিনতলায় নামল সে। নামতে হবে দোতলাতেও। মহীতোষ কেতকীকে একতলা থেকেই সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসতে চায়। হোটেলের বাসিন্দারা সবাই দেখুক—কি দেখবে যেন? প্রশ্নটাব উত্তর খুঁজতে গিয়ে মহীতোষ দাঁড়িয়ে পড়ল কোন্ একটা তলার মাঝামাঝি জায়গায়। আধ মিনিট দেরী করতে হ'ল। কেতকী তখন ওর সামনেই এসে দাঁড়িয়েছে।

"এস, এস—" বেশ জোরে জোরে, গলার আওয়াজ ওপর দিকে তুলে, অভ্যর্থনার গায়ে মেদমজ্জার বাহুল্য দিয়ে মহীতোষ বলতে লাগল, "তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। এস, দাঁড়িয়ে পড়লে যে?"

"আর ক'তলা বাকি?" জিজ্ঞাসা করল কেতকী। উত্তেজনার মুখে মহীতোষও চট ক'রে বলতে পারলে না, ঠিক কোন্ তলার কোন্ জায়গায় সে দাঁড়িয়ে আছে। পেছন দিকে সিঁড়ির মুখে ঘরের নম্বরটা দেখে সে বলল, "এই তো আদ্ধেকের একটু বেশি উঠলে—"

মহীতোষ সাড়ে তিনের মধ্যে তা হ'লে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। যত তাড়াতাড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে ও নামছিল ভেবেছিল, তত তাড়াতাড়ি সত্যিই সে নামতে পারে নি।

মহীতোষের ঘরে ঢুকে, না জিরিয়েই কেতকী বলল, "খবর

শুনেছ? বড়সাহেব নাকি কোম্পানীর টাকায় সরকার-কুঠিটা কিনছেন।”

“খুব ভাল। ওই মারোয়াড়ীটার গ্রাস থেকে হোটেলটা বাঁচবে। আমি তো ওখানেই উঠে যাব ভাবছি।”

“হোটেল থেকে হোটেলে গিয়ে লাভ কি? আমার কিন্তু নিরিবিলিতে আলাদাভাবে থাকতে ইচ্ছে করে।” একটু বেশিই যেন এগিয়ে পড়ল মনে ক’রে কেতকী পিছুবার চেষ্টা করল, “ছেলেবেলা থেকে হাজার রকম লোক দেখে দেখে আমার একলা থাকতে সাধ হয়। তুমি তো জান, রাঁচীতে আমাদের একটা হোটেল মত বাড়ী আছে?”

“হ্যাঁ, তুমি বলছিলে বটে, সেই বাড়ীটাই তোমার পরিচয়।”

“পরিচয়টা দেবার জন্যেই তোমার কাছে আজ এসেছি।”

“জানবার কৌতূহল কিন্তু আমাব একটুও নেই, কেতকী।”

“কমরেড—” ফস ক’রে কথাটা বেরিয়ে গেল কেতকীর মুখ দিয়ে। বেরিয়ে যখন গেছে তখন আর রোখবার দরকার নেই। কেতকী বিরতিটাকে আর বিলম্বিত করল না। সামলে নিয়ে বলল, “কমরেড, আমার দরকারেই তোমায় বলছি। তুমি ইউনিয়নের কর্মকর্তা, সবাব সব ইতিহাসই তোমার জানা উচিত। তা ছাড়া কলকাতায় এসে সত্যি কথা বলার অভ্যাসটা একেবারে নষ্ট হ’য়ে গিয়েছিল। এখন আমার কতটা উন্নতি হয়েছে তা কি তুমি জানতে চাও না?”

মুহূর্তের মধ্যে অভিভূত হ’য়ে পড়ল মহীতোষ। এত বেশি হ’ল যে, ওর মুখ দিয়ে আর একটি কথাও সরতে চায় না। চেষ্টা ক’রে সরাল মহীতোষ, “তা হ’লে বলো, শুনি।”

পাঁচতলার ঘরে নতুন ঐশ্বর্য! উলটো দিকের কোটিপতির বাড়ীটাও কত ছোট দেখাচ্ছে আজ। দেখাক, ছোট হ’তে হ’তে বিন্দুর মত হ’য়ে যাক। বিন্দুটা গ’লে গিয়ে ঘামের মত শুষে যাক ধরিত্রীর বুকে, মহীতোষ সেদিকে আর দৃষ্টি দিতে চায় না। কেতকীর সামনে

আজ আর রাজনীতির আগুন জ্বালাল না মহীতোষ। সুতপা আর কেতকী এক ডালের ফুল নয়। হয়তো সুতপা অনেক ওপরের ডালে ফুটে আছে, কেতকীর ডালটি সর্বনিম্নে। তা হোক, ফুল যে ডালেই ফুটুক তবুও সে ফুল। আলোচনাটা মহীতোষ নিজের মনে মনেই করছিল—ক'রে সুখী হ'ল সে। সুখের জন্যেই সে পয়সা রোজগার করছে, সুখের জন্যেই সে বেঁচে আছে। এই তো ওর এক লাইনের রাজনীতি। অথচ, সুতপা হাজার লাইন না হ'লে যেন সুখ কথাটার অর্থও বুঝতে পারে না। মহীতোষের খুব ইচ্ছে হ'ল সুতপা এসে দেখুক, হ্যারিসন রোডের এই সকুমত লম্বা ধাঁজের হোটেলের পাঁচতলার ছাদ থেকে সে আজ সুখের পায়রা ওড়াচ্ছে। পায়রাটি সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছে রাঁচীর কেতকী মিত্র।

"তুমি তো জান—" একেবারে খাঁটি মেয়েলি সুরে সুরু করল কেতকী—"আমার বয়স যখন ছ'মাস, বাবা তখন মারা গেলেন। মায়ের বয়স তখন আঠারো, মাত্র আঠারো। তার মানে, আমার আর মায়ের মধ্যে মাত্র আঠারো বছরের তফাৎ। এই কথাটার সব-চেয়ে দরকারী দিকটা হ'ল আমার যখন বিশ বছর বয়স, মায়ের তখন আটত্রিশ। গোড়ার দিকে আর্থিক কষ্ট তাঁর যথেষ্টই হয়েছিল। কিন্তু আমি যখন যুবতী, তখন তাঁর কষ্ট কিছু ছিল না। তবে উদ্বৃত্তও কখনও দেখি নি। রাঁচীতে বহু জায়গা থেকে হাওয়া পরিবর্তনের জন্যে লোক আসেন। মা পেইং-গেস্ট রাখতেন। রেখে আসছেন বহু বছর আগে থেকেই। বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী এবং কলকাতার একাধিক ধনী ও প্রতিষ্ঠাবান লোকেদের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা মুখে মুখে সারা ভারতবর্ষে প্রচার হ'য়ে পড়ে। একবার যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে দেখেছি অনেকেই আবার আসবার জন্যে কথা দিয়ে যেতেন। আজ থেকে পাঁচ বছর আগে সকালবেলার ট্রেনে এক ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হলেন আমাদের বাড়ী। পেইং-গেস্ট। শহরে কোথায় খোঁজ পেয়ে তিনি এখানে চ'লে এসেছেন। জায়গা হবে কি? মা

বললেন, হবে। টাকাকড়ির কথাও সব পাকা হ'য়ে গেল। আগাম দিলেন সাত দিনের। ভাল লাগলে আরও সাত দিন থাকবেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ছ' বছর রইলেন। আমি তাঁর দিকে যখন চোখ মেলে চাইলাম, তখন তাঁর ছ'মাস থাকা হ'য়ে গেছে। ধনীলোক নন, মধ্যবিত্ত। বয়স পঞ্চাশ, চুল সব পাকা। চুল বেশি ছিলও না, সবটাই প্রায় টাক। স্বাস্থ্য তাঁর এমন কিছু ভাল নয়। ভাল নয় ব'লেই তো রাঁচী এসেছিলেন হাওয়া পবিবর্ত্তনের জন্যে। নেশা করতেন না, এমন কি শখ ক'রে একটা সিগারেট পর্যন্ত খান নি। কোন সূত্রে তাঁর আত্মীয়স্বজন কিংবা বন্ধুবান্ধবকে আমরা চিনতাম না। তিনি যা ঠিকানা দিয়েছিলেন তাতে আমরা জানতাম তিনি শ্যামবাজার অঞ্চলের লোক। ঠিকানা ভুল নয়, সেই ঠিকানা থেকে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে চিঠি আসত। তাঁর বড় ছেলে লিখত খামে, স্ত্রী লিখতেন পোস্টকার্ডে। বড় ছেলের বয়স তখন পঁচিশ। মোটামুটি ভাল চাকরীই করত সে। প্রথমে চিঠি আসত ঘন ঘন। বছর শেষ হওয়ার পর চিঠির সংখ্যা ক'মে গেল। ভদ্রলোক পেনসন পেতেন। স্বাস্থ্য ভাল নয় ব'লেই তিনি মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। মায়ের সঙ্গে তাঁর খুব ভাব হ'ল। প্রথমে আমি মায়ের পাশের ঘরেই থাকতাম। ছ'মাস পরেও আমি সেই ঘরেই ছিলাম, কিন্তু মা তাঁর ঘর বদলে ফেললেন। এমনভাবে বদলালেন যে, তাঁর একটা আলাদা মহল হ'য়ে গেল। সবচেয়ে পুরনো চাকর ছাড়া সেদিকে কেউ যেতে পারত না। বুঝতেই পারছ, সেই ভদ্রলোকটিও ওই মহলে থাকতেন। এক ঘরে থাকতেন কিনা ছ'বছর চেষ্টা ক'রেও আমি দেখতে পাই নি। কিন্তু শহরের যারা বাঙালী তারা দেখতে পেল। যে-সব সম্বন্ধ মানুষ সহজে দেখতে পায় না, সেগুলোই তাদের চোখে পড়ল আগে। শুনলে তুমি আশ্চর্য হবে যে, প্রথম সাত দিনের পরে শিবদাসবাবু একদিনের জন্যেও বাড়ীর বাইরে বেরোন নি। ক্রমে ক্রমে শুধু রাঁচী নয়, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে দুর্নামের

হাওয়া বইতে লাগল। পেইং-গেস্ট শেষ পর্যন্ত কেউ আর এসে এখানে উঠত না।” দম নেবার জন্যে কিংবা পুরনো ঘটনা স্মরণ করবার জন্যে কেতকী একটু থামল।

মহীতোষ জিজ্ঞাসা করল, “মাকে তুমি প্রশ্ন করো নি?”

“প্রথম দিকে ঘন ঘন করতাম, শেষের দিকে একটাও না। তিনি শুধু বলতেন, বাড়ীঘর টাকা-পয়সা সব তাঁর। জবাবদিহি করতে তিনি রাজী নন। আমায় রোজগারের পথ দেখতে বলতেন তিনি। কিংবা বিয়ে করতে। বিয়ে করতে যখন বললেন, তখন রাঁচীর ডুরাণ্ডাপাড়া দিয়ে বাঙালীরা যাওয়া-আসা করত বটে, কিন্তু বিয়ের পাত্র সেখানে আসত না। এই প্রথম আমি ভবিষ্যতের কথা ভাবতে লাগলাম। ওখানকার কলেজে আই-এ পড়ছিলাম আমি। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উঠেও এলুম। শিবদাসবাবুর যখন এক বছর থাকা হ'য়ে গেল, আমি তখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উঠেও বেরিয়ে এলাম কলেজ থেকে। কেবল মেয়েরা নয়, কলেজের বাঙালী অধ্যাপিকারাও আমাকে কেন্দ্র ক'রে গল্পগুজব সুরু ক'রে দিলেন। প্রথমে আড়ালে, শেষের দিকে একেবারে সামনাসামনি। কথাটা রটল মা এবং আমাকে কেন্দ্র ক'রে। যদিও আমাদের দু'জনের মধ্যে আঠারো বছরের তফাৎ, তবুও পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকলে মা-মেয়েকে চিনে নিতে লোকের অসুবিধেই হ'ত। মায়ের মুখে নয়, বাইরের লোকের মুখে শুনতে পেলুম, শিবদাসবাবু বিরাট জমিদার। শ্যামবাজার থেকে নয়, বেলগাছিয়া কিংবা পাইকপাড়া থেকে তিনি এসেছেন। যদিও শিবদাসবাবুর উপাধি ছিল চ্যাটার্জি, কিন্তু এঁদের মারফৎ খবর রটল তিনি সিংহ। তাঁকে সিংহ এবং জমিদার না করলে পাইকপাড়ার ঠিকানার কোন অর্থ থাকে না। শিবদাসবাবুর গায়ের রং ময়লা। অথচ সারা শহরে তিনি ধবধবে ফরসা মানুষ ব'লে প্রচারিত হ'তে লাগলেন। শিবদাসবাবু প্রথম সাত দিনের মধ্যে দিন দুয়েক বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। সাইকেল রিকশায় চেপে প্রথম দিন বেরিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় দিন বেরুলেন হেঁটে, ফিরলেন রিকশায়। কিন্তু কলেজের এক অধ্যাপিকার মুখে আমি নিজের কানে শুনে এলাম, শিবদাস সিংহ মস্ত বড় একটা গাড়িতে আমাদের নিয়ে হাওয়া খেতে যান। অধ্যাপিকা কলকাতার টালা ট্যাঙ্কের সন্নিকটে থাকতেন। সেখান থেকে কলেজ স্ট্রীটের বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পড়তে আসতেন। পাইক-পাড়ার সিংহবাবুদের বড় গাড়িটা তিনি বাসে ব'সে টালার পোল পার হ'তে দেখেছেন, একদিন নয়, অনেক দিন। সেই গাড়িটাই নাকি আমাদের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। অধ্যাপিকা নিজে দেখেন নি, তবে লোকের মুখে যে রকম বর্ণনা তিনি শুনেছেন তাতে পাইকপাড়ার সেই গাড়িটাই হবে। আর সেই গাড়িটাই যদি হয়, তা হ'লে শিবদাস সিংহের অনেক টাকা—লক্ষ লক্ষ, কিংবা কোটির চেয়েও বেশি। কলেজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি শুধু টাকার হিসেবই দিচ্ছিলেন না, কি ক'রে অত টাকা এল তার মূলের খবরও দিলেন। জমিদারী না থাকলে কি হবে, উচ্ছেদ-আইন পাস হওয়ার আগেই শিবদাসবাবু লাখ পঞ্চাশের কোম্পানীর কাগজ কিনে ফেললেন। জমিদারী বেচবার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। কি ক'রে পেলেন? মুচকি হেসে অধ্যাপিকা বললেন, জমিদারী-উচ্ছেদ আইনের কথা যখন বাংলা দেশের কেউ জানত না, শিবদাস সিংহ তখন জানতেন। ভাবছ, আমি প্রতিবাদ করি নি? করেছিলাম। সব কথা মেনে নিয়েও আমি যখন বলতাম যে, তিনি সিংহ নন, চ্যাটার্জি—মহীতোষ, তুমি জান না, এমনভাবে এঁরা সবাই হেসে উঠতেন যে, শেষ পর্যন্ত আমিও তাঁকে সিংহ ব'লে ভাবতে লাগলাম। ঘর থেকে তিনি বাইরে আসতেন না, তবুও যেন হঠাৎ কখনও-সখনও আমার মনে হ'ত, পাইকপাড়ার সেই বড় গাড়িটায় চেপে আমরা হাওয়া খেতে যাচ্ছি রামগড় পাহাড়ের দিকে। এমনি অবস্থায় দুটো বছর কেটে গেল। মায়ের কিছু ক্ষতি হ'ল কিনা জানি না, আমার হ'ল। শিবদাস চ্যাটার্জি নামে একজন পেনসনপ্রাপ্ত বুড়ো মানুষের সঙ্গে নামটা

আমার জড়িয়ে গেল। লোকের মুখে শুনে মনে হ'ল, কেবল ফাঁকা নামটা নয়, আমার দেহটাও কলঙ্কিত হয়েছে। তাতেও বিচলিত হই নি আমি। বিচলিত হলাম দু'বছর পরে, যেদিন শিবদাসবাবুর বড় ছেলে অমিয় চ্যাটার্জি এসে উপস্থিত হ'ল আমাদের বাড়ী। বাবাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছে সে। আগেই বলেছি বয়স তার পঁচিশ বছরের বেশি নয়। এখন বলছি, অমিয় দেখতেও সুন্দর—অবিবাহিত। খেলোয়াড়দের মত শরীরের বাঁধুনি তার শক্ত, গায়ের রং ফরসা। আরও নানাবিধ গুণের অধিকারী ছিল সে। গান গাইতে পারে। পারে যে তার প্রমাণ অমিয় আজও কলকাতার বেতার-কেন্দ্রে গিয়ে গান গায় নি। কিন্তু বেতার-কেন্দ্রে সে গেছে—গেছে বাংলাসাহিত্যের সমালোচক হ'য়ে। অমিয়র শুধু একটা দোষই আমার চোখে পড়েছিল। সে তোতলায়, কথা কইতে কইতে প্রায়ই তার জিভ যেত আটকে। সাহিত্যের সঙ্গে ওর বিশেষ কোন যোগাযোগ ছিল না, তবুও ওকে সমালোচক হ'তে হয়েছিল। বেতার-কেন্দ্রের একাধিক পরিচালকের মধ্যে ওর এক বন্ধুও ছিলেন উচ্চাসনে উপবিষ্ট। অমিয় বাধ্য হ'য়েই সমালোচক হ'ল। বন্ধুটির জন্যেই হ'তে হ'ল। তিনি নিজে সাহিত্য ভালবাসেন। বিনা খরচে উপহারের বই পেয়ে পেয়ে তাঁর সাহিত্যপ্রীতি জন্মায়। এসব কথা অমিয় আমায় বলেছিল। ওর সামনে আমিও একদিন গান গেয়েছিলাম। গান শুনে সে আমায় কলকাতার বেতার-কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার জন্যে উৎসাহ দেখিয়েছিল এবং নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা প্রমাণ করতে গিয়ে সে তার বন্ধুর কথা উল্লেখ করে। সেই সঙ্গে ওর নিজের কীর্তির দৃষ্টান্ত দিতেও বাধ্য হয়। তোতলামির জন্যে কলকাতার কেন্দ্রে ওর কোন অসুবিধে হয় নি। দু' বছর পর পিতাপুত্রের মিলন হ'ল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম আমি। বাবাকে সে নিয়ে যেতে এসেছে। শুনলাম, শিবদাসবাবু দু'দিন পরেই চ'লে যাচ্ছেন। এই দু'দিন অমিয়র সঙ্গে মেশবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছি। তোমাকে বলতে আপত্তি

নেই মহীতোষ, ওই দু'দিনের মধ্যে আমি আমার ভবিষ্যতের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাই নি। ভেবেছি, শিবদাসবাবুর জন্যে যতটা ক্ষতি হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি লাভ হবে অমিয়র জন্যে। অমিয়র মূলধন আছে—বয়স ও স্বাস্থ্যের মূলধন। ওর সঙ্গে দু'দিন পর আমিও কলকাতা যেতে পারি কিনা তেমন প্রশ্ন যে অমিয়কে করি নি তাই-বা বলি কি ক'রে? করেছি—অবশ্যই করেছি। ঝড়ের মুখে অমিয়-বন্দরটিকে নিরাপদ মনে হয়েছিল। দু'দিন পরে শিবদাসবাবুকে ট্রেনে তুলে দিয়ে অমিয় ফিরে এল। বেরুবার আগে থেকে ঘরের মধ্যে দরজায় খিল লাগিয়ে ব'সে ছিলাম আমি। শিবদাসবাবুর মুখ আমি দেখতে চাই নি। গত দু'বছরের অদর্শনে তাঁর মুখের সঠিক আকৃতি আমার মনেও ছিল না। সে যাক, তিনি বিদায় হ'য়ে গেলেন। ফিরে এসে অমিয় বলল, 'ট্রেন ছাড়বার পরও আমি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দূরের সিগনালটা যখন পার হ'য়ে গেল, তখন বেরিয়ে এলাম।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'এত দেরি করলে কেন? ট্রেন তো প্রায় এক ঘণ্টা আগে ছেড়ে গেছে'?'

'বাইরে বেরিয়ে দেখি বাংলা দেশের দু'জন সাহিত্যিক একসঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছেন। একজন কবি, সমালোচক ও নামকরা মাসিক কাগজের সম্পাদক। আর অন্যজন সরকারী চাকরী করতেন, সেই সঙ্গে সাহিত্য। এখন তিনি চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। দু'জনেই স্টেশনের উলটো দিকের হোটেলে এসে উঠেছেন—বি-এন-আরের হোটেল। এসেছেন আলাদা আলাদা। এঁরা দু'জন সাহিত্যক্ষেত্রেও আলাদা ছিলেন। আজ একসঙ্গে দেখলাম। বিকেলে চা খেতে ডেকেছেন আমায়।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমায় কেন?'

'বেতার-কেন্দ্র থেকে আমি বাংলা উপন্যাস-গল্পের সমালোচনা করি যে!'

বাড়ীর সামনের বারান্দায় ব'সে গল্প করছিলাম আমরা। পুরনো চাকরটা এসে বলল, অমিয়কে মা একবার ডাকছেন। বোধ হয় তিনি জানতে চাইছেন যে, শিবদাসবাবু নিরাপদে গাড়িতে উঠতে পেরেছেন কিনা। অমিয় মায়ের সঙ্গে দেখা করতে ভেতরে গেল—তার পর যখন বেরুলো তখন ছ'মাস পার হ'য়ে গেছে।"

"কি বললে?" মহীতোষের গলায় যেন ইনক্লাব জিন্দাবাদের সুর।

"বললাম, অমিয়কে ছ'মাস আর দেখতে পাই নি। প্রথম মাসে প্রতি সপ্তাহে পোস্টকার্ড আসত একটা ক'রে। খামও আসত একখানা। শিবদাসবাবু পোস্টকার্ডে লিখতেন, আর তার মা লিখতেন খামে। মাস-দুই পর চিঠির সংখ্যা ক'মে এল। অমিয়র সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা আমি কম করি নি। কিন্তু মা সব সময়েই আমার ওপর চোখ রাখতেন।"

"তাঁকে প্রশ্ন কর নি?"

"প্রথম দু'দিন জবাব পেয়েছি, তার পরে পাই নি।"

"কি জবাব তিনি দিয়েছিলেন?"

"একই রকম। বাড়ীঘর, টাকা-পয়সা, চাকরবাকর সবই তাঁর। অসুবিধে বোধ করলে, অন্য জায়গায় উঠে যেতে বললেন আমায়। কিংবা বিয়ে করতেও পারি। মায়ের জবাব শুনে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'পাত্র কোথায়?'

'রাজা, জমিদার, কেরানী, মেথর, মুদ্দোফরাস, চাই কি মারোয়াড়ীও যদি পাস, বিয়ে করতে পারিস। চাকরী-বাকরি একটা দেখে নে না।' মহীতোষ, কোন কিছু নেওয়ার আগে শহরে এক-দিন বেরুলাম। এক সময়ে বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা আমার কম ছিল না। তাদের সঙ্গেই দেখা করতে গেলাম। গিয়ে অবাক হলাম খুবই। সবাই আমার সঙ্গে হেসে কথা কইল, অমিয়কে নিয়ে ঠাট্টা কেউ করল না। তার খবর সবাই রাখে। সে দেখতে ফরসা, সুন্দর এবং

জোয়ান, তাও এরা জানে। অথচ তার নাম জড়িয়ে আমার গায়ে মৃদু খোঁচা পর্যন্ত কেউ মারল না! বরং আমার উলটো ধারণাই হ'ল। আমি যেন সতী-সাধ্বীর পুণ্য আজ মাথায় ক'রে নিয়ে এসেছি। শিবদাসবাবু বিদায় হওয়ার পর আমার চরিত্রে আর কোন দাগ নেই! এই প্রথম—হ্যাঁ, প্রথম আমার মনে হ'ল, এদের কথাগুলো সব অশ্লীল। আমি চেয়েছিলাম, অমিয়র সঙ্গে জড়িয়ে আমার বিরুদ্ধে ওরা দুর্নামের তুফান তুলুক। মহীতোষ, তুমি হয়তো জিজ্ঞেস করবে, তাতে লাভ কি হ'ত? লাভ কিছু হ'ত না, কিন্তু ব্যাপারটা স্বাভাবিক হ'ত। আমার দেহে অশ্লীলতার আচ লাগত না। আমার মত সুন্দরী স্বাস্থ্যসম্পন্নার মুখে চূণকালি মাখিয়ে দিল অমিয়! তাকে আমি আকর্ষণ করতে পারলাম না। ইতিহাসের ঔরঙ্গজেব আমায় দেখলে কি করতেন জানি না, কিন্তু অমিয় আমায় উপেক্ষা করল! প্রতি মুহূর্তের নৈতিক মৃত্যু আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। পালিয়ে এলাম। দু'বছর আর রাঁচীর দিকে যাই নি। অমিয় ছ'মাস পরে ফিরে এসেছিল কলকাতায় সে খবর আমি রাখি। মায়ের পরিচয় আমি জানতে পারলাম না। মহীতোষ, তোমার কি মনে হয়?"

"মনে হয়, তোমার মা বোধ হয় তুকতাক জানেন।"

"আমার তা মনে হয় না। তা যদি হ'ত, তবে শিবদাসবাবুকে নিয়ে সময় নষ্ট করতেন না। পয়লা নম্বরের পেইং-গেস্টের ভিড় তো সেখানে কম ছিল না। পয়সা ছাড়া, এক পেয়ালা চা দিয়েও তিনি কাউকে আপ্যায়ন করেন নি।"

"তবে?" মহীতোষ উঠে বসল।

"সে প্রশ্ন তো আমারও। হয়তো চেষ্টা করলে, প্রশ্নের উত্তর একটা পাওয়া যাবে। ভাবছি, আবার আমি রাঁচী যাব।"

"তার আগে চল, মাসীমার ওখানে যাই। তাঁকে কথা দিয়ে আসি, দোতলার দু'খানা ঘর আমরা নিলাম।"

"আমরা ?"

"আমরা—তুমি আর আমি।"

"তপাদি'র ঘরের পাশে ?"

"তাই।"

লটারী পাওয়ার উত্তেজনা যেন পেয়ে বসল কেতকীকে। মিনিট পাঁচেক পর্যন্ত মুখ দিয়ে তার কথা বেরুলো না। হ্যাণ্ডব্যাগটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। মনে হ'ল, কথা যেন এখনও তার ফুরয় নি। রহস্যের মুখে আবরু দেওয়া আছে। এ নতুন রহস্য, নতুন আবরু।

মহীতোষ বলল, "মাসীমার পায়ের ধুলো নেব আমরা এবং তা আজই। তোমার আপত্তি নেই তো ?"

"আপত্তি ? না।" এই ব'লে সে হ্যাণ্ডব্যাগটা খুলে ফেলল। সিদ্ধান্তে পৌঁছতে ওর আর সময় লাগল না, ছোটসাহেবের লেখা চিঠিখানা ব্যাগ থেকে বার ক'রে নিয়ে কেতকী বলল, "প'ড়ে দেখ।"

"কি আছে ওতে ?"

"আমার স্খলনের চিত্র—ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট।"

"আমি দেখতে চাই নে, ছিঁড়ে ফেলতে পার।"

"মহীতোষ, এ চিঠিখানা তুমি দেখবে ব'লেই সঙ্গে নিয়ে এসেছি। নইলে আগেই আমি ছিঁড়ে ফেলতাম।"

চিঠিখানা পড়ল মহীতোষ। একবার নয়, দু'বারই পড়ল সে। তার পর টেবিলে স্তূপীকৃত কাগজের ওপর চিঠিখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে বলল, "একদিন একসঙ্গেই আমরা রাঁচী যাব। তোমার মা আমাদের পেইং-গেস্ট রাখবেন তো ? কেতকী—"

"মহীতোষ—"

কেউ কিছু বলল না। দু'জন দু'জনের দিকে চেয়ে রইল শুধু। সরু লম্বা ধাঁজের হোটেলটার পাঁচতলার ছাদে প্রচুর হাওয়া আজ।

কেতকীর দু'একটা চুল মহীতোষের মুখের ওপর উড়ে পড়ল। আদিম মানুষের মুখের স্বাদ ভাল লাগল আজ—কেতকী এবং মহীতোষ দু'জনারই।

॥ তিন ॥

ধর্মঘটের বিজ্ঞপ্তি পেশ করা হ'য়ে গেছে। বড়সাহেবের হাতে পৌঁছে দিয়ে এসেছে মহীতোষ নিজেই। দাবির দফা একটা নয়, অনেক। মহীতোষকে সরাবার চেষ্টা না করলে হয়তো এত তাড়াতাড়ি কোন দাবির কথা উঠতই না। কিন্তু এখন উঠেছে। অ্যাকশন কমিটি তৈরী হয়েছে। মহীতোষের বদলির অর্ডার প্রত্যাহার করলেই চলবে না। মাইনে বাড়াবার দাবি মানতে হবে। পুজো আসছে, পুজো-বোনাস চাই। ক্যান্টিনের জন্য দু'খানা ঘর চাই। কর্মচারীদের অসুখ করলে ডাক্তার পাওয়া যায় না। পেলেও অনেক ভিজিট, ডাকা সম্ভব হয় না। বউকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে বাচ্চা ছেলেকে হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাওয়াতে হয়। তাকে বোঝাতে হয় যে, হোমিওপ্যাথি ওষুধই হচ্ছে খাঁটি ওষুধ। ওতে ব্যবসা নেই, ব্যবসা সব এলোপ্যাথির রাজ্যে। অতএব কর্মচারীদের জন্যে এলোপ্যাথি চিকিৎসার বন্দোবস্ত ক'রে দিতে হবে। দাবির তালিকা হাতে পেয়ে বড়সাহেব মনোযোগ দিয়ে পড়লেন। একটা দাবিও অন্যায় দাবি ব'লে মনে হ'ল না তাঁর। বিলেতের আপিসে এর চেয়েও অনেক বেশি সুবিধে দেওয়া হয়। কিন্তু এখানে ক্ষমতা তাঁব সীমাবদ্ধ। তিনি চাকরি করতে এসেছেন, তাঁর হাত-পা বাঁধা। বিলেতের আপিসের সঙ্গে দু'তিন দিন শুধু তার-বিনিময় চলল। হেওয়ার্ড সাহেবের সাধ্যে যতটা কুলোয় ততটা তিনি করলেন। প্রথম দিনের তারগুলোতে আশার কথা ছিল। কোম্পানীর ডিরেক্টররা মিটিং ডাকছেন। একটা মিটিং হ'য়েও গেছে। হেওয়ার্ড সাহেবের

সহানুভূতির কথা সব মিটিংএ পেশও হয়েছিল। ডিরেক্টররা সন্তুষ্ট। কোম্পানীর একটা বড় গুদাম-ঘর চাই। গড়িয়ায় একটা বাড়ী পাওয়া গেছে, জমিও কম নয়। ভাড়া নেওয়ার চাইতে কিনে ফেলা ভাল। এত সস্তায় কলকাতায় এত বেশি জমি, তাও দোতলা বাড়ীসুদ্ধ, পাওয়া খুব ভাগ্যের কথা। কোম্পানীর যখন পুঁজি আছে তখন কিনে ফেলাই ভাল। বিলেতের আপিস থেকে পাকা আদেশ তাড়াতাড়ি পৌঁছনো চাই। বাড়ীটার জন্যে অন্য খদ্দেরবাও ওৎ পেতে ব'সে আছে, ইত্যাদি। গত দু'দিনের মধ্যে যে সব জবাব এসেছে তাতে পাকা আদেশ পাওয়া যাবে—যাবেই ভাবলেন হেওয়ার্ড সাহেব। জেটমলকে টাকা সব দিয়ে দেওয়া হবে ব'লে তিনি খবরও পাঠিয়েছেন। খবর পেয়ে জেটমল খুশী হয় নি।

কিন্তু দিনতিনেক পরে বিলেতের জবাবগুলো সব এলোমেলো হ'তে লাগল। মাইনে কিছু বাড়ানো যেতে পারে। হেড-আপিস তার করেছে, বাড়ী কেনা এখন কি উচিত হবে? এসপ্লানেড থেকে গড়িয়া কত দূর? এমনিধারা প্রশ্নের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে লাগল। হেওয়ার্ড সাহেবের সন্দেহ হ'ল, অন্য দিক থেকেও হেড-আপিসের সঙ্গে তার-বিনিময় চলছে। ওখানে ব'সে ডিরেক্টরেরা এদিকের খুঁটিনাটি খবরও সব পাচ্ছেন। কোম্পানীর গুদামে যে তিনি ইউনিয়নকে আপিস খুলতে দিয়েছেন তাতে ডিরেক্টররা অসন্তুষ্ট হন নি। কিন্তু এত অল্প ভাড়ায় দেওয়াতে সন্তুষ্ট হবেন কি ক'রে? ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটে প্রতি স্কোয়ার-ফুট ফ্লোর-স্পেসের রেট যে কত তাও তাঁরা জেনেছেন। প্রতিদিনই হেওয়ার্ড সাহেবের বিস্ময় বাড়ছে। এখান থেকে কে তার পাঠাচ্ছে? কর্মচারীদের যাতে ভাল হয় সেই জন্যেই চেষ্টা করছেন তিনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তাঁর চেষ্টার কুঁড়িতে ফল ধরবে না। গড়িয়ার কুঁড়িটি ঝ'রেই গেছে ব'লে ভাবলেন বড়সাহেব। কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁরও উত্তেজনা বাড়তে লাগল।

আপিসের পরিবর্তনও চোখে পড়ল সবার। মহীতোষকে যেসব

রুই-কাৎলারা পুঁটিমাছ ভেবে এযাবৎকাল তার দিকে চেয়ে দেখেন নি, তাঁরা এখন ওকে ভাল ক'রে দেখছেন, ইজ্জৎ বেড়েছে মহীতোষের। শুধু মহীতোষের নয়, কম মাইনের পুঁটিমাছদের সবার। বড়বাবু পর্যন্ত অরিন্দমের সঙ্গে কথা কইছেন! অরিন্দমের কাছে বেয়ারা মারফৎ বড়বাবু কাল নাকি এক বাক্স কাঁচি সিগারেটও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিছুদিন আগে অরিন্দমকে একটা বিড়ি দিয়েও সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করেন নি তিনি। সন্তুষ্টি, অসন্তুষ্টির কথাটা বড় নয়, উল্লেখযোগ্য নয়। মহীতোষ ভাবল, আপিসের মাঝখানে এরই মধ্যে একটা বিপ্লব ঘ'টে গেছে। কর্মচারীরা মানুষ হিসেবে সম্মান পেয়েছে। পুরো না পেলেও কিছুটা পেয়েছে, ক্রমে ক্রমে পুরোই পাবে। যারা মেহনত বেচে পয়সা রোজগার করছে তাদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ থাকতেই পারে না। মাইনের উঁচু-নীচু থাক, তাতে মহীতোষের আপত্তি নেই।

মহীতোষের টেবিলের সামনে বড়বাবু এসে দাঁড়াবেন তেমন স্বপ্ন পাগল পর্যন্ত দেখে না। আজ তিনি একটা ফাইল হাতে নিয়ে মহীতোষের সামনে এসে বললেন, "এই যে মহীবাবু—ফাইলটা একটু দেখুন তো—"

"ছি ছি, আপনি আবার উঠে এলেন কেন? আমাকে ডেকে পাঠালেই পারতেন।" মহীতোষ উঠে দাঁড়াল।

"থাক, থাক, বসুন আপনি। দু'পা হেঁটে আসতে আমার এমন কষ্ট কি হ'ল? সারাটা দিন ব'সে ব'সে ডায়াবেটিস ডেকে নিয়ে এলাম।" মাথাটা মহীতোষের দিকে হেলিয়ে দিয়ে বড়বাবুই বললেন, "ধর্মঘট ছাড়া আর তো কোন পথ দেখতে পাচ্ছি নে। পয়লা তারিখ থেকে ধর্মঘট হবে তো?"

"দাবি না মানলে হবে!"

খবরটা সংগ্রহ ক'রে তিনি এসে আবার নিজের চেয়ারে ব'সে পড়লেন।

একটু আগে লাহিড়ী সাহেব চারতলা থেকে নেমে এলেন। বড়সাহেব তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। হেওয়ার্ড সাহেব নাকি অনুরোধ করেছিলেন, "আপাতত মহীতোষকে বদলি করার দরকার নেই। তুমি তোম'র অর্ডারটা প্রত্যাহার কর, মিস্টার লাহিড়ী!"

"আপিসের ডিসিপ্লিন সব নষ্ট করেছে মহীতোষ। প্রত্যাহার করা অসম্ভব। ইচ্ছে হয়, আমাব অর্ডার তুমি বাতিল কর।"

"মিস্টার লাহিড়ী, তবুও একবার তোমায় ভেবে দেখতে বলছি—"

"ভেবে দেখেছি। আমি প্রত্যাহাব করতে পারি নে।"

হেওয়ার্ড সাহেব বাব বার পাইপ ধরাতে লাগলেন। আজ সকালে যে বিলেত থেকে কেব্‌লটা এসেছে তাতে তাঁর আঘাত লেগেছে খুব। তাঁব একটা অনুবোধও কোম্পানী রাখতে চায় না। বড় মিটিংটা আগামীকাল বসবে, সব ক'টি ডিরেক্টরই সেই জন্যে লণ্ডনে এসে হাজির হয়েছেন।

মিস্টাব হেওয়ার্ড শেষ পর্যন্ত তু'তিনটে কাঠি জ্বেলে পাইপটাকে অগ্নিময় ক'রে নিলেন। তার পব অত্যন্ত ঠাণ্ডা মেজাজে একটা খাম লাহিড়ী সাহেবের হাতে দিয়ে বললেন, "তোমার ছুটির অর্ডার—তিন মাসের। ইচ্ছে করলে বিলেত থেকেও ঘুবে আসতে পার। ডিরেক্টররা তোমাব মুখ থেকেই সব কথা শুনতে পাবেন।"

"থ্যাঙ্ক ইউ, সার।" লাহিড়ী সাহেব মচকালেন, তবু ভাঙলেন না। চ'লে এলেন নিজের কামরায়। খবরটা ছড়িয়ে পড়তে বোধ হয় মিনিট দশ লাগল। কেতকী তার চেয়ারে ব'সে উসখুস করছিল। নোট নেওয়ার জন্যে আজ তার একবাবও ডাক পড়ে নি। মহীতোষও কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। ওর যেন একবার মনে হ'ল, সমস্ত ব্যাপাবটার মধ্যে কোথায় যেন একটু ব্যক্তিগত ঈর্ষা আছে। ধর্মঘটের পরিকল্পনাটা পুরোপুরি পরিচ্ছন্ন নয়, নৈর্ব্যক্তিকও নয়। পেট ভ'রে খেতে পাচ্ছি নে ব'লে ধর্মঘট করছি সেকথা ঠিক।

ইউনিয়নটাকে নষ্ট করবার জন্যে ছোটসাহেব চেষ্টা করছেন তাতেও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তবুও—

সামনের দিকে চেয়ে মহীতোষ দেখল, ছোটসাহেব কামরা থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। হলঘরটার মাঝখান দিয়ে মাথা নীচু ক'রে তিনি হেঁটে যাচ্ছেন লিফটের দিকে। সবাই চেয়ে চেয়ে তাঁকে দেখছে, তিনি কাউকে দেখছেন না। পাঁচটা প্রায় বাজে, মহীতোষ উঠে পড়ল, ছুটে গেল লাহিড়ী সাহেবের পেছনে পেছনে। লিফট তখন ওপরে উঠছে। মহীতোষ ডাকল, "সার—"

"কে ?" ঘুরে দাঁড়ালেন ছোটসাহেব, "কি চাই ?"

"চাই না কিছু, বরং দিতে এসেছি।"

"তুমি আমায় কি দিতে পার ?"

চট ক'রে পকেট থেকে তাঁর লেখা চিঠিখানা লাহিড়ী সাহেবের দিকে ধ'রে মহীতোষ বলল, "মিসেস লাহিড়ী ব'সে আছেন গাড়িতে, তাই এইখানেই দিলাম।"

"থ্যাঙ্ক ইউ।" চিঠিখানা হাতে নিয়ে পকেটে ঢুকিয়ে ফেললেন তিনি। লিফটে ঢুকে পড়লেন লাহিড়ী সাহেব। মহীতোষ বলল, "কেতকী আমার ভাবী স্ত্রী।"

লিফট নেমে গেল নীচে। কতটা নীচে তা দেখবার জন্যে মহীতোষ আর সেখানে দাঁড়াল না।

স্মৃতপাব বিবৃতি

॥ এক ॥

উনিশ শো সাতান্ন সালেব আগস্ট মাসটা কিছুতেই যেন শেষ হ'তে চায় না। পয়লা সেপ্টেম্বব আমাব আপিসেব কাজে যোগ দেওয়ার কথা। দিন গুনছিলাম আমি। ভেবেছিলাম, কাজেব মধ্যে ডুবে থাকতে পারলে বাইবের অশান্তি অনেক কমবে। অন্তত গায়ে লাগবে না। ঘটনার দাগ তবুও গায়ে আমার লাগলই। মনের প্রশান্তি জলবিন্দুব মত টলমল ক'রে উঠল। আগস্ট মাসটা এগুতে লাগল দাগ কেটে কেটে। গ্রহনক্ষত্রেব বুকেও ক্ষতের চিহ্ন বর্তমান। গত ক'দিন থেকে চণ্ডীদা আর গণনা-বিদ্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। তাই সে বেঁচে গেছে। আগস্ট মাসেব বাকী ক'টা দিনের ভবিষ্যৎ সে দেখতে পায় নি।

শনিবার দিন সকাল দশটা নাগাদ বড়সাহেব হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন সবকাব-কুঠিতে। আগু-খবর কিছু পাওয়া যায় নি। পাওয়া গেলে এখানে প্রবেশ করতে তাঁব কষ্টই হ'ত। ফটকের সামনে ভিড় দেখতে পেতেন তিনি।

খবব পেয়ে আমি নিচে নেমে আসছিলাম। পেছন থেকে রতন আমায় ডাকল, "দিদি, বড়সাহেব এসেছেন, না?"

"বলবাম তো তাই বললে।"

"তাঁকে জিজ্ঞাসা কর, আমি চেঞ্জে যাব কবে।"

"করব।"

"কলকাতার বাইরে মাস তিন তো থাকতেই হবে—"

"মাত্র তিন মাস কেন রে রতন?"

"আমি টাকাপয়সাব কথাই ভাবছিলাম। দিদি, বড়সাহেবের কাছ থেকে তুমি বরং কিছু বেশি টাকাই ধার চেয়ে নিও। যদি ছ' মাস থাকতে হয়? যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ। তিনি হয়তো একা একা ব'সে আছেন।"

"আমি যাব তোমার সঙ্গে ?"

"না, না রতন !"

"কেন, হাঁটতে আমার তো কষ্ট হয় না—"

"নিচে নামতে কষ্ট হবে, ভাই। আর ওপরে উঠতে—না, রতন, আমি বরং বড়সাহেবকে এখানেই ডেকে নিয়ে আসব।"

আমার কথা শুনে রতন বিছানার ওপব উঠে বসল। আমি ভাবতে পারি নি, হঠাৎ ও এত বেশি উত্তেজিত হ'য়ে উঠবে। আনন্দের আতিশয্যে রীতিমত হাঁপাতে লাগল সে। কথা বলবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগল। অনেক কথা। রাঙা-ভবিষ্যতেব স্বপ্ন ওকে পাগল ক'রে তুলল ! চোখের পাতা দুটো ক্রমাগত মিট্‌মিট্‌ করতে লাগল। নাকের নিশ্বাস দ্রুত। ঠোঁটের শুষ্কতা সারা মুখে ওর কম্পন তুলেছে। ফুটো ফুস্‌ফুসেব সুস্থতা গ'লে যাওয়াব উপক্রম ! ভয় পেলাম আমি। শুইয়ে দিয়ে বললাম, "ব্যস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই, রতন। ব্যবস্থা সব পাকা।"

বসবার ঘরেই বসেছিলেন ক্যাপটেন হেওয়ার্ড। দেয়ালের গর্ত দুটোর দিকে দৃষ্টি ছিল তাঁর। এতগুলো বছর পরেও গর্ত দুটো বোজাবার কেউ চেষ্টা করে নি। যেন স্বাধীন ভারতবর্ষের ফুসফুসে ও দুটো চিরদিনের জন্যে স্থায়ী হ'য়ে রইল।

ঘরে ঢুকতেই মিস্টার হেওয়ার্ড বললেন, "আন্টি এখনও ঘুমচ্ছেন। তাঁর ঘরে গিয়ে দেখে এসেছি।"

"ডেকে দিচ্ছি আমি—"

"থাক, তিনি অসুস্থ। রতন কেমন আছে ?"

"প্রত্যেক দিনই খুব বেশি ক'রে ভাল হ'য়ে উঠছে। আমি তো অবাক।"

"অবাক কেন ?"

"তুমি এখানে আসবার পর থেকেই তার এত বেশি উন্নতি।

আজ সে একতলায় নেমে আসবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিল।"

"কিন্তু—" বড়সাহেব পুনরায় দেয়ালের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন, "কিন্তু আমি তো ওর জন্যে কিছুই করতে পারি নি! কার জন্যেই বা কি করলাম স্তুতপা?"

"কর নি? ভারতবর্ষকে স্বাধীন ক'রে গেলে তোমরা—"

চট্ ক'রে হেওয়ার্ড সাহেব দেয়ালের দিক থেকে চোখ দুটো সরিয়ে নিয়ে এলেন। তার পর সেই দিকে পেছন দিয়ে বসলেন। আমার মনে হ'ল, স্বাধীনতা কথাটা শুনে লজ্জা পেলেন তিনি। কিন্তু একটু পরেই আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হ'ল। বড়সাহেব লজ্জিত হন নি, অপমানিত বোধ করেছেন। তিনি এমন ভাবে ঘুরে বসলেন যে, গর্ত দুটোর দিকে দৃষ্টি পড়ার আর কোন পথই রইল না। বললাম, "মাপ কর বড়সাহেব। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সকালটায় রাজনীতির উল্লেখ না করাই উচিত ছিল।"

"তোমার আর দোষ কি? আধুনিক সভ্যতার কোন্ অংশে রাজনীতি নেই? পৃথিবীর প্রতিটি পরমাণুতেও রাজনীতির বারুদ! কিন্তু—" হেওয়ার্ড সাহেব পাইপটা দাঁতের ফাঁকে ধ'রে রেখে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, "কিন্তু কি?"

"মানুষের প্রতি মানুষের অবিচার সব সময়ে রাজনীতির আয়নায় প্রতিবিম্বিত হয় না স্তুতপা।"

এই সময়ে সরকার-কুঠির বাগানে বেশ বড় রকমের একটা ভিড় জ'মে উঠেছে। মুখে মুখে বৈষ্ণবঘাটার মোড় পর্যন্ত বড়সাহেবের আগমন-সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে আধ ঘণ্টার বেশি সময় লাগে নি। বিজয়বাবু রক্ষিতের মোড় থেকে ছুটতে ছুটতে আসছেন। তিনি এসে যে পৌঁছতে পেরেছেন সেটা বড় খবর নয়। ভেজিটেবল ঘি আর ভারতরাষ্ট্রের বিষাক্ত সরষের তেল খেয়েও যে তিনি ছুটতে পারেন

সেইটেই সব চেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা! চণ্ডীদা ভোরবেলা গোবিন্দপুর থেকে রওনা হয়েছিল। বউকে নিয়ে সে যখন বাস থেকে নামল তখনই খবরটা তার কাছে পৌঁছে গেছে। অসুস্থ বাচ্চাটা তার কোলেই ছিল। সরকার-কুঠির ফটকের কাছে পৌঁছে সে আব বোঝা বইতে পারল না। বউয়ের হাতে পুঁটলিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চণ্ডীদা দ্রুতপায়ে হেঁটে এসে পৌঁছে গেল বারান্দায়। বাকি পথটুকু বউ তার এল একা একা। ভিড়ের মধ্যে বিপ্রদাসবাবুও ছিলেন, ঘবে ব'সে আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলাম। প্রথম দৃষ্টিতে আমি তাঁকে চিনতে পারি নি, পরে পারলাম। ধুতি-পাঞ্জাবী আজ তিনি বর্জন করেছেন। প্যাণ্ট-কোট প'রে এসেছেন বিপ্রদাসবাবু। হাতের ছড়িটি রেখে এসেছেন রক্ষিতের মোড়ে। গলায় 'টাই' বেঁধেছেন। পেনসন নেওয়ার পরে তাঁকে সাহেবী পোশাক পবতে হয় নি। ব্যবহাব করতে করতে এবং ফেলে রাখতে রাখতে প্যাণ্ট-কোটের রং সাদা কিংবা কালো নেই— দু'তিন রকমের রং গ'লে গিয়ে সর্বধর্মসমন্বয়ের মত বিশেষ একটি সমন্বয় হ'য়ে ফুটে বেরুবার চেষ্টা করছে বটে, কিন্তু সমন্বয় ঘটে নি। কোটের বুক-পকেটেব রংটা কালোর দিকে, অথচ ঘাড় দুটো দেখাচ্ছে যেন রোদে-পোড়া কলাপাতার মত।

ব্যাপারটা বুঝলেন বড়সাহেব। তিনি বললেন, "আমি এবাব চলি, তুমি সন্ধের সময় লুডন স্ট্রীটে চ'লে এস। বাত্রের খাওয়া ওখানেই খাবে। তোমার সঙ্গে কথা কইতেই এসেছিলাম। কিন্তু—"

"ভিড় দেখ ভয় পাচ্ছ নাকি?"

"না, ভয় পাচ্ছি না। ভিড়ই তো ভগবান—"

"কি বললে বড়সাহেব?" কথাটা কেমন অদ্ভুত শোনাল, শুধু অদ্ভুত নয়, উলটো। জবাব দিলেন না বড়সাহেব। তিনি বারান্দায় বেরিয়ে গেলেন। বাগানের মধ্যে গড়িয়ার অনেক চেনা এবং অচেনা লোকই ছিল। বিজয়বাবু ভিড় সরাতে লাগলেন, সরাতে হ'ল পথ তৈরি করবার জন্যে। বিপ্রদাসবাবুকে তিনি অভ্যর্থনা ক'রে সেই

পথ দিয়ে নিয়ে আসছিলেন। তাঁর জুতো কিংবা কোট-প্যাণ্টে দাগ লাগল না। ভিড় স'রে দাঁড়িয়েছে, তিনি উঠে এলেন বারান্দায়, মাথাটা নুইয়ে দিলেন নিচের দিকে। তার পর ডান হাতটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, "গুড-মর্নিং সার।"

আমি লক্ষ্য করলাম, বড়সাহেব এবার অপমানিত বোধ করলেন না, লজ্জা পেলেন।

বিপ্রদাসবাবু বলতে লাগলেন, "বিজয়ের সঙ্গে আমার ছোট মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব পাকা হ'য়ে গেছে। আমাদের আর ক্ষমতা কতটুকু বল? আমরা কিছুই করতে পারি না, আমরা যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী—আই মীন, যিনি সব করাচ্ছেন তিনি ওপরে—" বিপ্রদাসবাবু সত্যি সত্যি ওপর দিকে দৃষ্টি দিতে গেলেন। কিন্তু পলস্তারা-খসা সিলিঙের গায়ে ধাক্কা খেয়ে দৃষ্টি তাঁর ফিরে এল। বড়সাহেব বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। বিজয়বাবু মাস্টার, তিনি কান পেতে শুনছিলেন আর গর্ববোধ করছিলেন মনে মনে। তাঁর ভাবী শ্বশুর পেনসন নেওয়ার পরেও ইংরেজী ব্যাকরণের নিয়মকানুন সব মনে রেখেছেন! কর্তা, কর্ম এবং ক্রিয়াপদের মধ্যে একবারও গোলযোগ ঘটে নি। তাঁর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে না হ'লেও দুঃখ নেই। স্বাধীন ভারতবর্ষের মানুষও যে ইংরেজী ব্যাকরণ মনে রেখেছেন সেই তো গর্বের বিষয়। আমার পাশে দাঁড়িয়ে বিজয়বাবু এতক্ষণ এই কথাই বলছিলেন। তাঁর কথা শুনে আমিও মুগ্ধ হলাম। তিনি বললেন, "ইস্কুলে আমি ইংরেজী ব্যাকরণ পড়াই।"

পেছনে দাঁড়িয়ে চণ্ডীদা আর ধৈর্য ধরতে পারছিল না, ছটফট করছিল। বিজয় মাস্টারের ওপর রাগ হচ্ছিল তার। চাকরি কি সে একাই করতে যাবে? রঙ্গমঞ্চের সবটুকু জায়গা সে বিপ্রদাসবাবুকে দিয়ে দখল করিয়ে রাখল। ব্যাপারটা কি? বিজয় মাস্টারের কি বিন্দুমাত্র ধর্মবুদ্ধি নেই? বক্তৃতা দেওযার সময় বিজয় মাস্টার গরীবদের জন্যে কেঁদে-কেটে অস্থির হয়। অথচ যেমনই একটু সুযোগ পাওয়া

অমনই গিয়ে গরীবদের মাথার ওপর পা দিয়ে দাঁড়াল! ছেঁড়া ফতুয়া গায়ে দিয়েছে ব'লে বিজয় মাস্টার চণ্ডীদাকে দেখতে পাচ্ছে না! ক্রমে ক্রমে উত্তেজনা সহ্যের সীমা অতিক্রম করল। ফস্ ক'রে চণ্ডীদা বড়সাহেবের ডান হাতটা টেনে নিল নিজের হাতে। জনতা যেন নিশ্বাস বন্ধ ক'রে এক পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে রইল। বিজয়বাবু লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিলেন। বিপ্রদাসবাবু চণ্ডীদার ফতুয়ার কোণ ধ'রে বাব দুই টান মারলেন, কিন্তু চণ্ডীদার তন্ময়তা ভাঙতে পারলেন না তিনি। বড়সাহেবের হাতের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে গণনার মধ্যে ডুবে গেল সে। রাশি-নক্ষত্রের ছায়াপথে দুষ্টগ্রহটির পিছু নিয়েছে চণ্ডীদা। সে জানে সময় তার বেশি নেই, ফতুয়ার কোণ ধ'রে টানাটানি স্বরু হ'য়ে গেছে। দেরী করলে বিজয় মাস্টার হয়তো তাকে ল্যাং মেরে ফেলে দেবে। সরকাব-কুঠির ফুসফুসের মত তার নিজের ফুসফুসও খুব দুর্বল!

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চণ্ডীদা বলল, "দুষ্টগ্রহটির সন্ধান পেয়েছি। বিপদ খুব সামনে এসে গিয়েছে। সাহেব, এখান থেকে শীগগিরই পালাও তুমি।"

বাধা দিয়ে বিজয়বাবু বললেন, "উনি এলেন তো এইমাত্র। আমার শ্বশুর, মানে বিপ্রদাসবাবুর কথা এখনও শেষ হয় নি। খামকা ভয় দেখাচ্ছ কেন?"

"আমি কিছুই দেখাচ্ছি না, বিজয়। চাকরি তুমি একা করবে না, আমরাও করব, কিন্তু চাকরির কথা এখন থাক। তপাদি, পূর্ণিমার মুখে সাহেবের সমূহ বিপদ। পালাতে বল তাঁকে।"

জনতা তখনও চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। বিজয়বাবু শুধু উসখুস করছিলেন। বিপ্রদাসবাবুর শেষ কথাটি এখনও বলা হয় নি। স্বরুতে বিজয়বাবুর মাইনে যদি সাড়ে তিন শ' হয়, তা হ'লে বাড়ী ফিরে গিয়ে তিনি কোট-প্যান্ট ছেড়ে একটু বিশ্রাম করতে পারেন। কিন্তু কোন কথাই আর কেউ বলতে পারলেন না। বড়সাহেব নেমে

গেলেন বাগানে। দরজা খুলে ড্রাইভারটি অপেক্ষা করছিল, গাড়ির পাদানিতে পা দিয়ে বড়সাহেব ইশারা ক'রে চণ্ডীদাকে ডাকলেন। চণ্ডীদা হেঁটেই যেতে পারত, কিন্তু সে বারান্দার ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ল বাগানে। বড়সাহেব পকেট থেকে একখানা বড় নোট বার ক'রে বললেন, "তোমার মজুরী।"

সরকার-কুঠির ভাঙা রাস্তা দিয়ে বড়সাহেবের গাড়িটা যেন হোঁচট খেতে খেতে বেরিয়ে গেল বড় ফটকের বাইরে, কেউ কোন কথা বলল না। বিপ্রদাসবাবু শুধু বললেন, "বিজয়, সুরুতে তিন শ' টাকা খারাপ নয়।"

দুপুরবেলা সরকার-কুঠির কোন খবর রাখি নি, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম যখন ভাঙল বেলা তখন প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। ওপাশের ঘর থেকে রতন আমায় ডাকছিল, বার দুই ওর আমি ডাক শুনেছি। জিজ্ঞাসা করলাম, "কি ভাই?"

"কখন থেকে তোমায় ডাকছি দিদি। কাল রাত্রে তুমি ঘুমোও নি কেন?"

"আজ রাত্রিটা জাগব কিনা। বড়সাহেবের ওখানে নেমন্তন্ন খেতে যাব, কখন ফিরি ঠিক নেই। ডাকছিলি কেন?"

"সমস্তটা দুপুর ঘুমতে পারি নি।"

"কেন রে?"

"মনে হচ্ছে, দোতলার ঘরে বোধ হয় বাসিন্দা এল, নতুন লোকের সব আওয়াজ পাচ্ছি, ঘরদোর ধোয়া হচ্ছে। কে এল দিদি?"

"বিজয়বাবুর তো বউ নিয়ে এসে এখানে ওঠবার কথা। কিন্তু আমি জানি, সকালেও বিজয়বাবুর বিয়ে হয় নি। চণ্ডীদা হয়তো বেশি ভাড়া দিয়ে দোতলার তিনটে ঘরই দখল করল। দেখব নাকি?"

"ছাখ না, মেয়েমানুষের অচেনা গলা—"

"চণ্ডীদা যে তার বউকে নিয়ে এসেছে গোবিন্দপুর থেকে।"

"না দিদি, ইংরেজী বলছিল মাঝে মাঝে। তা ছাড়া একতলাতেও খুব হল্লা-চিৎকার হচ্ছিল।"

"একতলায় আর এখন নামব না ভাই, এখানকার খবর নিয়ে আসছি। আমার বেশি সময় নেই, দেখি বলরামকে ডাকছি, ওর কাছেই খবর সব পাওয়া যাবে।" এই ব'লে আমি দরজা খুলে বারান্দায় এলাম, আশপাশে কাউকে দেখতে পেলাম না।

একেবারে কোণের ঘরটায় উঁকি দিয়ে দেখলাম, বলরাম বালতি আর ঝাঁটা হাতে নিয়ে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। প্রশ্ন করবার আগে বলরাম বলল, "জল আনতে যাচ্ছি। আর এক বালতি আনলেই কাজ শেষ হবে। সবসুদ্ধ সাতখানা ঘর ধুয়ে দিতে হ'ল, বাসিন্দে আসছে।"

"ওপরে কে আসছে? বিজয়বাবুর তো এখনও বিয়ে হয় নি।"

"ওপরে মহীতোষবাবু আসবেন। তপাদি, মহীতোষবাবুর বোধ হয় বিয়ে হ'য়ে গেছে।"

"কি ক'রে জানলি?"

"দেখলুম যে, কি তিরিক্ষি মেজাজ! সহজে খুশী করা যায় না, তার ওপরে আবার খুঁতখুঁতে। জান, ওদিকের ঘরটা তিনি পাঁচবার ক'রে ধোয়ালেন? নিচে থেকে জল টানা কি সোজা কাজ? এই নিয়ে বোধ হয় এক শ' বালতি জল টানলুম। এক শ' পর্যন্ত গুনতে জানি না, হয়তো দু শ' বালতিই টানলুম—টাইগার দেখেছে।" এই ব'লে বলরাম চ'লে যাচ্ছিল সিঁড়ির দিকে। বুঝলাম, মেজাজটা ওর আজ ভাল নেই। কাজ করতে বলরাম ভালবাসে সত্যি, কিন্তু—

ওকে ডাকলাম, "একটু দাঁড়া, আমার ওপর রাগ করলি নাকি?"

"তোমার ওপর রাগ করব কেন? তবে রাগ করেছি তা সত্যি।"

"কার ওপরে?"

"চণ্ডীদার ওপরে, ফুরন ক'রে মাল ব'য়ে আনলুম, তিন দিনে এক

টাকা আট আনা দেওয়ার কথা। কই দু'সপ্তাহ চ'লে গেল, মজুরী পেলুম না।"

"তাগাদা দিস নি?"

"দিই নি আবার! প্রত্যেক দিন শুধু বলে, আর দুটো দিন সবুর করতে। তপাদি, ষষ্ঠীদার ফণ্ডে একটা টাকাও আমি দিতে পারলাম না। কাল মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন, কত বড় মেলা বসবে, খরচের আর অন্ত নেই ষষ্ঠীদার। চণ্ডীদাকে ব'লে আমার মজুরীটা আদায় ক'রে দাও না, তপাদি? আমি রিফিউজী ব'লে মজুরীও পাব না বুঝি?"

জবাবের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল বলরাম। কি বলব ভাবছিলাম, কিছুই বলতে পারলাম না। এত সহজ প্রশ্নের জবাব কত কঠিন ব'লে মনে হ'তে লাগল! চ'লে যাচ্ছিল সে, জিজ্ঞাসা করলাম, "মহীতোষবাবু এসেছিলেন নাকি?"

"তিনি মাসীমার সঙ্গে গল্প করছেন। তাঁর সঙ্গে সেও এসেছে।"

"সে কে?"

"বোধ হয় বউ-টউ হবে। তপাদি, কাল তিনটের সময় কিন্তু কোথাও চ'লে যেও না। মস্ত বড় মেলা বসবে এখানে। তোমরা না থাকলে ষষ্ঠীদা ব্যথা পাবে। বড়সাহেবকে নেমন্তন্ন করবে না?"

"করব।"

"হ্যাঁ, তাঁকেও আসতে বলবে।"

বলরাম আর অপেক্ষা করল না। ঘরে এসে রতনকে সব খবর দিলাম, খবর শুনে রতন খুশী হ'ল। তার খুশী হওয়ার কারণ ছিল —ঘরের পাশে লোক থাকবে। সারা দিন ওকে একা একা থাকতে হয়। খাবার দেবার সময় শুধু বলরাম কিংবা মাসীমা আসেন, সম্প্রতি মাসীমা আসতে পারেন না। বলরামও বাইরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। মাসীমার পরিচর্যার ভারও ওর ওপর। আজকাল খাবার দিয়ে যায় পরেশের মা—সরকার-কুঠির ঠিকে ঝি।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই তৈরি হ'য়ে নিলাম। বড়সাহেবের নেমন্তন্ন

রক্ষা করতে যাচ্ছি, যেতেও কম সময় লাগবে না, এক ঘণ্টা তো বটেই।

মাসীমার ঘরে এসে দেখলাম, মহীতোষ আর কেতকী পাশাপাশি ব'সে আছে। ওদের ঘনিষ্ঠতার কথা মুখে প্রচার করবার দরকার হ'ল না, দেখেই বুঝতে পারলাম। মাসীমার মুখেই শুধু বৈচিত্র্যের অভাব। অসুস্থতার চিহ্ন ছাড়া তাঁর মুখে লক্ষ্য করবার মত আর কিছু ছিল না।

মহীতোষ বলল, "তোমার জন্যেই ব'সে আছি। পয়লা সেপ্টেম্বর আমরা উঠে আসছি মাসীমার এখানে। ওপরের তিনখানা ঘরই আমরা নেব।"

"বিজয়বাবু কোথায় থাকবেন?"

জবাব দিলেন মাসীমা, "বিজয় থাকবে একতলার উত্তর দিকের অংশে। সেখানেও তিনখানা ঘর আছে।"

"ছ'খানা ঘরের হিসেব তো দিলে, কিন্তু বলরাম বলছিল যে, সাতখানা ঘর ধুয়েপুঁছে পরিষ্কার করেছে সে।"

"বলরাম ঠিকই বলেছে। পেছন দিকের ছোট ঘরখানা চণ্ডীকে দেব। চণ্ডীর ভাগে একটা ঘর কম পড়লেও ক্ষতি হবে না।"

"না—চণ্ডীদার দুটো ঘরেই কুলিয়ে যাবে। বলরাম হিসেব দিচ্ছিল, আজ ওকে প্রায় এক শ' বালতি জল টানতে হয়েছে। বোধ হয় এক শ' নয়, তারও বেশি হবে। ভাবছি বলরামকে এবার একটা ধারাপাত কিনে দেব। এক শ' পর্যন্ত গুণতে না শিখলে ও তো পদে পদে ঠকবে। তারপর কেতকী, তোমার খবর কি?"

"ভাল। বড়সাহেব আমায় স্থায়ী কাজ দিয়েছেন আপিসে, অবশ্য গ্রেড আপনার চেয়ে কম।"

বললাম, "ধর্মঘটের পরে গ্রেড বাড়বে। পয়লা সেপ্টেম্বর আপিসে যাব নাকি মহীতোষ?"

"আপাতত ধর্মঘট বন্ধ রইল।"

"কেন ?"

"ছুটির পরে লাহিড়ী সাহেব আর এ আপিসে আসবেন না। তাঁকে বোম্বাইয়ের আপিসে বদলী ক'রে দিয়েছেন বড়সাহেব। তা ছাড়া, মাইনেও সবার কিছু কিছু বাড়বে।"

"ও—তা হ'লে তুমি আর শ্যামনগর যাচ্ছ না ?" কথা আমার প্রায় ফুরিয়ে এল।

মহীতোষ বলল, "না, আমরা এখানেই থাকব—আমি আর কেতকী। অবশ্য বিয়ের পরেই থাকব।"

"বিয়ের আগে এসে থাকলেও আমরা তোমাদের বাধা দেব না। তোমরা পাশে থাকলে রতনের নির্জনতাবোধ কমবে। এবং তাড়াতাড়ি আসতে পারলে ওর নির্জনতাবোধও তাড়াতাড়ি কমবে।"

"আমরা আগামী সপ্তাহে বিয়ের দলিল সই করব।" বলল মহীতোষ।

"দলিল ? হ্যাঁ, কিছু একটা সই করা দরকার। নারায়ণ শিলার সামনে সই করতে হয় না বটে, কিন্তু মন্ত্র পড়তে হয়। দু'রকম বিয়েতেই সাক্ষী চাই। তা তোমরা তো জাতগোত্র মিলিয়েই ভাব করলে, সামাজিক বিয়েতেও বাধা কিছু ছিল না।"

এবার মাসীমা আর চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না। আমার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "হ্যাঁ রে তপা, তুই কি ওদের বিয়ে না ক'রেই ওপরের ঘরে গিয়ে বাস করতে বলছিস ?"

বললাম, "রতনের সুবিধে হ'ত তাতে। তা ছাড়া, বলরামকে দিয়ে তোমরা তো ঘরগুলো পরিষ্কার করিয়েই রাখলে ! আমি তো কোন অসুবিধে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। হ্যারিসন রোডে গিয়ে বিছানাটা ট্যাক্সিতে চাপিয়ে নিয়ে আসতে—" হাতঘড়িতে সময় দেখে বললাম, "হ্যাঁ, সাড়ে আটটার মধ্যে মহীতোষ ফিরে আসতে পারে। ফেরবার মুখে কেতকীর বিছানাটাও নিয়ে আসতে পারে সে।"

"তুই তো ঘড়ি দেখে সমস্যা মিটিয়ে দিলি। কিন্তু আমাদের আরও অনেক কিছু দেখতে হয়।"

মাসীমার পরে কথা বলল মহীতোষ। খোঁচা মারবার সুযোগ খুঁজছিল সে। বলল, "সুতপা তো বিপ্লবের ঘড়ির দিকে না চেয়ে একটি কথাও কয় না।"

কথাটা টেনে নিলেন মাসীমা। নিয়ে বললেন, "তোমার কথা মিথ্যে নয়, বাবা মহীতোষ। কিন্তু তপাকে একটা কথা না ব'লে আমি পারলুম না। বহুদিন আগেও বিপ্লব কথাটা আমার কানে আসত—কতবার কত রকম পরিস্থিতিতে ও কথাটা আমায় শুনতে হয়েছে। হ্যাঁ রে তপা, ওরা যে ছু'জন ছু'জনকে বিয়ে করছে তার মধ্যে কি তুই ভাল কিছু দেখতে পাচ্ছিস নে?" প্রশ্ন তিনি করলেন বটে, কিন্তু জবাব তিনি চান না। মাসীমাকে আমি চিনি, আমি তাই চুপ ক'রে রইলাম। মাসীমার মুখের দিকে আমরা তিনজনেই চেয়েছিলাম। ছু'মিনিট বিরতির পরে তিনি বলতে লাগলেন, "মহীতোষ আর কেতকী ভাল করেছে। তপা, কোথায় কেমন ক'রে 'ভাল কবার' বিপ্লব একটা ঘ'টেও ঘটছে না। সেইটেই বোধ করি পৃথিবীর শেষ বিপ্লব। ভাল করার বিপ্লবের মধ্যে গোটা পৃথিবীটাকে টেনে নিয়ে আয়। গড়িয়া খালের রক্তের দাগটা টেনে সাতসমুদ্রের সঙ্গে মিশিয়ে দে। তাতে যদি শতবার্ষিকী পরিকল্পনা করতে হয়, তবে তাই কর। তোদের জীবনে যদি না কুলোয়, বলরামের জীবনটা জুড়ে দে সেই সঙ্গে। রিফিউজীর জীবনে এর চেয়ে মহত্তর কাজ তো আর কিছু দেখতে পাই না। নগদ টাকার বখরাবিনিময় ক'রে পুনর্বাসন দপ্তরের আয়ু বাড়ানো যেতে পারে, সমস্যা মেটানো যায় না। আশ্চর্য হচ্ছিস্, না রে?"

বললাম, "মাসীমা, আশ্চর্য হওয়ার বয়স আমার পেরিয়ে গেছে। আমি বড়সাহেবের বাড়ী যাচ্ছি, কখন ফিরি ঠিক নেই।"

"রাত্রে ফিরবি তো?"

"যদি অসুবিধে না হয়। মহীতোষ, কাল তোমরা আসছ তো? মেলা বসবে ব'লে বলরাম তো বালতি হাতে নিয়েও নেচে বেড়াচ্ছে। কাল তিনটেতে কে একজন রাষ্ট্রনেতা আসছেন শহীদ-স্মৃতি মন্দিরের উদ্বোধন করতে, তোমরা এস। একটু ভিড় না জমলে ক্ষুণ্ণ হবে বলরাম, ক্ষুণ্ণ হবে ষষ্ঠীদাও। সর্বস্ব খরচ করেছে ষষ্ঠীদা। কেন খরচ করেছে তার কারণ আমি জানি না। হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই ষষ্ঠীদা আদর্শবাদী।"

দেখলাম, মাসীমার মুখের চামড়া কুঞ্চিত হ'য়ে এল। কিছু বললাম না। মহীতোষ বলল, "কাল রবিবার, তাড়াতাড়ি আসব।"

কেতকী আর মহীতোষ দু'জনেই উঠে পড়ল। ওরা চ'লে যাচ্ছে দেখেও মাসীমা ওদের কাল আসবার জন্যে একটি কথাও বললেন না। শেষ পর্যন্ত খুব ক্লান্ত স্বরেই তিনি থেমে থেমে বলতে লাগলেন, "লালু তো আমারই ছেলে। কি দরকার ছিল স্মৃতি-সৌধ তোলবার? মানুষ-পুজোর মেয়াদ স্থায়ী হয় না। তবুও এস বাবা তোমরা। ক্যাপটেনকে একবার দেখা করতে বলিস্। বিলেতের পাকা খবর কি এসে এখনও পৌঁছয় নি? তা ছাড়া আপাতত সরকার-কুঠিকে রক্ষা করার দ্বিতীয় কোন পথ দেখতে পাচ্ছি নে। উনি তো আশা এক রকম ছেড়ে দিয়েই ব'সে আছেন। সরকার-কুঠির মাটির সঙ্গে ওঁরই যোগাযোগ সবচেয়ে বেশি। তপা, বলরামকে একবার ডেকে দিস্ তো। আমার বোধ হয় ওষুধ খাওয়ার সময় হ'ল।"

বড়সাহেব আজও আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন বাড়ীর বাইরে। বসবার ঘরে এসে বসলাম আমরা, সেদিনের মত আজও দেখলাম সব কিছু গুছনোই আছে, কোন জিনিস নড়চড় হয় নি। শুধু কোণের সেই টেবিলের ওপর মাসিকপত্রগুলো নেই।

বড়সাহেব বললেন, "চ্যাং একটু বাইরে গেছে। ও ফিরে এলে একসঙ্গেই খেতে বসব। তোমার ক্ষিধে পায় নি তো?"

"না, চ্যাং এলেই খাব।"

নতুন একজন বেয়ারা চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এল। টেবিলের ওপর সাজিয়ে দিয়ে চ'লেও গেল সে। বড়সাহেব বললেন, "কৃষ্ণবল্লভ গেছে চ্যাংএর সঙ্গে।" এই ব'লে তিনি পেয়ালায় চা ঢালতে লাগলেন, বাধা দিলাম না। আমার মনে হ'ল, চা ঢালবার অবসরে ক্যাপটেন কি একটা জরুরী কথা যেন ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ছিলেন। বোধ হয় তিনি এখানে উপস্থিত নেই। কিউবার আখের ক্ষেতে হয়তো বা তিনি লুসে আর লী-র পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছেন। সিয়েরা মায়স্ত্রা পর্বতমালাব পাদদেশে স্মৃতির খুরপি চালাচ্ছেন ক্যাপটেন হেওয়ার্ড। আজও হয়তো সেখানে আগাছার অভাব নেই। উপড়ে ফেলবার জন্যে গেরিলা-নেতা ফিদেল কাস্ত্রো খুরপির মুখে বিপ্লবের ধার তুলছেন। কিন্তু বড়সাহেবের হাতে আজ কি আছে? মানব-সমাজের বুক জুড়ে আগাছার অরণ্য আজ হাহাকার তুলেছে। তিনি কি তা শুনতে পেয়েছেন? স্মৃতির খুরপি দিয়ে হাহাকার তিনি রোধ করতে পারেন না। অরণ্যের গোড়ায় কোপ বসাবার জন্য অস্ত্র চাই।

জিজ্ঞাসা করলাম, "কি খুঁজছ সাহেব?"

"চিনি—" চিনির পাত্রটা সত্যিই খালি। বেয়ারা এসে পাত্রটা আবার ভ'রে দিয়ে গেল। আমি বললাম, "মনে হয়েছিল তুমি বুঝি ফিরে গেছ কিউবায়।"

"কিউবায় ফিরে গিয়ে কি হবে? চ্যাং ভোররাত্রে চ'লে যাচ্ছে পিকিং।"

"পিকিং?"

"হ্যাঁ সুতপা: আমার কর্তব্য শেষ হ'ল। লী-কে কথা দিয়েছিলাম, লুসের সন্তানটিকে ফিরিয়ে দেব—দিলামও।" পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বড়সাহেব ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। চৌদ্দ বছরের অতীতটা ভোররাত্রে উড়োজাহাজে উঠবে, রওনা হবে

পিকিঙেব দিকে। তার পর আর কিছুই দেখা যাবে না—সীমান্তেব ওপব জ'মে উঠবে ঘন কুয়াসা। বড়সাহেবের হাত থেকে চোদ্দ বছরের অতীতটা ফসকে যেতে বসেছে। তাঁর ব্যথার অংশ আমাকেও যেন নতুন উপলব্ধির সীমান্তে এনে দাঁড় করিয়ে দিল।

তিনি বলতে লাগলেন, "চ্যাং যখন দু'দিনের লী তখন মারা যায়। সন্তান হওয়ার সময় জাহাজের ক্যাপটেন, কাছেই ছিলেন, না থাকলে চ্যাং বাঁচত না। ধাত্রীবিদ্যার জ্ঞান আমাব ছিল না, বুড়ো ক্যাপটেনটা দেখলাম সব জানেন। চ্যাংকে কোলে তুলে নিয়ে তিনি চ'লে গেলেন নিজেব কেবিনে। জাপানী উড়োজাহাজ তখন আমাদের পিছু নিয়েছে। লী বুঝতে পাবছিল সবই, হঠাৎ সে একসময় ব'লে উঠল, 'জাপান লুসেকে নিয়েছে, ওকে নিতে দিও না। যদি দরকার হয়, বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পাববে না?'

বললাম, 'পারব।'

মৃদু হেসে লী বলল, 'পারা উচিত। উপনিবেশ গড়বার জন্যে তোমরা তো কম সাঁতবাও নি—সাত সমুদ্রের জল তোমাদেব চেনা আছে।'

'আমায় বলছ কেন ওকথা, লী? আমি তো ডাঙার সৈনিক—অফিসার।'

তৃতীয় দিন আমাদের সত্যিকাবের সংগ্রাম সুরু হ'ল। জাপানীরা জাহাজের আশেপাশে বোমা ফেলতে আরম্ভ করেছে। লী আমায় ডেকে পাঠাল, চ্যাংকে কোলে ক'বে নিয়ে এলাম আমি। বাচ্চাটার দিকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত চেয়ে রইল সে। তার পব বলল, 'ওব নাম রাখলাম চ্যাং। মুখটা অবিকল লুসেব মত।'

লীর আয়ু তখন প্রায় ফুবিয়ে এসেছে, দরকারী কথাগুলো শেষ করার জন্যে বার বার চেষ্টা কবতে লাগল সে। আমার আপত্তি সে কানে তুলল না। বলল, 'চ্যাংএর সবটুকুই চায়নার। ক্যাপটেন, ওর গায়ে হাত দিয়ে দেখো, বিপ্লবের রক্ত কেমন টগবগ করছে! সবটুকু

রক্তই চায়নার। লুসের সঙ্গে আমার বিয়ে হয় নি, তবুও সন্তান হ'ল। হ'ল এই জন্যে যে, আমার বিয়ে হয়েছিল বিপ্লবের সঙ্গে। ক্যাপটেন কথা দাও, চ্যাংকে তুমি ইংরেজ ক'রে তুলবে না—ওর ষোল আনাই চাইনীজ।'

বললাম, 'কথা দিলাম চ্যাং চাইনীজই থাকবে।'

'প্রতিজ্ঞা কর, ওকে একদিন তুমি দেশে পাঠিয়ে দেবে—'

'লী!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। ঝিমিয়ে পড়েছিল লী, আমার চীৎকার শুনে চোখ মেলল সে। বলল, 'এখনও বেঁচে আছি তোমার কাছ থেকে প্রতিজ্ঞাটা কেড়ে নেব ব'লে। প্রতিজ্ঞার কথা ভুলি নি। ক্যাপটেন, ইংরেজরা সাম্রাজ্যবাদী। তাই ব'লে প্রতিটি ইংরেজই তো সাম্রাজ্যবাদী নয়। তবে প্রতিজ্ঞা করতে ভয় পাচ্ছ কেন? দেরী করলে আমি যে শেষ কথাটা জেনে যেতে পারব না।'

'হ্যাঁ, প্রতিজ্ঞা করলাম, চ্যাংকে আমি চায়নায় পাঠিয়ে দেব।'

'আঃ! কি শান্তি! ক্যাপটেন, এতদিন পরে আমি সত্যিই কিউবা থেকে বেরিয়ে এলুম্। মনে হচ্ছে, চায়নার মাটিতে পা দিয়েছি—দেশের হাওয়া গায়ে লাগছে আমার! ব্যামন বাবকুইনদের আর আমি দেখতে পাচ্ছি নে। ওরা সব কোথায় লুকিয়েছে ক্যাপটেন? পারবে—চ্যাং এদের মানুষ করতে পারবে। লুসের রক্ত পেয়েছে চ্যাং। ক্যাপটেন—'

'বল—'

'তুমি কোথায়?'

'এই তো লী—'

'একটু জল খাওয়াতে পার?'

"সুতপা, জল খাওয়ার পরে লী বোধ হয় ঘণ্টা দুই বেঁচে ছিল।" এই ব'লে বড়সাহেব হাঁক দিলেন, "বেয়ারা, বেয়ারা—"

"জী।" বেয়ারা এসে দাঁড়াল সামনে।

"এক গেলাস পানি—"

জল খেয়ে বড়সাহেব বললেন, "চোদ্দ বছরের দায়িত্ব ভোররাত্রে শেষ হবে! কিউবার বিপ্লব ফিরে যাচ্ছে চায়নার মাটিতে। সারা দেশটা ওর জন্যে হাত বাড়িয়ে আছে। চোদ্দ বছরের পুঁজি ওর কতটা কাজে লাগবে জানি না—তবে চ্যাং লী আর লুসের কাছ থেকে সম্পদ যা পেয়েছে তার মোট পরিমাণ কম নয়। হয়তো সমাজতান্ত্রিক চায়নার মূলধন বাড়বে। সুতপা, মূলধন শুধু ব্যাঙ্কের সিন্দুকে বন্দী হ'য়ে থাকে না, মানবসমাজের মনেও তা জ'মে ওঠে। খণ্ডসীমান্তের বেড়া সে ডিঙোতে পারে। কাস্টম্‌সের প্রহরীদের চোখে তেমন মূলধন যদি বেআইনী ব'লে মনে হয় তা হ'লে দোষ সব রাষ্ট্রব্যবস্থার, মানুষের নয়। চ্যাং ভোররাত্রে বেড়া টপকে চ'লে যাবে, বেড়া ভাঙবার আদর্শ নিয়ে। কিউবার আখের ক্ষেতের কিংবা ভারতবর্ষের চা-বাগানের ব্যামন বাবকুইনেরা খবর পেয়েছে চ্যাং রওনা হচ্ছে। ওকে লুফে নেওয়ার জন্যে সমগ্র চায়নার প্রস্তুতি বড় কম নয়! লুসের ছেলে অপরিচয়ের অন্ধকারে ডুবে যায় নি। মাসিকপত্রের বুকে চ্যাংএর ছবি একবার নয়, বহুবার বেরিয়েছে। গোটা দেশটাই ওকে চেনে। ভোররাত্রে লী-র স্বপ্ন উড়োজাহাজ চেপে এতকাল পরে সার্থক হ'তে চলল—চ্যাং পিকিং যাচ্ছে। সুতপা, বর্মায় ইংরেজ সৈন্যবাহিনী হেরে গিয়েছিল বটে, কিন্তু ক্যাপটেন হেওয়ার্ড জিতেছে। যেখানে দাঁড়িয়ে আমি জিতলাম, সেই জায়গাটুকু কি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আমি! রেঙ্গুনের সেই ডকের ওপর রেলিং ধ'রে যেখানে লী দাঁড়িয়েছিল, আমার জয়ের চিহ্ন আজ সেই জায়গাটুকুতে খোদাই করা থাক। এর বেশি আমার আর কিছু চাইবার নেই, দেখবারও নেই।"

বড়সাহেব চশমার কাচ মুছতে লাগলেন। দরজার দিকে মুখ ক'রে ব'সে রইলাম আমি। একটু বাদেই 'ড্যাড, ড্যাড' ব'লে চেঁচাতে চেঁচাতে সেই দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল চ্যাং। আমি দেখলাম, ওর পোশাক-পরিচ্ছদ সব বদলে গেছে। খাঁটি চীনা পোশাক পরেছে চ্যাং।

খাওয়া শেষ হ'তে প্রায় এগারোটাই বাজল। বড়সাহেব বললেন,

"চ্যাং, তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও। আমরা রাত তিনটের সময় দমদম রওনা হবো।"

"ড্যাড, আন্টি কি আমাদের সঙ্গে দমদম যাবে না?"

আমি বললাম, "যাব।"

"তা হ'লে তুমিও একটু ঘুমিয়ে নাও, আন্টি। আমার পাশে জায়গা রইল। ড্যাড, আর একটা বালিশ পাঠিয়ে দিও। গুডনাইট ড্যাড, গুড নাইট আন্টি!"

আমরা আবার এসে বসলাম ড্রইং-রুমে। আলোচনা চালু করলেন বড়সাহেব। দুঃসংবাদগুলো ক্রমে ক্রমে শুনতে লাগলাম আমি। মিস্টার হেওয়ার্ড বললেন, "সরকার-কুঠি রক্ষা পেল না, দু'দিন আগেই খবর পেয়েছিলাম। জেটমলকে আজ সকালে জানিয়ে দিয়েছি, শেলী এণ্ড কুপার কোম্পানী সরকার-কুঠি কিনবে না। সুতপা, বিলেতের হেড আপিসে সত্যি-মিথ্যে অনেক কথাই গিয়ে পৌঁছেছে। কে পৌঁছে দিয়েছে, জান?"

"না।"

"মিস্টার লাহিড়ী। গত ক'মাসের মধ্যে লোকটিকে আমি চিনতে পারলাম না। তুমি তো তাঁর কাছে কাজ করছ পাঁচ বছর। লোকটি কি রকম?"

"ভাল।"

"ভাল? তা হ'লে তাঁকে আমি বোম্বে আপিসে বদলি ক'রে দিলাম কেন? কলকাতার আপিসের কেউ তো তাঁকে পছন্দ করে না।"

"মিস্টার লাহিড়ীর পারিবারিক জীবন সুখের হয় নি, মনেও অশান্তি অনেক। সেই জন্যে—মনে হয়, সেই জন্যেই রোখের মাথায় তিনি দু'চারটে এমন কাজ ক'রে ফেলেছেন যার পরিণতি ভাল হয় নি। ইউনিয়নের প্রতি লাহিড়ী সাহেবের সত্যিই রাগ নেই, রাগ সব মহীতোষের ওপর। তাঁর সাংসারিক অসন্তোষ সব বেরুবার পথ খুঁজছিল, আপিসের মধ্যে পথ তৈরী হ'ল সহজেই। প্রতিপক্ষ

খোঁজবার জন্যে অন্য কোথাও যেতে হ'ল না। এই তো মানুষের স্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব। বড়সাহেব, মনস্তত্ত্বের গায়ে ভালমন্দের দাগ নেই। তিনি খারাপ লোক নন। তাঁর বদলির অর্ডারটা কি এখন বাতিল ক'রে দিতে পার না?"

"না, এখন আর বাতিল করা যায় না। দেওদার স্ট্রীটের বাড়ীটা ছেড়ে দেবার অর্ডারও তাঁর কাছে পৌঁছে গেছে।"

"যাক, লাহিড়ী সাহেবের ব্যাপার তা হ'লে চুকেই গেছে। বড়-সাহেব, বিজয়বাবু কিংবা চণ্ডীদার ব্যবস্থা কি করলে?"

"কিছুই করতে পারলাম না," মিস্টার হেওয়ার্ড একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন, "আন্টির কাছে আর মুখ দেখাতে পারব না। সুতপা, কাল সকালে বিলেতের কেবল্ পাওয়ার পর আমি নিঃসন্দেহ হলাম, আমি কত দুর্বল, কত অক্ষম আর কত অসহায়!"

"তুমি একা নও সাহেব, প্রতিটি মানুষই তাই।" ঘোষণা করতে বাধ্য হলাম আমি। আমার ঘোষণার সত্য তিনি স্বীকার করলেন কিনা বুঝতে পারলাম না। ক্যাপটেন বললেন, "আন্টির একটা কথাও রাখতে পারলাম না। কি লজ্জা বল তো? তোমার স্বামীকে খুঁজে দিতে পারলেও ধর্ম রক্ষা হ'ত—"

"আমার স্বামী নেই, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম তাও তো কম দিন হ'ল না।"

"তা হোক, ভারতবর্ষে যদি থাকতাম তা হ'লে নিশ্চয়ই খুঁজে আনতাম তাঁকে।"

"তুমিও কি পিকিং চললে না কি?"

"বিলেত থেকে নতুন একজন বড়সাহেব আসছেন। হয়তো কাল সকালেই তিনি এসে পৌঁছবেন। হেড-আপিস থেকে আমারও বদলির আদেশ এসে গেছে। সুতপা, আমিও চললাম।"

"কবে যাচ্ছ বড়সাহেব?"

"ভোররাত্রে। চ্যাং ধরবে থাই এয়ারওয়েজের উড়োজাহাজ,

আমি ধরব কে-এল-এম। ওরটা উড়বে আগে, আমারটা পরে, মিনিট দশেকের তফাৎ। সোমবার থেকে লুডন স্ট্রীটের বাড়ীতে থাকবেন তোমাদের নতুন বড়সাহেব।”

“না, ভারী অন্যায়—”

“কার অন্যায়?”

“হেড-আপিসের। তুমি থাকো, বড়সাহেব—আমাদেব সরকার-কুঠিতে আবার উঠে এস। তোমাব মত দক্ষ লোকের কাজের অভাব হবে না। আমাদের ত্যাখো কত কাজ সুরু হয়েছে। ইস্পাতের কারখানা, লোহালক্কড়ের ফ্যাক্টরী—কত কি! দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাব জন্যে বিশেষজ্ঞ চাই—তোমার মত বিশেষজ্ঞের কত অভাব এদেশে জান? বড়সাহেব, তোমায় যেতে দেব না—” আমি জড়িয়ে ধবলাম ক্যাপটেনকে। মুহূর্ত্ত কয়েক কোন কথা হ'ল না। তিনি নিঃশব্দে চশমার কাচ মুছতে লাগলেন। তার পব আমাব হাত ধ'রে টানতে টানতে নিয়ে এলেন চ্যাংএর শোবারঘরের সামনে। বললেন, “ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নাও। সময় হ'লে আমি ডেকে দেব।”

বাইবে থেকে দবজাটা ভেজিয়ে দিয়ে তিনি চ'লে গেলেন।

আলো জ্বালিয়েই চ্যাং ঘুমোচ্ছিল। প্রায় ছ'ফুট লম্বা দেহটা কুঁকড়ে রয়েছে বিছানার ওপব। পার্ক স্ট্রীটের বড় দোকানেব খাটও ওর পক্ষে ছোট। বেচারী চ্যাং! মায়ের দেহ থেকে বেরিয়ে চ'লে এল বুড়ো নাবিকের হাতে। সেখান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল বড়-সাহেবের কোলে। কাল আবার লাফিয়ে পার হ'য়ে যাবে ভাবতবর্ষেব উঁচু সীমান্ত! হাজার কীর্তির ভবিষ্যৎ হাতছানি দিয়ে ওকে ডাকছে। কীর্তিব পাশে শুয়ে পড়তে লোভ হচ্ছিল আমার, পড়লামও শুয়ে। ঘুম এল না, আসার কথাও নয়। ঘুমের চেয়েও বড় নেশা আমায় পেয়ে বসেছে। লী-র মত আমিও একদিন স্বপ্ন দেখেছিলাম। সে স্বপ্ন লালুদা সার্থক ক'রে তুলতে পারে নি। রক্তমাংসের বিপ্লবী-

বাস্তব আমার দেহেও জন্ম নিতে পারত। মাঞ্চুরিয়া থেকে লুসে ছুটে এসেছিল হংকং। বহু দূরের পথ অস্বীকার করছি না, কিন্তু রক্ষিতের মোড় থেকে সরকার-কুঠিতে ছুটে আসবার পথটা এমন কি কম ছিল? বিয়াল্লিশের বারুদ ছড়ানো ছিল সারা পথটাতে। লক্ষ্মণ গয়লার খাটাল আমার পথ বন্ধ করতে পারে নি—বিপিন চাটুজ্জেদের চোখ আমায় ভয় দেখাতে পারে নি—গড়িয়ার খালটাই বা আমায় রুখতে পারল কই? আমি গিয়েছিলাম সরকার-কুঠিতে। লালুদা আমায় ছুঁতে চাইল না। কোন কিছুই রেখে যেতে পারল না সে, সবটুকু আগুন সে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেল। গড়িয়া খালের ধারে শুধু প'ড়ে রইল এক মুঠো ছাই। তাও তো ঝিরঝিরে হাওয়ায় ছাইটুকু কোথায় যে উড়ে গেছে, এ যুগের একটি সন্তানও তা দেখতে পেল না। ইতিহাসের পাতায় ছাইটুকুর পরিচয় নেই।

নেশা কাটল আমার। ওপাশের দরজাটা দেখলাম একটু খোলা রয়েছে, বোধ হয় আলো জ্বলছে ওই দিকটাতে। মনে হ'ল ওটা বড়সাহেবের ঘর। তিনি ঘুমোন নি, খুটখাট আওয়াজ আসছিল। চ্যাংএর মাথায় হাত বুলোচ্ছিলাম। রেশমী সুতোর মত চুলগুলো ওর মসৃণ, এবং কালো—কুচকুচে কালো। নেমে পড়লাম খাট থেকে।

দরজার ফাঁক দিয়ে সবই দেখা যাচ্ছিল। দু'তিনটে স্যুটকেস গুছনো শেষ করলেন বড়সাহেব। একটা স্যুটকেসই তাঁর যেন গুছনো শেষ হচ্ছে না। জিনিসগুলো একবার ভ'রে রাখছেন আবার সেগুলি বার করছেন তিনি। বার বার ক'রারই তিনি বার করলেন আর রাখলেন। গুছনো তাঁর মনঃপূত হচ্ছে না, হওয়ার কথাও নয়। চ্যাংএর ছেলেবেলাকার খেলনাগুলো হাতে তুলে নিয়ে পর্যবেক্ষণ করছেন বড়সাহেব। চোদ্দ বছরের স্মৃতি সব ছেড়ে দিতে হবে, তুলে দিতে হবে থাই এয়ারওয়েজের উড়োজাহাজে। ভোররাত্রির ভবিষ্যৎ তাঁকে বিচলিত ক'রে তুলেছে। চোখ দিয়ে জল পড়ছে তাঁর। বার বার ক'রে চশমার কাচ মুছতে হয় ব'লে চশমাটি তিনি খুলে

রেখেছেন। হাতে সময় আর বেশি নেই, রওনা হওয়ার মুহূর্ত ঘনিয়ে আসছে। দেয়াল-ঘড়িতে দেখলাম আড়াইটা। বড়সাহেব এবার স্যুটকেসের তালা বন্ধ করতে গিয়ে অন্য একটা খেলনা তুলে নিয়ে এলেন হাতে। শোলার, না টিনের জাহাজ বুঝতে পারলাম না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জাহাজটা দেখতে লাগলেন তিনি। আর ঘণ্টাখানেক সময় পেলে ক্যাপটেন নিজেই আজ জাহাজটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন, জলের অভাব কিছু হ'ত না। রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেন বড়সাহেব। আমি স'রে এলাম দরজার কাছ থেকে। ওপাশ থেকে তিনি ডাকলেন, "সুতপা, সুতপা—"

"আমি জেগেই আছি।"

"চ্যাংকে তুলে দাও। আধ ঘণ্টাব মধ্যে রওনা হ'তে হবে।"

চুলের মসৃণতায় হাত বুলিয়ে চ্যাংকে তোলা গেল না, ধাক্কা মারতে হ'ল। প্রথমটা আস্তেই মারলাম, কাজ হ'ল না। দ্বিতীয়টি জোরে মারতে হ'ল। চ্যাংএর চেয়ে বলরামের দেহ বেশি শক্ত। হওয়াই স্বাভাবিক—বলরামকে ফুরনে মোট বইতে হয়, বাসন মাজতে হয়, মসলা বাটতে হয়। চ্যাং এখনও নরম আছে। চোদ্দ বছরে শক্ত হওয়ার কথাও নয়।

ধাক্কা খেয়ে চ্যাং উঠে বসল। জড়সড় ভাবে চিবুকের সঙ্গে হাঁটু ঠেকিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইল সে। জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হ'ল রে ? বাথরুমে যাবি নে ? সময় আছে মাত্র আর আধ ঘণ্টা।"

"আন্টি !" ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেলল চ্যাং। বালিশের তলা থেকে একটা ছবি বার করল সে। ছবিটা বড়সাহেবের। এতক্ষণে চ্যাং বোধ হয় বুঝতে পেরেছে, ওকে যেতে হবে, ছাড়তে হবে ড্যাডকে। বললাম, "আর তো সময় নেই, ভাই।"

"যাচ্ছি।" গম্ভীর হ'ল সে।

"তোর জন্যে চায়না হাত বাড়িয়ে রয়েছে। একটা-দুটো হাত নয়, কোটি কোটি হাত। যাবি না ?"

"যাচ্ছি।" আরও বেশি গম্ভীর হ'ল চ্যাং। ছবিখানা বুক-পকেটে রেখে সে স্নানঘরে ঢুকল।

বড়সাহেবের ঘরে এলুম আমি। তখনো তিনি টিনের জাহাজটাকে সামনে নিয়ে ব'সে ছিলেন। আমাকে দেখতে পেয়ে বড়সাহেব এবার ব'লে উঠলেন, "স্মৃতির বোঝা সহজে ফেলে দেওয়া যায় না।"

"সুটকেসে ভ'রে রেখে দাও, বড়সাহেব। হাতে আর সময় বেশি নেই।" বললাম আমি। তিনি একবার আমার দিকে দৃষ্টি দিলেন, তারপর জাহাজটা ফেলে রাখলেন চ্যাংএর সুটকেসের মধ্যে।

দু' একটা মুহূর্ত নিঃশব্দে কেটেও গেল। আর সময় পাওয়া যাবে না মনে ক'রে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "বড়সাহেব, তোমার গল্পের সবটাই কি বলা হ'য়ে গেছে ?"

"একথা কেন জিজ্ঞেস করছ, সুতপা ?"

"মনে হচ্ছে, সবটা তুমি বলো নি। ভারতবর্ষকে তুমি এত বেশি ভালবাসলে কেন? কবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এদেশের মাটিতে তুমি একবার পা ফেলেছিলে—"

বাধা দিয়ে বড়সাহেব বললেন, "না—তারও আগে ভারতবর্ষে আমি একবার এসেছিলাম। বোধ হয় উনিশ শ' পঁয়ত্রিশ সালে। আমার বাবা ছিলেন সঙ্গে। বছর খানেক আমি রাঁচীতেই বাস করেছিলুম। সুতপা, সে গল্প অন্য একদিন বলব। আজ থাক। ওই চ্যাং আসছে—" এই ব'লে ক্যাপটেন হেওয়ার্ড উঠে পড়লেন।

বেয়ারা-বাবুর্চি-দারোয়ান সবাই উপস্থিত ছিল, কেউ ঘুমোয় নি। ঘুমোলেও পারত, সোমবার সকালে নতুন সাহেব আসবেন। হেওয়ার্ড সাহেবের আগে হেণ্ডারসন সাহেব ছিলেন। তাঁর আগে কে ছিলেন আমার তা জানা নেই। বয়-বাবুর্চিদের কাজকর্মের ব্যতিক্রম কখনও ঘটে না। একজন যাচ্ছেন, অন্যজন আসবেন ব'লে এদের উদ্বেগ কিংবা উত্তেজনা কিছু নেই। বোধ হয় বকশিশের অঙ্ক গুণতে হবে ব'লে এরা কেউ ঘুমোয় নি। কিংবা এরা হয়তো সত্যিই হেওয়ার্ড

সাহেবকে ভালবাসে। এই দলের মধ্যে কৃষ্ণবল্লভকে দেখলাম না। রবিবারটা ছুটি ব'লে সে হয়তো বাড়ীতে ডিউটি দিতে আসে নি। বকশিশ সে অবশ্যই পেয়েছে গতকাল আপিস ছুটি হওয়ার আগে। অতএব হেওয়ার্ড সাহেবের জন্যে কৃষ্ণবল্লভ কেন শনিবারের রাত্রিটা জাগতে যাবে? কৃষ্ণবল্লভকে সত্যিই দোষ দেওয়া যায় না, শিক্ষিত সমাজের কোন্ অংশটায় স্বার্থ ছাড়া মানুষ রাত্রি জেগে ব'সে থাকে?

আপিসের গাড়ি চেপেই আমরা দমদম এলাম। চ্যাং শক্ত হয়েছে, শক্ত হয়েছেন বড়সাহেবও। হাসিখুশীর কথা দু'চারটে হ'ল। ওখানে পৌঁছে চ্যাং আমায় চিঠি লিখবে ব'লে ঠিকানা চেয়ে নিয়েছে। ঠিকানা-লেখা কাগজের টুকরোটাও সে বুক-পকেটে রাখল। আমি জানি, হারাবার কোন ভয় নেই। চ্যাংএর বুক-পকেটে বড়সাহেবের ছবিখানাও ছিল।

দমদম এসে বেশিক্ষণ অপেক্ষা ক'রে ব'সে থাকতে হ'ল না, চটপট কাজ সারতে হ'ল। কলকাতার আকাশে আর অন্ধকার নেই। থাই এয়ারওয়েজ কোম্পানীর ঘোষণা আমরা শুনতে পেলাম। যাত্রীদের এবার সামনে এগুতে হবে। বেআইনী জিনিসপত্র কেউ সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন কিনা পরীক্ষা ক'রে দেখবেন সরকারী কর্মচারীরা। মাথা নীচু ক'রে চ্যাংও এগুতে লাগল সামনের দিকে। আমরা ওর পিছু পিছু গেলাম—খানিক পর আর যেতে পারলাম না। চ্যাং আর আমাদের মধ্যে সরকারী আইন মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াল। আমাদের সঙ্গে করমর্দন করল চ্যাং। তারপর—ছোঁয়াছুঁয়ির বাইরে চ'লে গেল সে। খানিক বাদে থাই এয়ারওয়েজের উড়োজাহাজ আকাশে উড়ল। বাইরে থেকে আমরা দেখতেও পাচ্ছিলাম। বড়সাহেব দূরবীন নিয়ে এসেছেন সঙ্গে ক'রে। দূরবীনের ক্ষমতা যত বেশিই হোক, খণ্ড-সীমান্তের বাইরে সে যেতে পারে না। আজও পারল না।

কিছুই তো আর দেখবার নেই, বলবারও নেই। আমরা চ'লে

এলাম ভেতরে। বড়সাহেব বললেন, "আপিসের গাড়ি তোমায় গড়িয়ায় পৌঁছে দেবে। ড্রাইভারকে বলা আছে।"

কে-এল-এম কোম্পানীর ঘোষণা কানে এল। এবার বড়-সাহেবকেও যেতে হবে। আমি একা পড়লাম। তাঁর সঙ্গে হেঁটে হেঁটে আবার সেই পুরনো জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। সেই আইন, সেই প্রহরী সবই দাঁড়িয়ে আছে তেমনি ভাবে। বেড়ার এ ধারে একা পড়লাম আমি—আমি সুতপা বিশ্বাস। করমর্দন শেষ ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম, "বড়সাহেব, তোমার বিলেতের ঠিকানা কি?"

"আমি তো বিলেত যাচ্ছি না! চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছি।"

"তবে তুমি কোথায় যাচ্ছ? বড়সাহেব, তুমি যেও না। তুমিই শুধু ভারতবর্ষকে ভালবাস না, ভারতবর্ষও তোমায় ভালবাসে। থাকবে বড়সাহেব?"

আমার অনুরোধের ভাষা ভিজে উঠেছে, চোখও শুকনো ছিল না। বহুদিন, বহু বছর আমি কাঁদি নি। কাঁদবার সুযোগ তো কতবারই এসেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামলে নিয়েছি। প্রতিবারই মনে হয়েছিল, চোখের জল ফেলবার মত স্মরণীয় ঘটনা ওগুলো নয়। আজ বোধ হয় এই প্রথম নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটল। মনে হ'ল, খুবই নিকটের মানুষ দূরে চ'লে যাচ্ছে, যাচ্ছে চিরদিনের জন্যে। ধ'রে রাখবার আগ্রহে বুঝি দেহটা আমার কেঁপে কেঁপে উঠছে। হাত বাড়িয়ে দিলাম বড়সাহেবের দিকে। দিয়ে বললাম, "তুমি যেও না বড়-সাহেব—"

তিনি দু'পা এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন আমার কাছে। আমি তাঁকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম। বুকের ওপর মাথা রেখে কাঁদতে কাঁদতে আবার তাঁকে অনুরোধ করলাম, "তুমি যেও না—"

"আমায় যে যেতেই হবে সুতপা!"

বিমানঘাঁটির জনতা অবাক হ'য়ে চেয়েছিল আমার দিকে। উনিশ শ' বিয়াল্লিশ সালের 'কুইট ইণ্ডিয়া' অস্ত্রটা আমি আজ নিজের

হাতে ভেঙে ফেললাম বুঝি! বোধ হয় ইতিহাস আজ প্রকাশ্য দিবালোকে প্রতিশোধ নিচ্ছে। তা নিক, খণ্ডসীমান্তের কলঙ্ক তবু মুছে যাক। দূরের মানুষ কাছে আসুক। কাছের মানুষকে আর আমরা দূরে যেতে দেব না।

বড়সাহেবের আলিঙ্গনে বাঁধা পড়েছিলাম আমি। বোধ হয় মিনিট পাঁচেক পরে হঠাৎ আমার চেতনা ফিরে এল। একটু দূরেই দাঁড়িয়ে ছিল শেলী এণ্ড কুপার কোম্পানীর ড্রাইভার। অবাক সে কম হয় নি। আপিসের বেয়ারা এবং দারোয়ানরা কোনদিনও ভারতীয় মেয়েদের কাজ করতে দেখে নি। আমিই প্রথম শেলী এণ্ড কুপার কোম্পানীর আপিসে কাজ নিয়ে ঢুকেছিলাম। আমি জানতাম, ওরা নিজেদের মধ্যে আমায় 'কালি মেমসাহেব' ব'লে ডাকত। ড্রাইভারটা আজ এ কি দেখছে? 'কালি মেমসাহেব'কে বড়সাহেব জড়িয়ে ধরেছেন দু'হাতের মধ্যে!

কিন্তু তার চেয়েও বড় ঘটনা ঘ'টে গেল আজ। দেহের জড়তা অন্তর্হিত হ'ল অতি অকস্মাৎ। কোথা থেকে যেন উষ্ণ উত্তেজনা ঢুকে পড়ল আমার সারা শরীরের মধ্যে। মনে হ'ল ঠাণ্ডা ব্যাধির আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি পেলাম বুঝি!

মনের রাজ্যে লোভের আগুন জ্ব'লে উঠতে সময় লাগল না। স্বামীর কথা মনে পড়ল আমার। স'রে গেলাম বড়সাহেবের কাছ থেকে। গড়িয়া খালের ঠাণ্ডা হাওয়া আর বোধ হয় আমার দেহে জড়তা আনতে পারবে না। লালু সরকার সত্যিই আমায় মুক্তি দিয়েছে আজ।

সময় ছিল না আর। আমি এবার তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলাম, "ক্যাপটেন, তোমার নতুন ঠিকানাটা কি আমায় দিতে চাও না?"

"নতুন ঠিকানা? নতুনই বটে!" এই ব'লে ক্যাপটেন হেওয়ার্ড হাসলেন একটু, তার পর বললেন, "আমি যাচ্ছি বেলজিয়ামে। সেখানকার মনাস্ট্রীতে ঢুকছি আমি।"

"মনাস্ট্রী ?"

"হ্যাঁ সুতপা, তোমরা যাকে মঠ বল।"

কোথা থেকে কি যেন হ'য়ে গেল, বুঝতে পারলাম না! মনে হ'ল, বিমানঘাঁটির মেঝের ওপর মুখ থুবড়ে প'ড়ে যাচ্ছি বুঝি। একটু আগেই যাঁকে সবচেয়ে উঁচু আসনে বসিয়েছিলাম তাঁরও পতন যেন অনিবার্য হ'য়ে উঠল। কি যে বলব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। যৌবনের সুরুতে লালুদা পালিয়ে গেল। তার পর এলেন আমার স্বামী, তিনিও স'রে পড়তে দেরি করলেন না। সরকার-কুঠির ভাঙা রঙ্গমঞ্চে হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন ক্যাপটেন হেওয়ার্ড। ভেবেছিলাম, একজন সত্যিকারের বলিষ্ঠ মানুষ এল বুঝি। এবার নিশ্চয়ই মেরামতের কাজ স্রুরু হবে। কিন্তু মানবজীবনের শূন্যতা প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠতে ক'টা দিনই বা লাগল!

হঠাৎ বড়সাহেব দূর থেকেই ডেকে উঠলেন, "হ্যালো—"

"ছুটতে ছুটতে আসছি, সার! কালই এসে পৌঁছেছি। আমি জানতাম না, আপনি আজই চ'লে যাচ্ছেন।"

বড়সাহেব আবার একটু এগিয়ে এলেন। এসে বললেন, "সুতপা, তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। ইনিই তোমাদের নতুন ছোটসাহেব সীতাংশু রায়। সুতপা তোমার স্টেনো, সীতাংশু। বাই, বাই—"

বড়সাহেব জেনে যেতে পারলেন না যে, সীতাংশু আমার স্বামী।

॥ দুই ॥

আপিসের গাড়ি ছেড়ে দিতে হ'ল। দমদম থেকে বাস ধরব। পৌঁছতে দু'তিন ঘণ্টা লাগবে। তা লাগুক, ভাববার সময় পাওয়া যাবে। নতুন ভাবনার মুখে এসে দাঁড়িয়েছি।

বিমানঘাঁটির সামনের রাস্তাটি ভাল লাগল আমার। সেই রাস্তা ধ'রে হাঁটতে লাগলাম। যত্ন নিয়ে রাস্তাটিকে শুধু তৈরী করা হয় নি,

সন্তান-পালনের মত কর্তৃপক্ষ এটাকে রক্ষাও করছেন। কোথাও একটু ভাঙাচোরা নেই, আবর্জনার চিহ্ন পর্যন্ত নজরে পড়ল না। দিল্লীর বড়মানুষেরা এখান দিয়ে যাতায়াত কবেন ব'লেই বোধ হয় ভারতরাষ্ট্রের এই অংশটা পরিচ্ছন্ন।

মাথার ওপর দিয়ে উড়োজাহাজ উড়ে যাচ্ছে—শুধু যাচ্ছে না, নামছেও। যাওয়া-আসার বিরাম নেই। হাওড়া স্টেশনের মত এখানেও দেখলাম, সর্বক্ষণই ভিড় লেগে আছে। কিন্তু আমি ভাবছিলাম শুধু একটা প্লেনের কথা—যে প্লেনটা বড়সাহেবকে তুলে নিয়ে চ'লে গেল বেলজিয়ামের দিকে। একটা নতুন পৃথিবী জন্ম নিতে নিতে হঠাৎ মাঝপথে ভেঙে চৌচিব হ'য়ে গেল! বড়সাহেবকে কেন্দ্র ক'বেই পৃথিবীটা গজিয়ে উঠছিল। বিজয়বাবু, চণ্ডীদা চাকরী পেতেন, ভাল ক'বে বাঁচতে পারতেন তাঁবা। সরকার-কুঠিও হয়তো রক্ষা পেত। কিংবা আবও অনেকের হয়তো অনেক রকমের উপকাব হ'ত তাঁর দ্বারা। কিন্তু এগুলোও তো সেই শিশু-পৃথিবীব বড় খবব ছিল না। বড়সাহেবকে দেখে যে ভাঙা মানুষগুলো উঠে দাঁড়িয়েছিল, সেইটেই ছিল পৃথিবীটার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আমি পর্যন্ত ভবিষ্যতেব ছায়াটাকে বাস্তব অস্তিত্ব ভেবে নতুন ক'রে ঘর গুছোবার জন্যে লোভের জালে আটকে পড়েছিলাম। সরকার-কুঠির খালি ঘরগুলোব দিকে আমারও কি দৃষ্টি পড়ে নি? পড়েছিল—অবশ্যই পড়েছিল। অসহায় মানুষের নিষ্ফল দম্ভ বড়সাহেব-সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢুকে পড়েছিল আমার মনের বাজ্যে। স্বাধীন ভারতবর্ষের রাজপথ দিয়েও এমন লোভ কখনও ঢুকতে পারে নি।

একটু আগেই উপস্থিত-অস্তিত্বের সচেতনতা ফিরে পেলাম আমি। খণ্ডসীমান্তের বাস্তবতা পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। মৃত্যুব মত বাস্তবতার গায়ে-পায়েও সীমা টানা আছে। মৃত্যুর নিশ্চয়তার বাইরে আর কোন নিশ্চয়তা নেই। মানুষের চোখ থাকলে কি হবে, সে অন্ধ। সে নিষ্ঠুরও!

বড়সাহেবের নিষ্ঠুরতা খানিকটা আগে আকাশে উড়ল। ভারতবর্ষকে ভালবাসলেন তিনি। অথচ সেই ভালবাসা বেলজিয়ামের মঠ পর্যন্ত পৌঁছতে পাবল না। ধোঁয়াব মত মিলিয়ে গেল ঊর্ধ্ব-আকাশে। ওপরেব রহস্যে গা ঢাকা দেবাব প্রলোভন তিনি ত্যাগ কবতে পাবলেন কই? পালিয়ে গেলেন ক্যাপটেন হেওয়ার্ড।

বেলা কম হয় নি, দশটা প্রায় বাজে। শ্যামবাজারের মোড়ে এসে অপেক্ষা কবতে লাগলাম। হ্যাবিসন বোডে মহীতোষের ওখানে একবার যাব। ওব হোটেলটায় তো একদিনও যাই নি, আজ চললাম।

একতলাতেই খবব পেলাম, মহীতোষ বাইবে বেবিয়েছে। ভোবের দিকেই বেবিয়েছে, চা পর্যন্ত খেয়ে যায় নি। দুপুরবেলায়ও খেতে আসবে না। কোথায় কি একটা শহীদ-স্মৃতি-সৌধ তোলা হয়েছে সেইখানে তাব যাওয়াব কথা। খদ্দর-পরিহিত হোটেল-মালিকেব মুখ থেকেই খববগুলো পেলাম। তিনি আমায় বসতে বললেন। সুন্দব চেহারাব পুরুষমানুষকে তিনি বসতে বললেও চা খেতে অনুবোধ কবতেন না। আমাব জন্যে এক পেয়ালা চা এল। বড় তেষ্টা পেয়েছিল আমাব।

খদ্দর দেখেই বুঝতে পেবেছিলাম, মালিকের কথা এখনও ফুবোয় নি। হঠাৎ শখ ক'বে কেউ খদ্দব পরতে যায় না। খদ্দরের পেছনে খবর থাকে। তিনি আমায় খবর শোনাতে লাগলেন, "অসহযোগ আন্দোলনে ঢুকে পড়েছিলাম, তাই খদ্দর পরি—"

"আজ্ঞে—খদ্দরের মধ্যে আন্দোলন কতটুকু আছে জানি না, গবীব তাঁতীদেব আয়ের কিছু সুবিধে আছে।" গোড়াতেই আলোচনার সুতোটা কেটে দেওয়াব চেষ্টা করলাম, ফলও পেলাম।

তিনি হাই তুললেন বাব দুই। আমি খদ্দর পবি নে, আমি তাঁর খদ্দেরও নই। এক পেয়ালা চা সবদিক দিয়েই নষ্ট হ'ল। তিনি খবর দিলেন, "গান্ধীজী ছাড়া ভারতবর্ষে দ্বিতীয় কোন শহীদ নেই।

মহীতোষ আমার কথা বিশ্বাস করল না। ছুট ক'রে বেরিয়ে গেল ভোরবেলা, চা পর্যন্ত খেয়ে গেল না।"

"ওর ভাগটা বোধ হয় আমিই খেয়ে গেলাম। আপনার হিসেব তাতে ঠিকই রইল। আমি উঠি।"

"এক আপিসেই কাজ করেন বুঝি?"

"আজ্ঞে।"

আর একবার হাই তুলে তিনি বললেন, "কাল রাত্রে ঘুমোতে পারি নি। আপনি যাবেন না? মানে, ওই যে কোথায় শহীদ স্মৃতির মঠ তৈরী হয়েছে—"

"যাব। তবে এখখুনি যাওয়াব দরকার নেই। বেলা তিনটের সময় উদ্বোধন হবে। কে একজন রাষ্ট্রনেতা আসবেন।"

"রাষ্ট্রনেতা? কে তিনি? কি নাম তাঁর?"

"আমি ঠিক নামটা জানি না।"

"শুনলে বুঝতে পারতাম আমাব কলিগ কিনা—মানে অসহযোগ আন্দোলনের সময় একসঙ্গে জেলে ছিলাম কিনা।"

"আপনি জেলে গিয়েছিলেন?" খদ্দরেব প্রতি সম্মান দেখাবার জন্যে কৌতূহল প্রকাশ করতে বাধ্য হলাম।

খুশী হলেন হোটেলের মালিক। খদ্দেরদের মধ্যে কেউ তাঁর খবর শুনতে চায় না। তিনি বললেন, "একবার নয়, দু'বার জেলে গিয়েছি। জেলে গিয়েছি বটে, কিন্তু জেল খাটি নি। আমরা তো হিংসাত্মক আন্দোলনে বিশ্বাস কবতাম না। সেইজন্যেই বোধ হয় শোবার জন্যে ইংরেজরা আমাদের খাটপালঙ্ক দিত। সপ্তাহে মাংস খেতাম দুবার। খবরের কাগজ, মাসিকপত্র যা চাইতাম সবই পাওয়া যেত। আমরা দেখুন, খাটপালঙ্কে শুয়ে খববের কাগজ প'ড়ে প'ড়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা নিয়ে এলাম। আমার কলিগরাই তো এখন ভারতবর্ষ শাসন করছেন। ইংরেজের গুলি খেয়ে এঁরা কেউ শহীদ হওয়ার চেষ্টা করেন নি। দেখতে পাচ্ছেন?"

বললাম, "পাচ্ছি। শহীদ হ'লে, আমি কেন, কেউ এঁদের দেখতে পেত না। বলুন, ঠিক বললাম কিনা ?"

আশাতীত ভাবে খুশী হলেন মালিক। বললেন, "আর এক পেয়ালা চা আনি ?"

"আজ্ঞে না, যাব এবার। আমারও কাল রাত্রে ঘুম হয় নি, আজ রবিবার ব'লে ঘুমতে পারব।"

"বেশ, বেশ—আবার কবে আসবেন ? খুব খুশী হলাম। মহীতোষরা তো আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে পাত্তা দিতে চায় না।"

"আমি দিলাম, কিন্তু ইতিহাস দেবে কি ? নমস্কার।"

কি মনে ক'রে হ্যারিসন রোড আর কলেজ স্ট্রীটের মোড় থেকে দশের-এ নম্বর দেওয়া বাসে উঠে বসলাম। আমি জানি এই বাসটা হাজরা রোড দিয়ে যায়। দু'পা হাঁটলেই দেওদার স্ট্রীটে পৌঁছনো চলে, পৌঁছলামও।

একতলার দরজাটা খোলা। সিঁড়ির পাশে চেয়ার তিনখানাও সাজানো ছিল। কিন্তু সেই কাগজগুলো দেখতে পেলাম না। টেবিলের ওপর শুধু একটা ফুলদানী রয়েছে। বেয়ারাটা বোধ হয় ওপরে গেছে ভেবে ওইখানে ব'সে পড়লাম। দশ মিনিট পরেও কাউকে দেখতে পেলাম না, সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এলাম। সামনেই লাহিড়ী সাহেবের ড্রইং-রুম, ভেতরে গিয়ে ঢুকে পড়লাম। মনে হ'ল বাড়ীতে কেউ নেই। আসবাবপত্র সব আগের মতই সাজানো, কোন কিছু নড়চড় হয়েছে ব'লেও মনে হ'ল না। ঘরের বাইরে ল্যাণ্ডিংএর পাশে খোকার ছবিটা টাঙান ছিল, এখন দেখলাম ছবিটা সেখানে নেই।

একটু বাদেই লাহিড়ী সাহেবের শয়ন-কামরা থেকে পুরনো বেয়ারাটি বেরিয়ে এল। জিজ্ঞাসা করলাম, "মেমসাহেব কোথায় ?"

"তাঁরা চ'লে গেছেন।"

"কোথায় গেছেন ?"

"শুনেছি শ্যামবাজার। লাহিড়ী সাহেব বদলি হ'য়ে গেছেন, নতুন একজন সাহেব আসবেন। কাল তিনি এখানে এসে উঠবেন।"

"ওঃ, বেশ। তুমি বুঝি ঘরদোর গুছোচ্ছিলে ?"

"জী। নতুন সাহেবের বউ নেই—"

"তাতে তোমার কি সুবিধে ?"

"আমার কাজ মেমসাহেবদের পছন্দ হয় না। আসুন না দেখবেন, শোবার ঘরটা সাজানো ঠিক হ'ল কিনা।"

দেখবার লোভ আমার আগেই হয়েছিল। বেয়ারার আমন্ত্রণ তাই তখনই আমি লুফে নিলাম। শোবার ঘরের আসবাবও সব দেখলাম আগের মতই আছে। মস্ত বড় চওড়া খাটখানা ঘরের ঠিক মাঝখানে পাতা। সবিতা দেবী বলেছিলেন, এত বড় খাট দেখে সীতাংশু আবার ভয় না পায়। খাটের পাশে ঝালর-দেওয়া ল্যাম্প-স্ট্যাণ্ড। তার তলায় ছোট্ট একটা পেগ-টেবিল। আপাতত টেবিলের ওপর বেয়ারাটি এক গেলাস জল রেখেছে। ঘরের পশ্চিম দিকে ছুটো আলমারী রয়েছে পাশাপাশি। লাহিড়ী সাহেব বিবাহিত, ছুটো আলমারী তাই ব্যবহার করা হ'ত। কিন্তু সীতাংশু রায় ছুটো আলমারী দিয়ে কি করবেন ? বাড়ীটার সবকিছু ব্যবস্থাই ছুজনের জন্যে ক'রে রাখা হয়েছে। কোম্পানী কোথাও কার্পণ্য করে নি। আমার মনে হ'ল, একজন মানুষ এ বাড়ীতে বাস করতে পারবে না। প্রতি মুহূর্তের অভাববোধ একা-মানুষকে অসুস্থ ক'রে তুলবে। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনীর পরে বিশ্রাম পাবে না লোকটি।

বেয়ারাটি হঠাৎ আমায় প্রশ্ন করল, "খাটের দিকে অমন ক'রে চেয়ে রয়েছেন কেন ? খাটখানা কি ঠিক জায়গায় রাখা হয় নি ? একটু সরিয়ে দেব কি ?"

প্রশ্ন শুনে চমকে উঠলাম। এতক্ষণ খাটের দিকে চেয়ে আমি মনে মনে একা-মানুষের বিপর্যয়ের কথা ভেবে মরছিলাম। সামলে

নিতে হ'ল। বললাম, "হ্যাঁ, একটু সরিয়ে দেওয়া ভাল। ঐটে তো দক্ষিণ দিক ?"

"জী।"

"তা হ'লে খাটখানা দক্ষিণ দিকে সরিয়ে দাও। তোমার নতুন সাহেবের গায়ে হাওয়া লাগবে। জান তো দক্ষিণ দিক দিয়ে হাওয়া আসে ?"

মাথা নেড়ে সায় দিল বেয়ারা। কিন্তু ও তো জানে না, কলকাতার বাড়ীওয়ালারা হাওয়া আসবে ব'লে দক্ষিণ দিক খোলা রাখেন না। বাড়ী তৈরীব প্ল্যানে তাঁদেব হাওয়া নেই।

আমার পরামর্শ মত খাটখানা সবানো হ'ল। বেয়ারাটি একা সরাতে পারল না, আমাকেও সাহায্য কবতে হ'ল। দক্ষিণের জানালাটা খুলে দিলাম আমি—সত্যিই হাওয়া আসে কিনা পরীক্ষা কববার জন্যেই খুললাম, কিন্তু দেখলাম হাওয়া আসবার পথ নেই। চার ফুট কি পাঁচ ফুট দূরে অন্য একটা উঁচু বাড়ীব পেছন দিকটা জানালাটার সঙ্গে প্রায় লেগে দাঁড়িয়ে আছে। বেযাবাটা এত দিন এখানে কাজ করছে, অথচ চার ফুট দূরেব উঁচু বাড়ীটা সে আজও দেখতে পায় নি। আমিও আর দেখাতে চাইলাম না, জানালাটা বন্ধ ক'বে দিয়ে বললাম, "হ্যাঁ, দক্ষিণ দিক দিয়েই হাওয়া আসে। এখন বন্ধ থাক। আমি চলি।"

আমার সঙ্গে সঙ্গে সে একতলা পর্যন্ত নেমে এল। বললাম, "দরজাটা বন্ধ ক'বে রেখ। কেউ হয়তো সোজা ওপবে উঠে যাবে, দু'একটা জিনিস খোয়া গেলে তুমি টেরও পাবে না। পয়সা সব কোম্পানীর, তা হ'লেও সতর্ক থাকা ভাল।"

রাস্তায় বেরিয়ে এলাম, বেয়ারাটা জিজ্ঞাসা করল, "আপনি আমাদের নতুন সাহেবকে চেনেন না ?"

কি অদ্ভুত প্রশ্ন !

গড়িয়ায় পৌঁছতে বেলা তুটো বেজে গেল। বাস থেকে নেমে ছুটতে ছুটতে এলাম। তিনটের সময় শহীদ-স্মৃতি-সৌধ উদ্বোধন করতে রাষ্ট্রনেতা আসবেন। এতক্ষণে নিশ্চয়ই সরকার-কুঠিতে ভিড় জমেছে। বড় ফটক দিয়ে ঢুকতে পারব তো? গড়িয়া পোলের পাশ দিয়ে শর্ট-কাট ধরলাম—নেমে পড়লাম নীচে। ষষ্ঠীদা নিশ্চয়ই রাগ করেছে—কোন কাজেই তাকে সাহায্য করতে পারি নি। আজ আমার আগে থেকেই উপস্থিত থাকা উচিত। মাসীমাও বোধ হয় তুঃখিত হয়েছেন। তুঃখ পেলেও তিনি প্রকাশ করেন না। নইলে—খালের দিক দিয়ে বিপ্রদাসবাবু যাচ্ছেন না? তিনিই তো। সরকার-কুঠি থেকে তিনি বেরিয়ে যাচ্ছেন, ফিরে যাচ্ছেন বাড়ীর দিকে। তিনিও দেখছি শর্ট-কাট ধরেছেন। এমন দিনটিতে তিনি কোট-প্যাণ্ট প'রে এসেছিলেন কেন? এলেন যদি আবার ফিরছেনই বা কেন? বোধ হয় তিনি শুনতে পেয়েছেন, বড়সাহেব আসবেন না। প্যাণ্ট-কোট খুলে তিনি নিশ্চয়ই ধুতি পরতে যাচ্ছেন। কিন্তু আজকের দিনটিতে বড়সাহেবের উপস্থিতির চেয়ে অনুষ্ঠানটাই কি বড় ছিল না?

ফটকের কাছে এসে দেখলাম, বড় রাস্তা দিয়ে হেঁটে এলেই পারতাম, ছোটবার দরকার ছিল না। ভিড় নেই। ভিড়? জনপ্রাণী একটিও নেই। ব্যাপার কি? তবে কি উদ্বোধনের তারিখ পালটানো হয়েছে। বাগানের ভেতর ঢুকে এবার আমি সত্যিই দৌড়তে লাগলাম। তিনটে সিঁড়ি লাফিয়ে উঠে পড়লাম বারান্দায়। সামনেই বসবার ঘর, ঢুকে পড়লাম ঘরে।

কোটি বছরের প্রাচীন নৈঃশব্দ্য যেন ঘরের মধ্যে পুঞ্জীভূত হ'য়ে আছে। কেউ কথা বলতে চাইল না—মহীতোষ, কেতকী, চণ্ডীদা, বিজয়বাবু, মেসোমশাই—কেউ না। ষষ্ঠীদা আর বলরাম শুধু অনুপস্থিত। মাসীমা তো তাঁর নিজের ঘরে। আমি ব'সে পড়লাম মহীতোষের পাশে। বসবার সুবিধে হ'ল, জায়গাটা খালি। প্রশ্ন করতে ভয় পাচ্ছিলাম। মাসীমার স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছে।

হার্টের ওপর দুবার আক্রমণ হ'য়ে গেছে। তৃতীয় আক্রমণের সম্ভাবনা সব সময়েই ছিল। তবে কি—

মেসোমশাই বললেন, "মহীতোষের কাছ থেকেই সব কথা শুনলাম। খবর নিয়ে মহীতোষ এক ঘণ্টা আগেই এখানে এসে পৌঁছেছে। জেটমলের গ্রাস থেকে বাড়ীটাকে আর রক্ষা করা গেল না। ক্যাপটেনকে পূর্ব-আফ্রিকার আপিসে বদলি ক'রে দিয়েছে। লণ্ডনের হেড-আপিস থেকে খবর এসেছে। এই জন্যে দায়ী কে জানিস? তোদের লাহিড়ী, মিস্টার তপন লাহিড়ী। তপা, সোমবার থেকে তোদের আপিসে ক্যাপটেন আর থাকবেন না।"

ঘোষণা করতে বাধ্য হলাম, "তিনি এতক্ষণে হয়তো করাচী পৌঁছে গেছেন। ক্যাপটেন চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। ইউরোপে বাস করবেন এখন।"

"আমাদের সঙ্গে দেখা ক'রে গেল না?" মেসোমশাইর স্বর কর্কশ।

"সেই জন্যে তিনি খুবই দুঃখিত। গতকাল সকালে অবশ্য তিনি এসেছিলেন, তুমি বাড়ী ছিলে না। সব কথা মাসীমাকে তিনি খুলে বলতে পারেন নি। বার বার ক'রে মাপ চেয়ে গেছেন।"

বিজয়বাবু উঠে পড়লেন। পা টলছিল তাঁর। ঠোঁটের কাঁপুনি আয়ত্তে আনতে পারছিলেন না। সেই অবস্থায়ই তিনি বলবার চেষ্টা করলেন, "সত্যিই কি তিনি নেই? মানে ভারতবর্ষে নেই?"

"না, বিজয়বাবু।"

"মাত্র তিন দিন হ'ল ইস্কুলের চাকরীটা ছেড়ে দিয়ে এসে-ছি।"

"বড়সাহেব তো আপনাকে চাকরী ছাড়তে বলেন নি—"

"না—তা তিনি বলেন নি।" এই ব'লে বিজয়বাবু টলতে টলতে চ'লে গেলেন ঘরের বাইরে।

চণ্ডীদা অনেকক্ষণ আগেই বোধ হয় ফতুয়াটা খুলে ফেলেছিল। সেটাকে গামছার মত ভাঁজ ক'রে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বলল,

"আমার গণনার ষাট ভাগই ফলে। বড়সাহেবকে বলেছিলাম, তুমি পালাও। তপাদি, তোমার সময় এল।"

চণ্ডীদা উঠে পড়ল। যেতে যেতে বলল, "আজ তো বলরাম ব্যস্ত আছে। কাল সকালে আবার মালপত্রগুলো গোবিন্দপুরে নিয়ে যাওয়ার ঝামেলা রইল, বলরামের সঙ্গে ফুরন ক'রে নেব। চলি—"

এবার আমি মেসোমশাইকে বললাম, "ক্যাপটেনের ওপর তোমরা এত বেশি নির্ভর করছিলে বুঝতে পারি নি। কিন্তু তুমি, মেসোমশাই তুমি তো কখনও ক্যাপটেনের কথা বিশ্বাস করো নি? তুমি এতটা ভেঙে পড়লে কেন? ভেঙে পড়বার কথা মাসীমার। তিনি কেমন আছেন? সব কথা শুনেছেন?"

"শুনেছেন। মহীতোষের মুখ থেকে খবর শোনবার পরে মনে হ'ল আমিই শুধু ক্যাপটেনের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে বসেছিলাম। এমন একটা অদ্ভুত আবিষ্কারে নিজেই আমি অবাক হ'য়ে গেছি। অথচ তোর মাসীমা দেখলাম, খবর শুনে একটু শুধু হাসলেন। এমন ভাবে হাসলেন যেন তিনি এক মুহূর্তের জন্যেও ক্যাপটেনের ওপর নির্ভর করেন নি! তপা, লালুর মাকে আজও আমি চিনতে পারলাম না।"

বুঝতে আমার অসুবিধে হ'ল না, কেবল বিপ্রদাসবাবুই নন, এ সংসারের কেউ আজ লালুদার কথা ভেবে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাশীল হন নি। লালুদার কথা সরকার-কুঠির সবাই ভুলে গেছেন। আমিই শুধু তিনটের আগে পৌঁছবার জন্যে গড়িয়া পোলের পাশ দিয়ে শর্টকাট রাস্তা ধরেছিলাম।

নৈঃশব্দ্য আবার ঘন হ'য়ে আসছিল। তাই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "সময় তো বেশি নেই, ষষ্ঠীদাকে দেখতে পাচ্ছি নে যে?"

মেসোমশাই যেন চমকে উঠলেন! বললেন তিনি, "তাই তো— ষষ্ঠীর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।"

"লালুদার কথাও আমরা ভুলে গেছি, মেসোমশাই।"

মনে করিয়ে দেবার জন্যে ঘরে ঢুকল ষষ্ঠীদা। খদ্দরের ধুতি পরেছে সে। সতর্কতার অভাব দেখলাম না। একেবারে মাপমত ধুতির প্রান্ত টেনে রেখেছে হাঁটুর ওপরে। আমরা সবাই চেয়ে রইলাম ষষ্ঠীদার দিকে। ষষ্ঠীদা বলল, "রাষ্ট্রনেতা আসবেন না!"

"কেন?" প্রশ্ন করল মহীতোষ। এত জোরে করল যেন মহীতোষের প্রশ্নটা প্রতিধ্বনি তুলতে তুলতে ধাক্কা খেতে লাগল সারা ভারতবর্ষে। মহীতোষ ছাড়া এমন প্রশ্ন করবেই বা কে?

ষষ্ঠীদা জবাব দিল, "রওনা হওয়ার আগের মুহূর্তে রাষ্ট্রনেতা বুঝতে পারলেন, লালু সরকার শহীদ নয়। সে হিংসাত্মক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। পুলিসের পুরনো ফাইলে তাকে খুনী ব'লে অভিযুক্ত করা আছে।"

"পুলিস?" উত্তেজিত হ'য়ে উঠলাম আমি, "কোন্ পুলিসের ফাইলে? হংকং না জাপানী পুলিসের?"

সবাই অবাক হ'য়ে চেয়ে রইল আমার দিকে। নিজের ভুল আমি বুঝতে পারলাম। আমি বোধ হয় লালুদার সঙ্গে সঙ্গে লুসের কথাও ভাবছিলাম। লজ্জা পেয়ে বললাম, "পিকিং আর দিল্লী যে দুটো আলাদা জায়গা ভুলে গিয়েছিলাম, ষষ্ঠীদা!"

এই সময়ে ছুটে এল বলরাম। ওর আগে আগে এল টাইগার। টাইগার খোঁড়াচ্ছিল, তবুও সে আগে এসে পৌঁছল।

বলরাম বলল, "ষষ্ঠীদা, শীগগির এস—আমাদের মন্দির ওরা ভেঙে দিয়েছে!"

"ওরা? কে ওরা?"

"তা তো জানি না। অনেক লোক। টাইগার একজনকে কামড়ে দিয়েছে। টাইগারের পায়ে ওরা লাঠি মেরেছে ষষ্ঠীদা।"

এই ব'লে বলরাম সত্যি সত্যি কেঁদে ফেলল।

কান্না শুনে চণ্ডীদা এসে সামনে দাঁড়াল। বিজয়বাবুকে দেখলাম না। আমরা সবাই ভাঙা মন্দির দেখতে চললাম। মাসীমার

গলা শুনতে পেলাম আমি। তিনি ডাকছিলেন, "বলরাম, বলরাম—"

বলরাম গেল মাসীমার ঘরের দিকে। পেছন ফিরে আমি দেখলাম, মাসীমা ওকে ডাকতে ডাকতে বারান্দায় বেরিয়ে পড়েছেন।

আমরা যখন এসে পৌঁছলাম, তখন মন্দিরের চূড়া আর ছিল না। প্রাচীরগুলোও ভেঙে সমান ক'রে দিয়েছে, শুধু মন্দিরে ওঠবার সিঁড়ি ক'টি আছে। মেসোমশাই বললেন, "খাল পার হ'য়ে যারা চ'লে গেল, তারা সব লক্ষ্মণ গয়লার লোক। জেটমল ওদের দিয়ে মন্দিরটা ভাঙিয়ে দিলে! জেটমলকে দেখতে পাচ্ছিস না, তপা?"

"না তো!"

"ঐ যে আমগাছটার আড়ালে ব'সে আছে। টাইগার বোধ হয় জেটমলকেই কামড়ে দিয়েছে। আমাদের ঘরে তো কোন ওষুধপত্তর নেই, না তপা?"

"যা আছে তা দিয়ে কুকুরের বিষ নষ্ট করা যাবে না মেসোমশাই।"

মহীতোষ বড্ড বেশি উত্তেজিত হ'য়ে পড়েছিল, কেতকীও কম হয় নি। চণ্ডীদার হাত থেকে ফতুয়াটা তো আগেই প'ড়ে গিয়েছিল, তবু তারও রাগ দেখলাম কম নয়। শুধু ষষ্ঠীদার মুখেই দেখলাম নির্লিপ্ত ভাব। অহিংসার প্রতিযোগিতায় রাষ্ট্রনেতাকেও আজ সে হার মানিয়েছে।

কেতকী জিজ্ঞাসা করল, "এখান থেকে থানা কত দূর?"

মৃদু হেসে মেসোমশাই বললেন, "লণ্ডনে, মা কেতকী!"

"তার মানে?"

"জেটমল ব্যবস্থা সব পাকা ক'রেই এসেছে। এখন কেউ আসবে না। ছুটে গিয়ে হাঁপিয়ে পড়াটাই লোকসান হবে। কাউকে পাওয়া যাবে না, কাউকে না। ওরে তপা, জেটমলের পা দিয়ে যে বড্ড বেশি রক্ত পড়ছে। ব্যবস্থা একটা কর, মা। ষষ্ঠী, ষষ্ঠী গেল কোথায়?"

বললাম, "এই তো, ষষ্ঠীদা তোমার সামনেই।"

"ওরে ও ষষ্ঠী, যা না ফটকের কাছে গিয়ে দেখে আয়, জেটমলের মোটরগাড়িটা এল কিনা। কি ভীষণ রক্ত পড়ছে।"

কেতকী বলল, "পড়ুক না রক্ত, আমরা তার কি করব? ওদের রক্ত পড়তে আরম্ভ করলেই কি শেষ হয়, মেসোমশাই?"

"তা নয় মা—লালুর রক্তের সঙ্গে যেন ছোঁয়াছুঁয়ি না হয়। দেখিস, তোরা চোখ রাখিস—জেটমলের রক্ত যেন গড়িয়ার খালে গড়িয়ে না যায়। দাগ যেন না পড়ে।"

ভাঙা মন্দিরের সামনে ব'সে পড়লেন সরকার-কুঠির মালিক শ্রীবসন্তকুমার সরকার।

শেষ দৃশ্যটা বড় অদ্ভুত ঠেকল আমার চোখে। শুধু অদ্ভুত বললেই কথা ফুরলো না। ভেবে দেখলাম, নতুন ভাষার সন্ধান না পেলে বলরাম আর মাসীমার শেষটুকু বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তিনি বলরামের ঘাড়ে ভর দিয়ে এগিয়ে আসছিলেন মন্দিরের দিকে। গুনগুন ক'রে গান ধরেছেন মাসীমা, "মেরে তো গিরিধর গোপাল—"

বলরামের হাতে বাঁশী, সেই পুরনো বাঁশীটা। বাসন মাজতে মাজতে আর মসলা বাটতে বাটতে অনেক দিন হ'ল বাঁশীতে আর হাত দিতে পারে নি ও। আজ সে মাসীমার সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাঁশী বাজাচ্ছে। দূর থেকেও শুনতে আমার ভাল লাগছিল। শুধু ভাল বললেও ব্যাখ্যা এর শেষ হ'ল না। সুরের গভীরতা আমাদের সবাইকে টানতে লাগল। মহীতোষ এবং কেতকীর হিংসাত্মক মনো-ভাব সব এরই মধ্যে উবে গেছে। থানা-পুলিসকে অনেক পেছনে ফেলে এল ওরা, অনেক দূরে। এই মুহূর্তে বলরাম আর মাসীমাকে ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, ক্ষয়ক্ষতি এবং ক্ষত তাও যেন আর নেই। জেটমল পর্যন্ত উঠে দাঁড়াল। পায়ের ক্ষত দিয়ে রক্ত পড়ছে—তবুও।

মাসীমা এসে ব'সে পড়লেন ভাঙা মন্দিরের সিঁড়ির ওপরে।

লুটিয়ে পড়লেন তিনি, গানের সুর চড়তে লাগল। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে জেটমলও এসে মাসীমার সামনে দাঁড়িয়েছে। মাসীমা হঠাৎ মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওরে তোদের রাজপুতনায় কি মন্দির নেই? তপা, তপা কই রে? এই দ্যাখ গোপাল—বলরাম আজ সকালে কালীঘাট থেকে দশ পয়সা দিয়ে গোপালকে কিনে এনেছে। মেরে তো গিরিধর গোপাল—"

গান করতে করতে মাসীমা সত্যিই আঁচলের তলা থেকে দশ পয়সার গোপালটি বার করলেন। বসিয়ে রাখলেন সবচেয়ে উঁচু সিঁড়িটাতে। চোখমুখ হয়তো তৈরী হওয়ার সময় ছিল। সকালের কেনা গোপাল, এখন আর কালীঘাটের নেই! কুমোরের সাধ্য কি এখন একে সনাক্ত করতে পারে?

শেষ দৃশ্যটা সত্যিই অদ্ভুত! অদ্ভুত বটে, কিন্তু আমি এর অংশ নই। সবাই তাদের বিচারবোধ হারিয়েছে, আমি হারাই নি। আমি দেখছি, ওরা অনুভব করছে। গান আর বাঁশীর সুর ক্রমশই চড়তে লাগল। শুধু চড়লেই কাজ হ'ত না, আরও কিছু একটা হ'ল। ষষ্ঠীদা সুরের তালে তালে নাচতে আরম্ভ করল। দৃশ্যটা জ'মে উঠছে। সেই জন্যেই আমি দাঁড়িয়ে রইলাম, নইলে আমার পালিয়ে আসাই উচিত ছিল। পালাবার চেষ্টা করেছি। বড়সাহেব পালিয়ে গেছেন বেলজিয়ামের মঠে। আমি পালাতে চাই সরকার-কুঠির মঠ থেকে। কিন্তু পারলাম না। দৃশ্যটা জ'মে উঠেছে। ষষ্ঠীদার গা থেকে খদ্দরের চাদরটা প'ড়ে গেল মাটিতে, ভ্রূক্ষেপ নেই তার। প্রত্যেকেরই পায়ের দাগ লাগছে—দাগ লাগল রক্তের। জেটমলের পা থেকে তখনও রক্ত পড়ছিল।

মাসীমা এবার হাঁপিয়ে পড়লেন—বন্ধ করলেন গান। চোখ ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন সবাইকে। মনে হ'ল, কাউকে তিনি স্পষ্ট-ভাবে দেখতে পাচ্ছেন না। সত্যিই তাই। দৃষ্টি তাঁর নিশ্চয়ই আবছা হ'য়ে এসেছে। আমি তাঁর কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম। কাছে ছিল

ষষ্ঠীদাও। মাসীমা ডাকলেন, "তপা কই রে? ষষ্ঠী? ষষ্ঠী কোথায়?"

"এই তো ষষ্ঠীদা—" জবাব দিলাম আমি।

মাসীমা দেখবার চেষ্টা করলেন না। মন্দিরের দিকে মুখ রেখে তিনি বলতে লাগলেন, "তপা, ষষ্ঠীকে ক্ষমা করিস, ওর অপরাধের কাহিনী ওর নিজের মুখেই শুনিস। কাহিনী ও লিখছে। ষষ্ঠী, আমি তোকে ক্ষমা ক'রে গেলাম রে। গোপাল—আমার গোপাল বলেছেন ক্ষমা করতে।" এই পর্যন্ত ব'লে মাসীমা এক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইলেন। হাঁপিয়ে পড়েছিলেন তিনি। আমরা সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়েছিলাম তাঁর দিকে। মেসোমশাইর কাছে কতবারই তো শুনেছি যে, তিনি তাঁর সহধর্মিণীকে আজও চিনতে পারেন নি। এই বোধ হয় চেনবার শেষ মুহূর্ত এসে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু বৃদ্ধের চোখ দেখলাম শুকনো নেই। বার বার তিনি ধুতির প্রান্তটা হাতের মুঠোতে চেপে ধরতে লাগলেন। চোখের জল মুছতে লাগলেন সরকার-কুঠির মেসোমশাই।

মাসীমা এবার উঠে দাঁড়ালেন। হাত বাড়িয়ে গোপালকে ধরবার চেষ্টা করতে করতে পুনরায় তিনি গান ধরলেন, "মেরে তো গিরিধর গোপাল, দুসরো ন কোঈ—"

বলরাম মাসীমার পাশে দাঁড়িয়ে বাঁশীর সুর ক্রমশই চড়াতে লাগল। কেউ আর চুপ ক'রে থাকতে পারছিল না। মাসীমার সুরের সঙ্গে সুর মেলাল ষষ্ঠীদা। কেতকীর পাশে দাঁড়িয়ে চণ্ডীদা পর্যন্ত গান করছে! আর জেটমল? সেও চুপ ক'রে ছিল না। হাত জোড় ক'রে সে ক্ষমা চাইছে আর মাঝে মাঝে গানের কলিতে টান দিচ্ছে। আমিই শুধু স'রে এলাম দলের বাইরে। একটু বাদে স'রে এল মহীতোষও। আমার পাশে দাঁড়িয়ে মহীতোষ জিজ্ঞাসা করল, "কি দেখছ তুমি?"

বললাম, "ওদের পাগুলো।"

"পাগুলো?"

"হ্যাঁ, তালে তালে পা ফেলবার চেষ্টা করছে সবাই। সত্যিই তো ওগুলো পা নয়।"

"তবে ?"

"আহা, জেটমলের পা দিয়ে কি রকম রক্ত পড়ছে, দেখ! ষষ্ঠীদার গায়ের চাদরটা যে লাল হ'য়ে উঠল—"

"সুতপা!"

"মহীতোষ, নতুন বিপ্লবের বিগ্রহ আমি আজও খুঁজে পেলাম না। বলতে পার, এ কোন্ মাসীমা ? এ কোন্ জেটমল ? আর এ কোন্ গোপাল ?"

জবাব দিল না মহীতোষ, অবাক হ'য়ে চেয়ে রইল সামনের দিকে।

গান থেমে গেল হঠাৎ। গোপালের নাম করতে করতে মাসীমা প'ড়ে গেলেন ভাঙা মন্দিরের সিঁড়ির ওপর। চোখ বুজলেন সরকার-কুঠির মাসীমা। ভিড়ের পেছন থেকে এগিয়ে এলেন মেসোমশাই। ষষ্ঠীদার চাদরটা মাটি থেকে তুলে নিলেন। তাব পর চাদর দিয়ে মৃতদেহটা ঢেকে দিতে গিয়ে স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

মুখ থুবড়ে প'ড়ে গিয়েছিলেন মাসীমা। পিঠের ওপর থেকে শাড়িটা কখন যে আলগা হ'য়ে গিয়েছিল আমি তা দেখতে পাই নি। এবার দেখলুম। তোবড়ানো চামড়ার ওপর লম্বা লম্বা দাগ। প্রথম দৃষ্টিতে চাবুকের আঘাত ব'লেই ধাবণা হ'ল আমার। চামড়া ফেটে গেছে। গড়িয়ে গড়িয়ে বক্ত পড়ছে ফাটা-চামড়ার ফাঁক দিয়ে। বিস্ময়ের দৃষ্টিতে মহীতোষ চেয়েছিল আমার দিকে। শুধু মহীতোষ নয়, মেসোমশাই নিজেও বিস্মিত কিছু কম হন নি। চাদরটা হাতে নিয়ে তিনি স'রে এলেন আমার পাশে। বলতে লাগলেন, "তপা, দেখতে পাচ্ছিস কি অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে ? এ যেন সেই পুরনো ছবিটার নতুন প্রিণ্ট। গড়িয়া খালের মাটি দিয়ে যেন তোর মাসীমার পিঠের চামড়া তৈরি হয়েছে। হ্যাঁরে তপা, রক্তের রং দেখে কিছু বুঝতে পারছিস না ? এ যে লালুরই রক্ত রে।" বলতে বলতে মেসো-মশাই আবার চ'লে গেলেন মাসীমার কাছে। চাদরটা এবার তিনি ফেলে রাখলেন মৃতদেহের ওপর।

আমি দেখলাম, একটা বিরাট মৃত্যুর ওপর ছড়িয়ে রইল অসংখ্য মানুষের পায়ের দাগ।

বলরাম এবং জেটমলের পায়ের দাগগুলোও যেন সব মিলেমিশে ওতে একাকার হ'য়ে গেল!

শ্মশান থেকে তখনও কেউ ফিরে আসে নি। রাত প্রায় শেষ হ'য়ে এল। আমি দাঁড়িয়েছিলাম দোতলার বারান্দায়। সারাটা রাত এখানেই ছিলাম। সরকার-কুঠি শূন্য। এমন কি রতন পর্যন্ত আজ শ্মশানে গেছে! বাধা আমি ওকে দিই নি। সুস্থবোধ না করলে রতন নিশ্চয়ই এতটা পথ হাঁটতে পারত না।

গড়িয়া খালের দিকেই চেয়েছিলাম আমি। দেখলাম, চোখের সামনে কালো আকাশ ক্রমে ক্রমে সাদা হচ্ছে। পুবের দিগন্তে একটা মানুষের ছায়া যেন ক্রমশই স্পষ্ট হ'য়ে উঠছিল। মনে হ'ল, বলরাম। সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটা দিগন্তের ছবিও দেখতে পেলাম আমি। ছবিটা চিনতে আমার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হ'ল না। বুকের ছাতি চওড়া ক'রে চ্যাং চলেছে এগিয়ে। সারা দেশ ওকে ডাকছে। কোটি কোটি হাত উঠে রয়েছে ওপর দিকে। সু-উচ্চ হিমালয়ের শিখরশ্রেণী পর্যন্ত হাতের ইশারা ঢেকে ফেলতে পারে নি। চ্যাংএর চতুর্দিকে কোটি হাতের আহ্বান। আর এই দিগন্তে বলরাম একা! ওর চারদিকে একটা হাতও আমি দেখতে পাচ্ছি না।

হঠাৎ আমার মনে হ'ল, বলরাম শুধু পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারা নয়। মানব-ইতিহাসের সেই লাঞ্ছিত, ধূলিম্লান, দৈন্যক্লিষ্ট মানুষটি আজও একা—আজও সে বাস্তু খুঁজে পায় নি।

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥